

ভাষণ সমগ্র-১

উলামা-তলাবা

পরিচিতি, মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য

মূল

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

[জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বহুসংখ্যক
কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা, আধ্যাত্মিক রাহবার ও দাঈ]

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল গাফফার .

মুহাদ্দিস: জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ইমাম ও খতীব: শহীদবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা



সাফাওয়াতুল আশরাফ

(অভিজ্ঞাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

উলামা-তলাবা

পরিচিতি, মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য

মূল : সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল গাফফার

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
সাফাতাওয়াতুল আসওয়াত

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল

রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী

ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঈসাব্দী

[সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায়

গ্রাফিক্স : সাইদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-12-8

মূল্য : তিনশত ষাট টাকা মাত্র

ULAMA-TOLABA

PORICHITY, MORJADA, DAETTO O KORTOBBO

By: Sayed Abul Hasan Ali Nodvi Rh.

Translated by: Mawlana Muhammad Abdul Gaffar

Price: Tk. 360.00 US\$ 18.00

প্রকাশকের কথা

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.কে আল্লাহ্পাক এ আখেরী যমানায় দ্বীনের যে বহুমুখী খেদমতের তাওফীক দিয়েছেন এবং তাঁর যবান ও কলম পুরো আলমে ইসলাম জুড়ে বরং অমুসলিম সমাজেও দ্বীনী দাওয়াত যে হৃদয়গ্রাহী পন্থায় দিয়েছে সে সম্পর্কে কোন সচেতন মুসলমান অনবহিত নন।

হযরত মাওলানাকে আল্লাহ্পাক ইলম ও জ্ঞানের যে ব্যাপকতা, দৃষ্টির যে সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতা, চিন্তার গভীরতা ও ভারসাম্যতা দান করেছিলেন তা এ যুগের মুসলমানদের জন্য আল্লাহপাকের এমন এক বিশেষ নেয়ামত যে এর যত বেশি শোকরিয়াই আদায় করা হোক না কেন তা কম বলে গণ্য হবে।

আল্লাহপাক হযরত মাওলানাকে উম্মতের প্রতি এমন দয়াদর্শিতা বানিয়েছিলেন যে, তিনি পতনের এ যুগে উম্মাহর গাফলত ও আত্মঘাতী অবস্থা দর্শনে অস্থির হয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই ছুটে বেড়িয়েছেন। অন্তরের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে মুসলমানদেরকে গাফলতের নিদ থেকে জাগিয়ে আত্মসচেতন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বিশেষত উম্মাহর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যাদের হাতে সে সকল নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরাম ও ভবিষ্যত নেতৃত্ব যাদের হাতে সেই সকল যুবক ও তালিবানে ইলমের পরিচিতি, মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তো তিনি স্বীয় ব্যথিত হৃদয়কেই তাদের সামনে খুলে রেখে দিয়েছেন। তাঁর কলজে হেঁচা আত্মচিন্তার কেবলমাত্র হৃদয়ের কর্ণের অধিকারী ব্যক্তিবর্গই যে শুনতে পান তা নয়, বরং তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে বের হওয়া মর্মভেদী চিন্তার অতি সামান্য হলেও আমাদের মতো চরম গাফেল ও অনুভব করে থাকে। তাই তো হযরত মাওলানা রচীত কিতাবসমূহ ও তাঁর মুখ নিঃসৃত শত-সহস্র বয়ান থেকে যৎ সামান্য পাঠের যে সুযোগ হয়েছে তাতে আমাদের চরম গাফেল অন্তর সামান্য সময়ের জন্য হলেও জাগ্রত হওয়ার আশ্রয় অনুভব করেছে।

আল্লাহপাক জায়ায়ে খায়র দান করুন নেপালের হযরত মাওলানা রমযান ছাহেবকে তিনি হযরত মাওলানা রহ.-এর বয়ানসমূহকে বিষয়ভিত্তিক সংকলিত করে উম্মাহর কল্যাণে এক বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ‘খুতবাতে আলী মিয়া’ শীর্ষক সংকলনটি হাতে পাওয়া মাত্রই এর বঙ্গানুবাদের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। সাথে সাথে এ কাজের জন্য যোগ্য অনুবাদকের সন্ধান চালিয়েছি। পরিচিত মুরব্বী ও বন্ধুদেরকেও এ ব্যাপারে বলেছি। এর এক পর্যায়ে বর্তমান সময়ের অন্যতম কলম সৈনিক হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম হযরত মাওলানা আবদুল গাফফার ছাহেবের কথা বললেন। আমারও মনে হলো তিনি এ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। আলহামদুলিল্লাহ! এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর খুতবাতের প্রথম খণ্ড ‘উলামা-তলাবা : পরিচিতি, মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য’ যখন পাণ্ডুলিপি আকারে আমাদের নিকট আসলো তখন বুঝলাম আমাদের নির্বাচন যথার্থ। আল্লাহপাক হযরত মাওলানা আবদুল গাফফার ছাহেবকে তাওফীক দান করুন যাতে তিনি দ্রুত ‘খুতবাতে আলী মিয়া’-এর অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর অনুবাদও শেষ করে জাতিকে এ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন।

যদিও বর্তমান এ খণ্ডটি বিশেষভাবে উলামায়ে কেরাম ও তালেবানে ইলমের জন্য কিন্তু ব্যাপকভাবে মুসলমান মাত্রের জন্যই এতে চিন্তার খোরাক আছে। আছে হৃদয়ে উত্তাপ গ্রহণের পর্যাপ্ত সামান।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ কিতাবখানা ক্রটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল-ক্রটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। যাতে পরবর্তীতে সংশোধন করতে পারি। আল্লাহপাক এ কিতাবের সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সম্ভষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন এবং এটাকে সকলের নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন! ইয়া রাক্বাল আলামীন।

তারিখ

১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী
৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঈসারী

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

উৎসর্গ

এই অধর্মের সামান্য প্রচেষ্টা ও কর্মকে মুসলিম বিশ্বের মহান দাঈ মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামাতুল হিন্দ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (রহ.)-এর রূহানী সন্তান এবং মুসলিম বিশ্বের মহান দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার কৃতি সন্তান, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ হোসাইন খানের^১ (মুদ্দা যিল্লুহ) নামে উৎসর্গ করছি এবং তা করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি। কারণ, আমার তালীম ও তারবিয়াতে, শিক্ষা ও দীক্ষায় তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি আমার পিছনে রাত-দিন অবিরাম মেহনত ও পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, তিনি যেন আমার মুহতারাম উস্তাযকে দ্বীনের মেহনতের জন্য দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করেন। বিশেষত নেপালের ন্যায় পৌত্তলিক দেশে হেদায়েতের আলো প্রজ্জ্বলিত করার প্রয়াসকে কবুল করে নেন।

মুহাম্মাদ রমযান মিঞা

জামিয়াতুল উলূম ইসলামিয়া

আল্লামা বিন্‌লৌরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান

১. বর্তমান মুহতামিম, মাদরাসাতুল হারামাইন, লালতপুর (কাঠমুণ্ডু) নেপাল।

আপনি কী হতে পারেন?

আপনি শুধু আপনার শহর কিংবা দেশ নয় বরং গোটা মুসলিম জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। আপনি হতে পারেন পরশ পাথর। আপনার যাদুকরি ছোঁয়ায় একজন নাফরমান ও খোদাদ্রোহী ব্যক্তিও হয়ে উঠতে পারে ওলীয়ে কামেল। যেখানে আপনার আগমন ঘটবে, সেখানে আগমন ঘটবে বসন্তের। বদলে যাবে তথাকার সমাজ ও পরিবেশ। আজকের এই যুগেও আপনার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এরূপ যোগ্যতা ও প্রভাব বিস্তারী আত্মিক শক্তি। অসংখ্য ব্যক্তি আপনার বদৌলতে লাভ করতে পারে জান্নাতী হওয়ার সৌভাগ্য।

সন্দেহ নেই, নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আপনি হতে পারেন **آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ** - আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের এক বিশেষ নিদর্শন। হতে পারেন হুজ্জাতুল ইসলাম, শায়খুল ইসলাম। সর্বোপরি আপনি হতে পারেন একজন নায়েবে নবী। তবে এর জন্য আপনাকে একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। আপনাকে হতে হবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। অন্তরে পোষণ করতে হবে দৃঢ় ইচ্ছা। কারণ, আপনি মাদরাসায় ভর্তি হয়েছেন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নৈকট্য অর্জন করতে, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে, বিশিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সব গুণের অধিকারীরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে।

আপনি যদি উন্নতি ও সফলতা লাভের অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত আপনার সহায়তায় এগিয়ে আসবে। সমগ্র জগত আপনার সহায়তায় ওয়াক্ফ ও নিবেদিত হয়ে যাবে। আপনার প্রথম কর্তব্য হল অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প সৃষ্টি করা। আপনাকে তো হতে হবে শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতম।

اپنے من میں ڈوب کر پاجاسراغ زندگی

تو اگر میرا نہیں بننا نہ بن اپنا تو بن

নিজেতে লীন হয়ে জীবনের সন্ধান লাভ কর

তুমি যদি আমার না হও না হলে, নিজের তো হও।

ইলম ও জ্ঞান

আমি বিশ্বাস করি যে, ইলম ও জ্ঞান একক ও অবিমিশ্র এক সত্ত্বা, যা অবিভাজ্য। ইলম ও জ্ঞানকে নতুন ও পুরাতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কিংবা দর্শনগত ও কর্মগত ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা শুদ্ধ নয়, সিদ্ধ নয়।

আল্লামা ইকবাল যেমনটা বলেছেন—

دلیل کم نظری قصه جدید و قدیم

‘নতুন ও পুরাতনের স্লোগান দৃষ্টি-দুর্বলতার প্রমাণ।’

ইলম ও জ্ঞানকে আমি এক মহাসত্য বলে মনে করি। ইলম ও জ্ঞান মূলত আদ্বাহ তাআলার ঐ দ্বীন যার মালিকানা কোন জাতি বা দেশ বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, নির্দিষ্ট হওয়া উচিতও নয়। ইলম ও জ্ঞানের আধিক্যের মধ্যেও আমি একত্ব দেখতে পাই। সেই একত্ব হচ্ছে সত্যতা, সত্যের অন্বেষণ, সত্য-পিপাসা, সত্য প্রাপ্তির আনন্দ।

আমি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রবক্তা নই যে, যার গায়ে এসবের ইউনিফর্ম আছে শুধু সে-ই আলেম ও বিদ্বান, জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসেবে বিবেচিত হবে, অন্য কেউ নয়। যার গায়ে এসবের ইউনিফর্ম নাই সে কথা বলার উপযুক্ত নয় বা তার কথা শ্রবণযোগ্য নয়— এই নীতি অঘোষিতভাবে কার্যকর হয়ে থাকলেও আমি তা বিশ্বাস করি না।

আমি জ্ঞানের বৈশ্বিকতা ও সজীবতার প্রবক্তা, যার মধ্যে প্রতি যুগেই খোদায়ী দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান থাকে। যদি একনিষ্ঠতা ও সত্যিকারের অন্বেষণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমতের বৃষ্টিধারার কোন গাটতি কোন সময়ই পরিলক্ষিত হয় না।

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ

আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (রহ.)

(আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে সুশীতল রাখুন,
জান্নাতকে তাঁর আবাসস্থলে পরিণত করুন।)

نطق کو سونا زہے تیرے لب اعجاز پر

محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر

‘তোমার অসাধারণ অধরোষ্ঠের প্রতি ভাষার কত গৌরব!
তোমার উড্ডয়নের উচ্চতা দর্শনে সপ্তর্ষিও বিশ্বয়-বিহ্বল।

অনুবাদের কথা

নাহমাদুহ ওয়া নুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম ।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিঞা নদভী (রহ.) । উলামা মহলে তো বটেই, যাঁরা দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা লেখাপড়া করেন বা খোঁজ-খবর রাখেন নামটি তাঁদের নিকটও সুপরিচিত ।

হযরত মাওলানা ছিলেন দাঁই ইলাল্লাহ, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী এক মহান আলেমে দ্বীন । উম্মতের প্রতি গভীর দরদী ও সেই দরদে অস্তির চিহ্নের অধিকারী এই ব্যক্তিত্ব বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সফর করেছেন । মুসলিম উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানগত অবক্ষয়, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত অধঃপাত, স্বকীয়তা ও স্বাভাব্যতা, মর্যাদা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা অবলোকন করে তাঁর হৃদয় বেদনাক্লান্ত হয়েছে । কিন্তু তিনি হতাশ হননি । কারণ, বিভিন্ন যুগের মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও পতনের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অধ্যয়ন ছিল গভীর ও বিস্তৃত । তাঁর গভীর জ্ঞানদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা বর্তমান কালের মুসলিম উম্মাহর অধঃপাত ও অবক্ষয়ের কারণসমূহকে তিনি যেমন চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, ঠিক তেমনই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এ থেকে উত্তরণের পথ ও উপায়সমূহকে ।

তাঁর বিশ্বাস ছিল, মুসলিম উম্মাহ যদি আত্মপরিচয়ে সমৃদ্ধ হতে পারে, তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব যদি তারা যথাযথ পালন করে তবে এই উম্মত তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে অবশ্যই সক্ষম হবে ।

মুসলিম উম্মাহর সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করতে, ইসলামী মর্যাদা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করতে, তাদেরকে তাদের শেকড়ের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে, তাদের মধ্যে যুগ ও দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টি করতে তিনি তাঁর অসাধারণ লেখনী শক্তি ব্যবহার করেছেন এবং অবিস্মরণীয় সব গ্রন্থ রচনা করেছেন । সেই সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর বাকশক্তিকে । নিজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন, সফর করেছেন । বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে ভাষণ দান করেছেন ।

এসব ভাষণে তিনি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চি়ত জ্ঞানের নিৰ্যাস শ্রোতামণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষণে ইলম ও আমল, জ্ঞান ও কার্য, রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়।

অনুদিত এই গ্রন্থ খণ্ডটি তাঁর মূল্যবান ভাষণ সংকলনের প্রথম খণ্ড। অনুবাদ ও ভাষান্তরের কাজ বেশ আয়াসসাধ্য কাজ। বিশেষত তা যদি হয় হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিঞা নদভী (রহ.)-এর ন্যায় উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির লেখনী কিংবা ভাষণের অনুবাদ। রচিত গ্রন্থের তুলনায় ভাষণের অনুবাদ অপেক্ষাকৃত আরও কঠিন। কারণ, ভাষণে যেহেতু শ্রোতামণ্ডলী সামনে উপস্থিত থাকেন সেহেতু শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাসে ভাষণদানকারীকে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় না। অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি দ্বারাও অনেক ভাব তাদের সামনে প্রকাশ করা যায়। অলিখিত ভাষণ বক্তাকে প্রায়শই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যায়। কথা ও বক্তব্য বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইত্যাদি কারণে কারও ভাষণ অনুবাদ করা তাঁর রচিত গ্রন্থ অনুবাদ অপেক্ষা একটু শক্ত কাজ বলে মনে হয়। তবে তা দুর্বল অনুবাদকের জন্য। একজন সবল ও সফল অনুবাদকের জন্য কোনটাই কঠিন নয়। কাজেই পাঠকবৃন্দ যেন মনে না করেন, উপরিউক্ত কথাগুলো বলে আমি আমার অনুবাদ-দুর্বলতাকে আড়াল করতে চাইছি। অনুবাদ যেমনই হোক, আমি আনন্দবোধ করছি এজন্য যে, হযরত মাওলানার মূল্যবান কথাগুলো যেনতেনভাবে হলেও পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি এবং তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে নিজেকে কিছুটা হলেও সম্পৃক্ত করতে পেরেছি।

এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশক ও মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ও হযরতুল উস্তায় মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের (মুদ্দা যিল্লুল আলী) প্রতি। হযরতুল উস্তায়ের পরামর্শেই মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব আমাকে অনুবাদ কার্যের এই গুরুদায়িত্ব দান করেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্যও যে, প্রথমোক্তজন গ্রন্থের বেশ কিছু জায়গায় সংশোধনী এনে অনুবাদের কিছু ভুল-ভ্রান্তি দূর করে দিয়েছেন। আর হযরতুল উস্তায়ের নিকট হতে বেশ কিছু জায়গার অনুবাদে পর্যাণ্ড সহায়তা লাভ করেছি। বন্ধুবর মাওলানা আহমদ মায়মুন সাহেবকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলছি না। কারণ, তিনি বেশ কয়টি কবিতাংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন।

উলামা, তালাবাসহ সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন রইল, তাঁদের দুআয় আমাকেও যেন তাঁরা শরীক করে নেন। আর আল্লাহ তাআলার নিকট আমার প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থখানি দ্বারা আমাদের সকলকে উপকৃত করেন এবং আমাদের সকলের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁর রেজামন্দি লাভই তো জীবনের আসল মাকসাদ।

শহীদবাগ
১৮-০২-১৪৩৩ হিজরী

বিনীত
আবদুল গাফফার

প্রারম্ভিকা

দুনিয়ার সর্বত্র বিরাজিত বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা এবং মাথার উপর ঘূর্ণায়মান ভয়াবহ যুদ্ধের অশনি সংকেতকে দূরীভূত করতে, মানুষের জীবন যাপনকে প্রশান্তিকর ও নিরাপদ করতে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে প্রয়োজন তাদের হৃদয়ভূমিতে হাল চাষ করা। আপনারা দেখে থাকেন যে, প্রকৃতিগত নিয়মনীতি ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে কৃষক তার জমিতে হাল চাষ করলে তার জমি ফসলের ভাণ্ডার খুলে দেয়। তদ্রূপ মানুষের হৃদয়ভূমিতে যদি নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী হালচাষ করা হয় এবং তাতে মেহনত ও পরিশ্রম করা হয় তবে হৃদয়ভূমি সবুজ ও সজীবতায় ভরে উঠবে, সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে ফুল ও ফলে। তখন আপনারা দেখবেন, পৃথিবীর চিত্র কিরূপ পাল্টে যায়। হৃদয়ভূমি যখন সম্পদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে, দেখবেন এই পৃথিবী কিরূপ মণি মুক্তায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিরূপ ওলীয়ে কামেল, নির্লোভ, নির্মোহ ও নিঃস্বার্থ কিরূপ মানবতার সেবক ও ত্যাগী বান্দা জন্ম লাভ করে। রক্ত ও পানি এক করার মত কিরূপ আল্লাহর বান্দা আবির্ভূত হয় আর অকল্পনীয় কীর্তির স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়।

— মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ
আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (রহ.)

সংকলকের কথা

এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ তাআলার ফযল ও করম, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা বড় বিশ্বয়কর। তিনি প্রত্যেক যুগে এই উম্মতের প্রয়োজন পূরণের এবং পথ চলার উপকরণাদি সরবরাহ করেছেন। মানুষের দৈহিক বিবর্ধনের জন্য যেরূপ খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজন হয় তদ্রূপ তার আত্মিক উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন হয় আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির এবং ইখলাস ও নিঃস্বার্থপরতার। আল্লাহ তাআলা দৈহিক বিবর্ধন ও প্রতিপালনের জন্য নানা প্রকার বস্তু ও উপকরণাদি সৃষ্টি করেছেন আর আত্মিক উৎকর্ষের জন্য দান করেছেন তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি এমন কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন যারা স্ব-স্ব যুগে যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন মারফিক ঐ দুই সাগর (কিতাব ও সুন্নাহ) হতে পানি সিঞ্চন করে মুসলিম উম্মাহর তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন এবং তাদের মাঝে দ্বীন ইসলামকে সজীব করেছেন। প্রতি যুগের উলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে ইজাম লেখনী ও বক্তৃতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের প্রদীপকে আলোকোজ্জ্বল রেখেছেন। বর্তমান যুগেও যখন চতুর্দিক থেকে ইসলামবিরোধী নানা রকম ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, নানা রকম বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, উলামায়ে কেরাম তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন। এই যুগের ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, মুফাক্কিরে ইসলাম হযরতুল আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিয়াঁ নদভী (রহ.)কে আল্লাহ তাআলা লেখনী ও বক্তৃতার এক বিশেষ রুচি ও যোগ্যতা দান করেছিলেন।

তিনি যে বিষয়ে কলম ধরেছেন বা বক্তৃতা করেছেন তার শতভাগ পাওনা মিটিয়ে ছেড়েছেন। জী হাঁ, আপনারা হযরত মাওলানার গ্রন্থাদি পাঠ করুন, দেখবেন যে, বাস্তবতা এটাই। মুসলিম উম্মাহর মাঝে দ্বীনী দাওয়াত ও ইসলামী জাগরণের যে অনুকরণীয় ও স্মরণীয় কর্মকাণ্ড তিনি আজ্ঞাম দিয়েছেন তা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ তাআলা যেন এই গুণটিকে তাঁর স্বভাবে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের মহান চিন্তাবিদ, যুগ চিকিৎসক হযরত মাওলানা ইউসুফ গুদিয়ানবী শহীদ (নাওয়ারুল্লাহ মারকাদাহ) তাঁর সম্পর্কে নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে যেয়ে লিখেছেন, ‘হযরত মাওলানা (আবুল হাসান আলী নদভী রহ.) আরব ও আযম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র অবিরাম ইসলামের দাওয়াতের শিক্ষা

ফুঁকেছেন এবং সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের ‘অবারিত ও উন্মুক্ত দস্তুরখানে’^১ সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁকে আমরা কখনও দেখি আমেরিকা ও লন্ডনে যেয়ে ‘পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কথা’^২ বলতে, কখনও দেখি কায়রোতে যেয়ে ‘হে মিসর শোন’^৩ বলে আহ্বান জানাতে, আবার কখনও *اسمعوها مني* *صريحة ايها العرب*^৪ ‘হে আরববাসী! আমার স্পষ্ট কথা শুনে নাও’ বলে ইসলামের কেন্দ্র ও উৎসস্থলের অধিবাসীদেরকে জাগ্রত করার জন্য হাঁক ছাড়তে। কখনও তিনি ‘কাবুল দরিয়া থেকে ইয়ারমুক দরিয়া পর্যন্ত’^৫ ছুটে ইসলামী বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে জাগ্রত করেন, কখনও তাদেরকে ‘মুসলমানদের উত্থান-পতনে বিশ্বমানবতার লাভ-লোকসানের কাহিনী’^৬ শোনান (যার একদিক গৌরবময় ও মধুর, অপর দিক রক্তক্ষয়ী ও বেদনাবিধুর) কখনও তাদের সামনে ‘তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত’^৭ (দাওয়াত ও আযীমতের ইতিহাস) তুলে ধরেন। কখনও ‘ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত’ এর ভয়াবহ দিক সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করেন, কখনও তাদেরকে বর্তমান কালের মতবাদপন্থীদের দল ত্যাগ করে ‘মদীনার কাফেলায়’^৮ যোগদানের আহ্বান জানান।

মোটকথা, মাওলানার দাওয়াত ও আহ্বান পূর্ব ও পশ্চিম, আরব ও অনারব, আফ্রিকা ও এশিয়ার কোন নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে, মুমূর্ষ মানবতাকে, বস্তুবাদিতার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ মানবতাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন।^১ (شخصيات و تاثرات) ১ পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২)

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী (রহ.) যা বলেছেন, যথার্থই বলেছেন। মাওলানার দাওয়াত বিশ্বব্যাপী এক সুর মুর্ছনার সৃষ্টি করেছিল। তিনি একদিকে যেমন আরবী সাহিত্যকে লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধতার শীর্ষে উপনীত করেছেন তেমনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্বকেও তারকাসম উচ্চতায় তুলে ধরেছেন।

১. এটি প্রকৃতপক্ষে মাওলানা প্রণীত একটি পুস্তক। পুস্তকটির উর্দু নাম ‘খানে ইয়াগুমা’।
২. এটি মাওলানার লিখিত একটি পুস্তক। পুস্তকটির উর্দু নাম ‘মাগরিব সে সাফ সাফ বাঁতে’।
৩. এটিও একটি পুস্তকের নাম। আরবীতে লিখিত পুস্তকটির নাম *اسمعى يا مصر*
৪. এটিও তাঁর লিখিত পুস্তক।
৫. এটিও তাঁর লিখিত পুস্তক। পুস্তকটির নাম কাবুল দরিয়ায় সে দরিয়ায় ইয়ারমুক তক।
৬. এটিও তাঁর লিখিত পুস্তক। পুস্তকটির নাম *ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين*
৭. এটিও তাঁর লিখিত পুস্তক।
৮. এটিও তাঁর লিখিত পুস্তক। পুস্তকটির নাম কারওয়ানে মদীনাহ।

তাঁর লেখনী ও বক্তৃতা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ও সমাদৃত। বিশ্বের সকলেই তাঁর দাওয়াতের ভক্ত ও আসক্ত। জনৈক বোদ্ধার ভাষায়, ‘উর্দু ভাষার মধ্যে যিনি প্রাণসঞ্চার করেছেন তিনি হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। উর্দু ভাষাকে ভারতে যেমন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী উচ্চ সোপানে পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনি পাকিস্তানে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহীদ (রহ.) এবং শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দা. বা.)।

আসুন, পাকিস্তানের এই দুই মহান সাহিত্যিক আলেম হযরত মাওলানা নদভী সম্পর্কে কী বলেন তা শুনুন। হাকীমুল আসর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী লিখেন, ‘যাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞান, তাকওয়া ও পরহেজগারী, দাওয়াত ও আযীমাত, সত্যকথন ও নির্ভীকতা এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য দরদ ও অস্থিরতা, গলন ও বিগলন দেখে আমি মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত, যাঁর প্রতি আমার ভক্তি ভালবাসায় রূপ নিয়েছে তিনি হলেন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী’। (তামীরে হায়াত, মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৩৪)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (যীদা মাজদুহ) লিখেন, ‘তাঁর লেখনী ও রচনাবলীতে রয়েছে জ্ঞান ও চিন্তার প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে উম্মতের প্রতি চরম দরদ ও দহন, যা মানুষকে প্রভাবান্বিত না করে পারে না। বিশেষত পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার শ্রোত বর্তমান যুগে যে চিন্তাগত ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে ফেতনা ও বিপর্যয়ের সয়লাব সৃষ্টি করেছে তার উপর মাওলানার গভীর ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁর লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে এমন আকর্ষণীয় রূপ ও চিন্তা জাগানিয়া পদ্ধতিতে সেসব ফেতনা চিহ্নিত করেছেন এবং সেগুলোর মুকাবেলার পদ্ধতি বাতলেছেন যে, সমকালীন লেখকদের অন্য কেউ তার সমকক্ষ হতে পারে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে।’ (তামীরে হায়াত, মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৪৬)

তাঁর ভাষণসমূহের সংকলন এই কিতাবখানি পাঠ করলে তাঁদের কথার যথার্থতা আমরা উপলব্ধি করতে পারব। কারণ ভাষণগুলোতে হযরত মাওলানা নদভী কুদ্দিসা সিররুহ ইলম ও আমল, তাকওয়া ও পরহেজগারী, দাওয়াত ও আযীমাত, ইতিহাস ও সাহিত্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে আলোকপাত করেছেন তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি শিক্ষাপ্রদও বটে। এসব ভাষণে তিনি উলামায়ে কেরাম ও ইলম অন্বেষণকারী ছাত্রদেরকে তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। আধুনিক চ্যালেঞ্জের মুকাবেলায় তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

কোন বক্তার বক্তৃতা ও ভাষণসমূহ গ্রন্থবদ্ধ হয়ে যাওয়া ঐ সকল ব্যক্তির জন্য অমূল্য সম্পদ ও উপহার স্বরূপ যাঁরা ঐ বক্তার জীবন ও কর্ম, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও চেতনা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক। বিশেষত বক্তা যদি হন মুহাদ্দিস ও ফকীহ, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক, মুফাসসির ও মুফাক্কির, দ্বীনী চিন্তা ও চেতনা লালনকারী, আকাবিরে উম্মতের স্নেহভাজন, মুসলিম জাতির আকর্ষণের কেন্দ্র, মুসলিম জাতির জন্য অস্থির ও দরদী হৃদয়ের অধিকারী, মানবতার জন্য গলন ও বিগলনশীল অন্তরের অধিকারী এবং তাঁর ভাষণে থাকে জোশ ও অনর্থক আবেগের পরিবর্তে চিন্তা ও মানসিকতা গঠনের উপাদানের প্রাধান্য, তবে তো তাঁর ভাষণ-সংকলন হয়ে যায় সোনায়ে সোহাগা।

হযরত মাওলানা নদভী (রহ.)-এর ভাষণসমূহ এই বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পাঠক তাঁর এই ভাষণ সংকলনটি পাঠ করলে তার সামনে নতুন জগত উন্মোচিত হতে থাকবে এবং অতীতের বন্ধ দরজা খুলে যেতে থাকবে।

হযরত মাওলানা নদভীর সঙ্গে এই অধম সংকলকের প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল নেপালের বৃহত্তম দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নূরুল ইসলাম জলপাপুর, সানসারীতে। ৫ই মে ১৯৯২ ইং মুতাবিক ৩রা যীকাদাহ ১৪১২ হিজরী তারিখে। আমি তখন প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলাম। দারুল উলূমের ছাত্রদের মধ্যে হযরত মাওলানা নদভী সম্পর্কে যথেষ্ট চর্চা হতে দেখতাম। শিক্ষকমণ্ডলীও তাঁর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। আমি ভাবতাম, এই ব্যক্তিত্ব না জানি কেমন। না জানি আল্লাহ তাঁকে কত নেয়ামত দান করেছেন।

দারুল উলূমে তাঁকে ^{ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ} (অতঃপর পৃথিবীতে তাকে মকবুল ও গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেওয়া হয়) এর বাস্তব নমুনা বলে মনে হত। তিনি যখন উপরিউক্ত তারিখে দারুল উলূমে তামারীফ আনলেন, আমি সাক্ষাতের জন্য তাঁর নিকট গেলাম। এটাই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত। প্রথম সাক্ষাত! যে সাক্ষাতে তাঁর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আমাকে তাঁর চরম ভক্ত বানিয়ে দিল। যেন আমি যাঁর সন্ধানে ছিলাম তিনিই সেই ব্যক্তি। আমার জীবনে যিনি একজন আইডিয়াল ও আদর্শ, পথপ্রদর্শক ও পথের দিশারী হবেন আমি যেন তা পেয়ে গেলাম। (এই সফরে দারুল উলূমে মাওলানা যে বয়ান করেছিলেন তা বক্ষমান গ্রন্থটিতে দ্বীনী মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বীনী ইলমে ইখলাস ও বিশেষত্ব অর্জনের গুরুত্ব শিরোনামে সংকলিত হয়েছে।) পাকিস্তানে জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিনৌরী টাউন করাচীতে যখন আমি ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলাম তখন হযরত মাওলানার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। বিশেষত ^{مَاذَا خَسِرَ الْعَالَمُ بِإِنْحِطَاطِ الْمُسْلِمِينَ} (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো)

এবং তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' গ্রন্থ দুটি পাঠ করার পর তাঁর প্রতি আমার ভক্তি ও ভালবাসা প্রেমে রূপ নিল।

বহু দিন যাবৎ মুসলিম বিশ্বের বৃহৎ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা দর্শনের এবং হযরত মাওলানার খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের আত্মাকে সজীব করার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লালন করে আসছিলাম। পাকিস্তান হতে দেশে ফিরে এসেই ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় পৌঁছে ১৪২০ হিজরী সনের ২২শে শাবান দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা লাক্সৌ-র মেহমান খানায় হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হল। সময় ছিল মাগরিবের পর। হযরতের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। সাক্ষাতাদি কম করতেন। আমি যখন পৌঁছলাম এবং তাঁকে বলা হল যে, আল্লামা বিন্নৌরী টাউনের একজন ছাত্র সাক্ষাতের জন্য এসেছে তখন তিনি আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দান করলেন।

সাক্ষাত-পরবর্তী কথাবার্তার একপর্যায়ে যখন আমাদের জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নৌরীর আলোচনা উঠল, তিনি বললেন, 'হযরত বিন্নৌরী অত্যন্ত বড় আলেম ছিলেন এবং আমার উত্তম বন্ধু ছিলেন।' আমি হযরতের দু'আ নিয়ে তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

ঐ বছরই ২৫শে শাবান কাঠমুণ্ডতে অবস্থিত মাদরাসাতুল হারামাইনের বার্ষিক জলসায় হযরত মাওলানার প্রিয় নাতি হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল-হাসানী নদভী তাশরীফ আনলেন। তিনি আমাকে বললেন, রমযান মিঞা! রমযান মাসটা রায়বেলীতে কাটাও এবং হযরত মাওলানার খেদমতে উপস্থিত হয়ে খুব অর্জন কর। আমার দুর্ভাগ্য! বিভিন্ন ওজরের কারণে আমি যেতে পারলাম না। আমার সাক্ষাতের ঠিক একমাস পর ২২শে রমযান তারিখে (মুতাবিক ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং) হযরত মাওলানা আখেরাতের যাত্রী হয়ে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৯৯ ইং শেষ হল। একটা শতাব্দী অতিক্রান্ত হল। আমি বলি, কিসের শতাব্দী অতিক্রান্ত হল? শতাব্দীর দাওয়াত ও আযীমাতের ইতিহাস নিয়ে মাওলানা আমাদের মধ্য হতে অতিক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমাদের সকল আকাবির ও আসলাফ সম্পর্কে কিতাবাদিতে যা পড়েছিলাম হযরত মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি তার সবকিছুর এক ঝলক তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছি। হযরত মাওলানার পয়গামকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণা আমার মধ্যে জাগ্রত হয়। এরই প্রেক্ষিতে তাঁর ভাষণগুলোকে বিন্যস্ত করে সংকলন করা হল, যাতে তাঁর বয়ান ও ভাষণ দ্বারা লোকে উপকৃত হতে পারে। প্রথম খণ্ডটির সম্পর্ক উলামায়ে দ্বীন ও ইলম অন্বেষণকারী ছাত্রদের সঙ্গে।

এই ভাষণগুলোতে হযরত মাওলানা (রহ.) উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ইলমের অবক্ষয়ের এই যুগে উলামায়ে ইসলামের দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, তাদের অবহেলা ও ঋণটিতে তাঁর যে মর্মবেদনার সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভবত তারই প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ও অভিজ্ঞতাকে তাঁর প্রিয় আলেম উলামা ও ছাত্রবৃন্দের সামনে অকপটে ও আন্তরিকতার সাথে ব্যক্ত করেছেন। ইলমের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এবং নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথ অতিক্রম করে তিনি যা লাভ করেছেন তার নির্যাস তিনি তাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান যুগে উলামায়ে কেরামের অস্তিত্বের মূল্য কতটুকু তা তাদেরকে বুঝিয়েছেন এবং তাদের কাছে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাশা কী তাও তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে উলামায়ে কেরামকে আধুনিক চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দিয়ে এসব চ্যালেঞ্জের মুকাবেলার কর্মপন্থা নির্দেশ করে দিয়েছেন। ফলে এর দ্বারা উলামায়ে কেরাম নিজেদের মানসিক অস্থিরতা ও হীনমন্যতা হতে মুক্তি পেতে সহায়তা লাভ করবেন। অনুরূপভাবে ছাত্র ও শিক্ষার্থী বন্ধুদেরকে উৎসাহিত করেছেন সত্যিকার অর্থে ইলম অর্জন করার প্রতি এবং তদনুযায়ী আমল করার প্রতি। উল্লে নবুওয়াত অব্বেষণকারী ছাত্রদের ইলম অর্জনের পথে কোন গুণাবলীর অধিকারী হওয়া জরুরী, ইলম অর্জনে সফলতা লাভের জন্য শর্তসমূহ কী যা ব্যতীত চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব এবং যা তাদের জন্য পথের আলোকবর্তিকা স্বরূপ, ইলম অব্বেষণের অভিযাত্রায় পথের পাথেয় স্বরূপ— তাও তাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এই সকল বয়ান ও ভাষণের কেন্দ্রীয় ভাবনা ও মূল বিষয় একটিই। আর তা হল, একজন তালিবুল ইলম বা ওহীর জ্ঞান অব্বেষণকারী ছাত্রের দৃষ্টি কোন সুউচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিত; একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি, একটি সীমাবদ্ধ ও বিশেষ পরিবেশে থেকেও সে কোন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে এবং বিশ্বকে কী দিতে পারে? সবচেয়ে বড় কথা হল, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে যে সৃষ্টিগত মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন তার উৎকর্ষ সাধন করে তারা ইলম ও রূহানিয়াতের, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার কোন চূড়ায় নিজেদের স্থান করে নিতে পারে?

বর্তমান কালের পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ধর্মহীনতার বিশ্বব্যাপী প্লাবনের মুকাবেলায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। এই ফেতনা-বিপর্যস্ত যুগে মুসলিম উম্মাহর এমন কিছু ব্যক্তি প্রয়োজন যারা তাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করতে পারে। এই দায়িত্ব তারাই পালন করতে পারবে যারা সজীব হৃদয়ের অধিকারী।

কারণ এই দীন জীবন সম্পন্ন দীন। অতএব সজীব ও জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারীদের দ্বারাই তা অটুট ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। ঐ সকল ব্যক্তিত্বকে হতে হবে পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীন, মহান চরিত্র ও আদর্শের অধিকারী। হতে হবে জ্ঞানগত পরিপক্বতা ও দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। হতে হবে পরিশ্রমী, কর্মতৎপর ও অক্লান্ত সাধনায় আত্মনিয়োজিত। দীন ইসলামের জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্রদেরকে এইসব গুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা শিক্ষা সমাপণ শেষে মাদরাসা হতে বের হয়ে জাতিকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করতে পারে। আমাদের পূর্বসূরী বুয়ুর্গগণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এটাই যে, তাঁরা এইসব গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল প্রশ্নাতীত ইলমী ও জ্ঞানগত যোগ্যতা। ফলে তাঁরা জাতিকে সঠিক পথ দেখাতে পেরেছেন এবং দীন ইসলাম সুসংরক্ষিত আকারে আমাদের নিকট পৌছেছে।

হযরত মাওলানা (রহ.) এই সকল বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ভাষণগুলো পাঠ করলে তালিবুল ইলম ভাইয়েরা নিজেদের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে এবং নিজেদের মধ্যে এক নতুন শক্তি আবিষ্কার করতে পারবে। মানসিক অস্থিরতা ও হীনমন্যতাকে দূরীভূত করতে পারবে। আমার বিশ্বাস, যে কোন পাঠকের জন্যই ভাষণগুলো অন্ধকার পথের আলোকবর্তিকা ও জীবনের সন্ধানদাতারূপে প্রমাণিত হবে।

হযরত (রহ.)-এর ভাষণ সংকলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড দাওয়াত বিষয়ক ষাষণের সংকলন হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকে হিম্মত ও তাওফীক দান করেন, যেন আমি উত্তমরূপে এই কাজ সম্পন্ন করতে পারি।

আমি ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁরা এই কাজে আমাকে শব রকম সহায়তা প্রদান করেছেন। বিশেষত যাঁদের কথা না বললেই নয়, তাঁরা হলেন মুহতারাম মৌলভী রশীদ (সাল্লামাহুল্লাহ), মুহাম্মদ হারুন মুআবিয়া এবং মুহতারাম মৌলভী মুহাম্মাদ সুফইয়ান বুলন্দশহরী। এঁদের প্রতি আমি সবিশেষ গুণাজ্ঞ। তাঁরা সংকলনটির কম্পোজিং থেকে শুরু করে মুদ্রণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে আমাকে সহায়তা করেছেন। এমনকি ভাষণগুলোর বিন্যস্তকরণ কাজেও তাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ৷৷৷ তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন।

সম্মানিত পাঠকবর্গের খেদমতে আবেদন থাকবে, ভাষণগুলোর কোথাও কোন একম ত্রুটি ও অসঙ্গতি দেখতে পেলে তাঁরা যেন সেটাকে আমার ত্রুটি বলে মনে করেন, মাওলানার নয়। কারণ বক্তৃতাসমূহে ত্রুটি থেকে যায় সংকলকের কারণে,

বক্তার কারণে নয়। আবেদন থাকবে, তাঁরা যেন ত্রুটিগুলো সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করতে পারি। আরও আবেদন থাকবে, তাঁরা যেন দু'আয় মাওলানার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও আসাতিয়ায়ে কেরামকে এবং সঙ্গী-সাথীবর্গকে স্মরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইখলাসের সাথে দ্বীনের খেদমত ও দাওয়াতের কাজের জন্য কবুল করুন। আমীন!

২১ জুমাদাল উলা ১৪২২ হিজরী
২২ আগস্ট ২০০১ ঈসায়ী, রোববার

মুহাম্মাদ রমযান মিঞা (নেপালী)

সূচিপত্র

❖ হযরত আব্বাস সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিঞা হাসানী নদভী নাওয়ারালাহ্ মারকাদাহ্-র সংক্ষিপ্ত জীবনী	২৭
নববী জ্ঞান অব্বেষণকারীদের মর্যাদা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৯
❖ মাদরাসা কাকে বলে?	৪০
❖ মাদরাসার গুরুদায়িত্ব	৪০
❖ শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সমাপনকারী আলেমে দ্বীনের গুরুদায়িত্ব	৪২
❖ আলেম ও তালিবুল ইলমের স্বাতন্ত্র্য	৪৪
❖ আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলী	৪৪
❖ মাদরাসার আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়	৪৬
❖ বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্ব	৪৬
❖ মাদরাসার দ্যুতিহীন পরিবেশ	৪৭
❖ বিশ্ব-নেতৃত্বের যোগ্যতার অধিকারীরা আজ অপরের অন্ধ অনুসারী	৪৮
❖ কেন এই হীনমন্যতা?	৪৯
❖ আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ	৪৯
❖ যাদের নিঃশ্বাসে জীবনের মর্যাদা রয়েছে আজও অক্ষুণ্ণ	৫২
❖ এটা সুখ ও আরামপ্রিয়তার পথ নয়	৫৪
❖ যুগ বড় অসহায় ও তৃষ্ণার্ত	৫৫
❖ ইলমে নববীই আসল সম্পদ	৫৬
❖ জীবনের সাথে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং তার জন্য আমাদের পূর্বসূরীদের সাধনা	৫৭
❖ যুগকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং যুগের দাবি পূরণ	৬৪
❖ পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন	৬৪
❖ দ্বীনের প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমুখী যোগ্যতার	৬৫
❖ নবাগত সকল মতবাদ ও তত্ত্ব তত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা অপরিহার্য	৬৫
❖ আধুনিক বিষয়ে অধ্যয়নের সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে করণীয়	৬৬
❖ ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠতা	৬৭
❖ আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন	৭০

❖ বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ	৭১
❖ আধুনিক যুগের ফেতনা	৭৩
❖ আধুনিক যুগে আমাদের দায়িত্ব	৭৪
একটি স্বাধীন মুসলিম দেশে আলিমগণের দায়িত্ব ও তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলী	৭৫
❖ আলেমগণ চিন্তা করুন	৭৮
❖ কিছু ভয়াবহ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ	৭৯
❖ জনগণের সাথে আলেমগণের ঘনিষ্ঠতা	৮২
❖ আলেমগণের জীবন হবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়	৮৩
❖ গোঁড়ামী ও হঠকারিতা পরিহার করা উচিত	৮৬
এই দীন জীবন্ত, জীবনধারীদের দ্বারাই তা টিকে আছে	৮৯
❖ ফয়েয ও বরকত মৃতদের দ্বারাও লাভ হয় কিন্তু দিক-নির্দেশনার কাজটি হয় শুধু জীবনের অধিকারীদের দ্বারাই	৯০
❖ দীন সর্বদা সজীব হতে থাকবে	৯১
❖ প্রতিটি শহরেই অভিজ্ঞ আলেম থাকা প্রয়োজন	৯৫
❖ শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির	৯৫
দ্বীনের সঙ্গে ইলমের চিরস্থায়ী সম্পর্ক	১০০
❖ ইসলামের সঙ্গে ইলম ও জ্ঞানের সম্পর্ক	১০০
❖ প্রথম ওহীতে ইলম ও কলমের উল্লেখ	১০১
❖ কুরআন সংরক্ষিত হওয়ার অর্থ	১০৩
❖ মাদরাসার শিক্ষা সমাপনকারীদের দায়িত্ব	১০৪
❖ জনসাধারণের দায়িত্ব	১০৫
❖ স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ	১০৬
ঈমানের দাওয়াত ও মানবতার পয়গাম	১০৮
❖ দাঈ'র সামনে কোন বাধাই টিকতে পারে না	১১১
❖ হিন্দুস্তানে আমাদের কিভাবে থাকা উচিত?	১১৪
❖ শিশুসুলভ মানসিকতা	১১৬
দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের মধ্যেই মুসলমানদের প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা নিহিত	১১৮
মাদরাসা ও মক্তব জাতির জন্য নিঃস্বাস স্বরূপ	১২৯
❖ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর চিন্তা ও কর্মধারা এবং মেজাজ ও প্রকৃতি	১২৯
❖ ঐ সকল বুয়ুগানে দীন জাতিকে কী দিয়েছেন?	১৩৩

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বীনী ইলমে

ইখলাস ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের গুরুত্ব

১৪১

❖ কোন এক শাস্ত্রে বিদ্বত্তমতা ও পাণ্ডিত্য সৃষ্টি করুন ১৪৩

❖ ইখলাস ও ইখতেসাস-এর গুরুত্ব ১৪৩

❖ মক্তুব ও মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা ১৫০

❖ নিজের দ্বীনের মূল্যায়ন করুন ১৫১

উলামায়ে রব্বানী তাঁদের মর্যাদা ও কর্মধারা

১৫৩

❖ আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী, তাঁদের জানশীন ১৫৩

❖ শিরক কী? ১৫৪

❖ দুই. জাহেলিয়াত ১৫৫

❖ বিদআত কী? ১৬৩

ইলমের মর্যাদা ও আলেমগণের দায়িত্ব

১৭১

❖ জ্ঞানের সম্পর্ক কলমের সাথে ১৭২

❖ জ্ঞানের সূচনা হওয়া উচিত প্রতিপালকের নামে ১৭৩

ইলমে দ্বীন শিক্ষাগ্রহণরত ও শিক্ষা সমাপনকারীদের

সফলতার জন্য অনিবার্য তিনটি শর্ত

১৮৩

❖ হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত
আলেমগণের স্মরণ ১৮৩

❖ যুগ পরিবর্তনের অভিযোগ ১৮৪

❖ আল্লাহর রীতি অপরিবর্তনীয় ১৮৬

❖ উপকারী সত্ত্বার অনুসন্ধান ১৮৮

❖ উপকারিত্ব গুণের সম্মোহনী শক্তি ১৮৯

❖ নির্লোভ ও নির্মোহতার শক্তি ও সুফল ১৯১

❖ চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করুন পৃথিবীর প্রীতিভাজন হোন ১৯২

যে ইলম বা জ্ঞান আল্লাহর নাম ব্যতীত হয়

তা মানবতা ধ্বংসের কারণ হবে

১৯৩

❖ রাসূলের প্রতি প্রথম ইলমী বার্তা ১৯৩

❖ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের নিকট কী দাবি করেন? ১৯৫

মানুষের বিপর্যয়ের কারণ জ্ঞান হতে আল্লাহর নামের বিচ্ছিন্নতা

১৯৮

আলেমগণের সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব আধুনিক যুগের

সন্দেহবাদী ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রশান্তি স্থাপন

২০৫

দ্বীনী শিক্ষাদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা অপরিহার্য	২১৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব ও উপকারিতাঃ	
কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে	২২৩
আকুড়া খটকে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদ এবং	
শহীদগণের রক্ত দারুল উলুম হক্কানিয়ার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে	২৩০
❖ শহীদের রক্ত বৃথা যায় না	২৩৪
আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ এবং উন্নতে মুহাম্মাদিয়ার দায়িত্ব	২৩৯
❖ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় শিবিরের চিন্তা-চেতনায় কোন পার্থক্য নেই	২৪০
❖ অল্পে তৃপ্তি এক মহাসম্পদ	২৪৭
❖ হিকমাহ বলে আখলাক বোঝানো হয়েছে	২৪৯
❖ তায়কিয়াহ ব্যতীত কিতাব ও হিকমাহ'র শিক্ষা অসম্পূর্ণ	২৫০
❖ চাটাইতে উপবেশনকারী কিছু নির্মোহ ব্যক্তির প্রয়োজন	২৫২
❖ এই শূন্যতা কোন কিছুই পূরণ করতে পারবে না	২৫৩
কঠিন চ্যালেঞ্জ ও সুদূরপ্রসারী কুফল সৃষ্টিকারী বিপদসমূহ	২৫৫
❖ ঐতিহাসিক ফেতনা	২৫৬
আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ এবং মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের দায়িত্ব	২৬০
❖ মিল্লাতে ইসলামের দৃঢ় ও সত্যপন্থী আলেমগণের কীর্তি ও কর্ম	২৬০
❖ হক্কানী উলামায়ে কেরামের কীর্তিগাথা	২৬২
❖ মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবীর অবদান	২৬২
❖ ইয়াহুদী পরিকল্পনা	২৬৪
❖ আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত জরুরী	২৬৬
ইসলামী বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট	২৬৮
❖ পৃষ্ঠপোষক শক্তি	২৭২
জাতির অস্তিত্ব রক্ষা, শরীয়ত বাস্তবায়ন আন্দোলন ও	
ইসলামের বিজয় : কর্মধারা ও জাতীয় দায়িত্ব	২৭৫
ভিন্ন মেরুর দু'টি দল	২৮৯
❖ বলার মত অনেক কথাই আছে	২৯০
❖ দুইটি দল	২৯১
❖ যুগ দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে	২৯১
❖ দ্বীন কোন মিউজিয়াম বা যাদুঘর নয়	২৯২
❖ এই পজিশনকে কোন জীবন্ত জাতি, কোন বার্তাবাহক জাতি গ্রহণ	
করে নিতে পারে না	২৯৩

❖ শুধু প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভর করে কোন প্রতিষ্ঠান জীবিত থাকতে পারে না	২৯৪
❖ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুন্সেরীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা	২৯৮
❖ নাদওয়াতুল উলামার আন্দোলন চূড়ান্ত দ্বীনী দূরদর্শিতার পরিচায়ক	২৯৯
❖ করার মত দুটি কাজ	২৯৯
❖ ইউনানী চিকিৎসা ধারা অবলুপ্তি ঘটেছে যোগ্য চিকিৎসকের অভাবে	৩০১
❖ মাদরাসার অবস্থাও তদ্রূপ	৩০১
❖ প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রমের অভাব	৩০৩
❖ আসল কথা	৩০৪
❖ দ্বীনী যোগ্যতাও অর্জন করুন	৩০৫
❖ আমার আবেদন	৩০৮
❖ অনুকম্পা লাভের আবেদনের উপর ভিত্তি করে কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না	৩০৮

ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

নিজেকে নিলামের বাজারে উঠাবেন না

গম্ভব্য কোথায়?

❖ উম্মতের প্রতি নবীগণের অসাধারণ মমতা ও ভালবাসা	৩৩৬
❖ দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার নিশ্চয়তা	৩৪২
❖ নবীগণের মীরাছ	৩৪৫
❖ ধ্বংসের উপকরণ	৩৪৯
❖ বিশৃঙ্খলার চিকিৎসা	৩৫১
❖ নিজেকে জাতির কল্যাণে বিলীন কর	৩৫২
❖ দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ান	৩৫৪
❖ জান ও মালের কুরবানী পুরো জাতির জন্য রক্ষাকবচ	৩৫৬
❖ যুগের ধ্বনি অনুধাবন করুন	৩৫৭
❖ সম্মানের সাথে জীবন ধারণের পথ কোনটি?	৩৫৮

পথের বার্তা

❖ ইউরোপে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক	৩৬৪
নেয়ামতে ইসলামের মূল্যায়ন ও তার জন্য শোকর আদায়করণ	৩৬৯
ভালবাসা ও নিখাদ রূহানিয়াতের বিজয়	৩৭৭

হযরত আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিঞা হাসানী নদভী নাওয়ার্দ্দাহ্ মারকাদাহ্-র সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর চিন্তা-চেতনা, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদেদ দ্বীনী আন্দোলন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবীর হিকমতে দ্বীন, হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর জ্ঞান-গভীরতা, হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর জ্ঞানব্যাপ্তি, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর সংস্কার, হযরত মাওলানা ইলিয়াস দেহলভীর বিশ্ব বিস্তৃত দাওয়াত ও ফিকর, হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানীর দ্বীনী মর্যাদাবোধ, হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের রায়পুরীর বাইয়াত ও ইরশাদ, হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর আকীদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধকরণের আহ্বান-এর সমষ্টি যে ব্যক্তিত্ব তিনি হলেন হযরত আব্বাস সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিয়াঁ আল-হাসানী আন-নদভী (রহ.) ।

যাঁর পদচারণায় পাক-ভারত উপমহাদেশে শুধু নয়; বরং সমুগ্র মুসলিম বিশ্বে দাওয়াত ইলাল্লাহ-র ফিকির ও প্রেরণা জাঘত হয়েছে এবং তমসাস্থন্ন মানবজাতির সামনে দীন ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল।

ଜନ୍ମ

ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর তাকিয়াকালাঁ নামক স্থানে ৬ই মহররম, ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ৫ ডিসেম্বর ১৯১৩ ঈসাব্দী পবিত্র জুমুআর দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতা

তাঁর পিতার নাম হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই এবং মাতার নাম খাইরুন নিসা। ড. সাইয়েদ আবদুল আলী (মৃত্যু ১৩৮১ হিজরী) তাঁর বড় ভাই। তাঁর দুইজন বড় বোন ছিলেন। একজন আমাতুল্লাহ তাসনীম (মৃত্যু ১৩৯৫ হিজরী) অপরজন আমাতুল আযীয। তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা কুরআনের হাফেজা ছিলেন। তাঁর খালা, খালাতো বোন, মামী এবং ফুফু সকলেই কুরআন হিফয করেছিলেন। তাঁর

বয়স যখন নয় বৎসর তখন তাঁর পিতা ইত্তিকাল করেন এবং তাঁর ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে ১৩৮৮ হিজরী সনে তাঁর মাতা ইত্তিকাল করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় তাঁর মাতার নিকট। এরপর মাওলানা সাইয়েদ আযীযুর রহমান হাসানী এবং মাওলানা মাহমুদ আলীর নিকট কুরআন মাজীদ এবং উর্দু-ফার্সী পড়েন।

আরবী তালীম

তিনি আরবী তালীম গ্রহণ করেন শায়খ খলীল আরব মুহাম্মাদ আনসারী ইয়ামানী ও ড. তকীউদ্দীন হেলালী মারাকেশীর নিকট থেকে।

ইলমে তাফসীর

শায়খ খলীল আরব আনসারীর নিকট নির্বাচিত কয়েকটি সূরার তাফসীর পড়েছেন। অতঃপর ১৩৫১ হিজরী সনে লাহোরে অবস্থান করে হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর (মৃত্যু ১৩৬২ হিজরী) নিকট তাঁর তারতীব ও বিন্যাস অনুযায়ী সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠ করেন।

প্রাচ্য বিজ্ঞান

১৯২৭ ইং সনে লাক্সো ইউনিভার্সিটির ‘প্রাচ্য বিজ্ঞান’ বিভাগে ভর্তি হন। সে সময়ে তিনি ঐ ভার্শিটির সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। ভার্শিটি থেকে সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

ইলমে হাদীস

১৯২৯ সনে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হাযদার হাসান খানের হাদীসের ক্লাসে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফ পাঠ করেন।

১৯৩২ ইং সনে দারুল উলূম দেওবন্দে যেয়ে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাদীসের দরস দ্বারা উপকার হাসিল করেন এবং তাঁর তাফসীর ও উলূমুল কুরআনের ক্লাসেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

ইলমে ফিকহ

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত মাওলানা এজাজ আলী আমরুহী সাহেবের নিকট ফিকহের দরস গ্রহণ করেন।

ইলমে তাজবীদ

তিনি কারী আসগর আলী সাহেবের নিকট হাফসের রেওয়ায়েত মোতাবেক তাজবীদ শিক্ষা করেছেন।

বিবাহ

১৯৩৪ ইং সনে আপন মামাতো বোন সাইয়েদ আহমদ সাঈদ সাহেবের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত শাহ জিয়াউন নবীর পুত্রের কন্যা এবং মুফতী আবদুর রাজ্জাক সাহেবের কন্যার কন্যা। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খান তাঁর বিবাহ পড়ান। হযরত মাওলানা (রহ.)-এর কোন ঔরসজাত সন্তান ছিল না, কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাঁর মানসসন্তান ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যা লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি।

দর্শন

তিনি সাইয়েদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা সুলাইমান নদভীর নিকট দর্শনশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রে পরিণত হন। তাঁর জ্ঞান ও কর্মের ফয়েয হাসিল করেন এবং তাঁর জ্ঞান ও কর্মতৎপরতা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন।

সুলুক ও তরীকত

তিনি ১৯৩১ সনে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর শায়খ মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ ভাওয়ালপুরীর হাতে বায়আত হন। ১৯৪২ সনে শায়খের ইঙ্গিতে মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরীর খলীফা মাওলানা শাহ আবদুল কাদের রায়পুরীর হাতে বায়আত হন।

ইংরেজী শিক্ষা

১৯২৭ হতে ১৯৩০ সনের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ফলে ইসলাম বিষয়ক এবং আরব সভ্যতা ও ইতিহাস বিষয়ক ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি সরাসরি ইংরেজী ভাষায় পড়ে বোঝার যোগ্যতা অর্জন করেন।

লেবাস-পোশাক ও দৈহিক গড়ন

তাঁর দৈহিক উচ্চতা ছিল মাঝারি প্রকৃতির। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ছিলেন। চেহারা ছিল গোলাকৃতির। গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল। হাত ছিল মখমলের ন্যায় নরম ও কোমল। সব সময় সাদা কাপড় পরিধান করতে ভালবাসতেন, পায়জামা-পাঞ্জাবী পরতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ও মাহফিলে যেতে শেরওয়ানী পরিধান করতেন।

হযরত মাওলানার বিশেষ খাদেম হাজী আবদুর রাজ্জাক সাহেব বলেন, আমি ১৯৬০ সাল থেকে হযরতের সঙ্গে সফরে হযরে ছিলাম। তাঁর সবচেয়ে বড় চারিত্রিক গুণ ছিল বিনয় ও নম্রতা। তিনি আরও বলেন, এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে একবার কোন এক বিষয়ে অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং নিজের ক্রোধ ব্যক্ত করেছিলেন শুধু এই বলে যে, কষ্ট পেয়েছি। এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে তাঁকে সর্বাধিক আনন্দিত হতে দেখেছি তখন, যখন হারাম শরীফের চাবি সংরক্ষক কাবা শরীফের চৌকাঠের উপর চাবি রেখে তাঁকে তালা খুলতে ইশারা করেছিলেন আর তিনি তালা খুলে কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মহা সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

দুঃখের মুহূর্ত

সর্বাধিক দুঃখ ও বেদনাক্রান্ত হয়েছিলেন ১৯৬১ ইং সালে তাঁর বড় ভাই ড. সাইয়েদ আবদুল আলী সাহেবের ইন্তিকালের মুহূর্তে তাঁর কাছে থাকতে না পেরে। সে সময় তিনি বার্মার সফরে ছিলেন।

পছন্দ

ডিসেম্বর ও জানুয়ারী ব্যতীত বৎসরের দশ মাসই বরফ মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানি পান করতেন। সকালে নাশতার পরে এক পেয়ালা এবং আসরের পর দুই তিন পেয়ালা চা পান করার অভ্যাস ছিল। তাঁর চা হতে হত পেয়ালা ভর্তি এবং ঠোট পোড়ানো তীব্র গরম ও মুখ ফেরানো অতিশয় মিষ্টিযুক্ত।

মামুলাত

রাতের শেষ ভাগে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। ফজরের পর গোসল করার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। জীবনের শেষ দিকে দুর্বলতা ও নিদ্রাহীনতার কারণে ফজরের পর বিশ্রাম করতেন। সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে নাশতা ও লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। এরপর চাশতের নামায আদায় ও কুরআন কারীমের তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর দুই তিন সহায়তাকারীকে নিয়ে লিখতে পড়তে বসে যেতেন। সাড়ে বারোট্টা পর্যন্ত লেখালেখির কাজ করতেন এবং চিঠিপত্রের জবাব লিখতেন। বাদ জোহর দুপুরের খাবার খেতেন এবং খাবার খেয়েই শুয়ে পড়তেন। আসরের পূর্বে কখনও চিঠিপত্র নিয়ে বসতেন কখনও লোকজনকে সাক্ষাত দান করতেন আবার কখনও কুরআন মাজীদ পড়তেন।

বাদ আসর মেহমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। মাগরিবের নামাযের বিশ মিনিট পূর্বে নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করতেন। রায়বেরেলীতে থাকলে মাগরিবের পর ঘরে যেতেন। ইশার নামাযের পর খাবার গ্রহণ অতঃপর

কিছুক্ষণের জন্য লোকজনের সঙ্গে বসতেন। অতঃপর কিছুক্ষণ ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। রাত দশটার দিকে নিয়মিত শুয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল।

হাস্যরসিকতা

হযরত মাওলানার স্বভাবে গুরুত্ব ছিল না। তিনি স্বভাবজাতভাবেই প্রাণবন্ত ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। একবার ইঞ্জিনিয়ার ইমতিয়াজ সাহেব হযরতের পা টিপতে শুরু করলেন। হযরত বললেন, ভাই! আপনি আমার পা দাবানো ছাড়ুন। কারণ যেখানে আপনার হাত লাগে সেখানে তো বিল্ডিং দাঁড়িয়ে যায়।

দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার হাফেজ আতিকুর রহমান সাহেবকে যখন নদভী প্রেস বিভাগ হতে দারুল উলূমের মাতবাখের (বাবুর্চিখানা) পরিচালক হিসাবে বদলী করা হল তখন তিনি বিষয়টা হযরতকে জানালেন। হযরত বললেন, শুধু ৬ ও ৮-র পার্থক্য। অর্থাৎ مطبع (প্রেস) হতে مطبخ (বাবুর্চিখানা) বিভাগে বদলী করা হয়েছে।

এক চিঠিতে হযরত মাওলানা (রহ.) তাঁর একান্ত খাদেম হাজী আবদুর রাজ্জাক সাহেব সম্পর্কে লিখেছেন, সে আমার জীবনের সঙ্গী এবং বৃদ্ধকালের লাঠি।

ইলমী ও দাওয়াতী জীবন

১৯৩৮ ইং সনে সর্বপ্রথম আরবীতে লিখিত প্রবন্ধ সাইয়েদ রশীদ রেয়া মিসরীর পত্রিকা আলমানারে ছাপা হয়। প্রবন্ধটি ছিল সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর আন্দোলনের উপর লিখিত। ১৯৩৪ ইং সনে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাফসীর, হাদীস, আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও মানতেকের দরস দেন।

১৯৩৯ ইং সনে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে সফর করেন। এই সফরে হযরত শাহ আবদুল কাদের রায়পুরী এবং হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেই সময় থেকেই তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও নিয়মিত যোগাযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রথমোক্তজনের নিকট থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন আর দ্বিতীয়জনের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব অঙ্গীকার দিয়েছেন। আমৃত্যু তাঁদের সাথে এই সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল।

১৯৪৩ ইং সনে ‘আঞ্জুমানে তালীমাতে ইসলাম’ নামে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠান করেন। যেখানে তিনি কুরআনে কারীম ও সুন্নাতে নববীর পাঠ দানের ব্যবস্থা চালু করেন। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১৯৪৫ সনে নাদওয়াতুল উলামার মজলিসে এন্তেজামিয়ায় রোকন নির্বাচিত হন।

১৯৫১ সনে আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর প্রস্তাবে শিক্ষা বিভাগের নায়েব মুতামাদ হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন।

১৯৫১ সনে তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়াত বা মানবতার ডাক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। যেহেতু চারিত্রিক মূল্যবোধ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে পদদলিত করা হচ্ছিল, স্বার্থপরতা ও আত্মপূজার উন্মাদনা ভর করেছিল সকল মানুষের মস্তিষ্কে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত ও আবরর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল দ্রুতগতিতে তাই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন মানবতার ডাক আন্দোলন।

১৯৫৪ সনে সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর ইত্তিকালের পর সর্বসম্মতিক্রমে মু'তামাদে তালীম হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন।

১৯৫৯ সনে মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম (ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৬১ সনে বড় ভাই ডা. আবদুল আলী হাসানীর ইত্তিকালের পর নাদওয়াতুল উলামার নায়েম নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ সনে জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় বেশ কয়েকটি লেকচার প্রদান করেন। পরবর্তীতে যা النبوة والانبياء فى ضوء القرآن (নবুওয়াত ও নবী কুরআনের আলোকে) নামে প্রকাশিত হয়। যার নজীর মেলা দুসর।

সম্মান ও স্বীকৃতি, বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের সদস্যপদ

১৯৫৭ সনে দামেস্কের মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়াহর যোগাযোগ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সনে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাকল্পে মুক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্ব আনজাম দেন। ঐ সম্মেলনে বাদশাহ মাসউদ বিন আবদুল আযীয এবং লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট ইদ্রিস সানুসী উপস্থিত ছিলেন।

১৯৬২ সনে জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা প্রতিষ্ঠালগ্নে তাঁকে মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

রাবেতা আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার (রাবাত, মরক্কো) সম্মেলনে রাবেতায় আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন। এরপর নাদওয়াতুল উলামার প্রতিনিধি হিসাবে এই সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৮০ সনে জর্ডানের মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়ার রোকন মনোনীত হন।

১৯৮১ সনে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক পি. এইচ. ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

১৯৮৩ সনে অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে রাখেন।

১৯৮৪ সনে রাবেতা আল-আদাবিল ইসলামিয়া আল-আলিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকে তিনি এর আজীবন সভাপতি হিসাবে বহাল থাকেন।

১৯৬৮ সনে সউদী সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর আমন্ত্রণে শরীয়া বিভাগের পাঠ্যসূচী ও নিয়ম-কানুন প্রস্তুতের জন্য রিয়াদ গমন করেন।

১৯৩২ সনে নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা **الضياء** এবং ১৯৪০ সনে উর্দু পত্রিকা আন-নাদওয়ার সম্পাদনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সনে আঞ্জুমানে তালীমাতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে ‘তা’মীর’ নামে উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন।

১৯৫৮-৫৯ সনে দামেস্ক থেকে প্রকাশিত ‘আল-মুসলিমুন’ পত্রিকায় নিয়মিত সম্পাদকীয় লিখেছেন। প্রথম সম্পাদকীয় ছিল এই শিরোনামে **ردة ولا ابا بكر لها** যা উর্দুতে অনূদিত হয়ে ‘নতুন তুফান এবং তার মুকাবেলা’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া উস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন খতীবের ‘আল ফাতাহ’ পত্রিকাতেও তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৬৩ সনে লাক্সো থেকে ‘নেদায়ে মিল্লাত’ প্রকাশিত হতে শুরু করলে তিনি পত্রিকাটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৫ সালে নাদওয়া থেকে আরবী পুস্তিকা **البعث الاسلامي** এবং ১৯৫৯ সালে প্রকাশিতব্য আরবী পুস্তিকা **الرائد** এবং উর্দু ম্যাগাজিন পাক্ষিক তামীরে হায়াত এর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮০ সালে মুসলিম বিশ্বে তাঁর অনবদ্য ইলমী ও আমলী খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৪০০ হিজরী সনে বাদশাহ ফয়সাল এওয়ার্ড দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এই এওয়ার্ডে সৌদী দুই লাখ চল্লিশ হাজার রিয়াল ও একটি সনদপত্র তাঁর

হাতে তুলে দেওয়া হয়। তৎকালীন ভারতীয় রূপী হিসাবে ঐ অর্থের পরিমাণ ছিল চব্বিশ লাখ রূপী। হযরত মাওলানা মরহুম এই অর্থের অর্ধেক দান করেন আফগান শরণার্থীদের জন্য এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অর্থ মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত ইদারাতুল হিফযুল কুরআন ও সাওলাতিয়া মাদরাসায় সমান ভাগে ভাগ করে দান করেন।

হযরত সুলাইমান নদভী প্রণীত সীরাতুন নবী গ্রন্থখানির অষ্টম খণ্ডের ভূমিকা মাওলানা লিখে দিয়েছিলেন। কিতাবটি পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁকে এক লাখ টাকার এওয়ার্ড দান করেন। হযরত মাওলানা এই টাকার অর্ধেক আযমগড়ের ‘দারুল মুসান্নিফীন’ প্রতিষ্ঠানে দান করেন। আর অর্ধেক সাইয়েদ সুলাইমান নদভী মরহুমের স্ত্রীকে দিয়ে দেন।

১৯৯৯ সনে একটি শানদার অনুষ্ঠানে ‘ইসলামী বিশ্বের মহান ইসলামী ব্যক্তিত্ব’ এওয়ার্ড মাওলানাকে প্রদান করা হয়। এই এওয়ার্ডের অর্থের পরিমাণ ছিল এক কোটি বিশ লাখ রূপী। এই টাকাও সম্পূর্ণরূপে তিনি ভারতের বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন।

এই বছরেই অক্সফোর্ড ইসলামী সেন্টারের পক্ষ থেকে ‘তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত’-এর জন্য তাঁকে সুলতান হাসান বুলকিয়া ব্রুনাই ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এই অর্থও তিনি তাঁর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন ও অভাবী ব্যক্তিদেরকে দান করে দেন।

দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রসমূহের রোকন হিসাবে তাঁকে নির্বাচন

- ❖ ৮ই জুন ১৯৬১ দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার নাযেম নির্বাচিত হন।
- ❖ সভাপতি, তালীমী কাউন্সিল, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
- ❖ সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ‘ল’ বোর্ড, ভারত।
- ❖ সভাপতি, মজলিসে ইত্তেজামী ও মজলিসে আমেলা, আযমগড়।
- ❖ সভাপতি, ইসলামিক সেন্টার অক্সফোর্ড লন্ডন, বৃটেন।
- ❖ সভাপতি, ফাউন্ডেশন ফার স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, লুক্সেমবার্গ।
- ❖ সভাপতি, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াত ইসলামী লাখনৌ, ভারত।
- ❖ সভাপতি, আলমী রাবেতা আদবে ইসলামী।
- ❖ রোকন, মুআসসাসাহ আলে বাইত, ওমান, জর্ডান।
- ❖ প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়াত, ভারত।

- ❖ রোকন, মজলিসে তাসীসী রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, সৌদী আরব ।
- ❖ রোকন, মজলিসে শুরা জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা ।
- ❖ রোকন, আরবী একাডেমী, দামেশক, কায়রো ও জর্ডান ।
- ❖ রোকন, মজলিসে আমেলা, মুতামার আলমে ইসলামী বৈরুত, লেবানন ।
- ❖ রোকন, মজলিসে এন্তেজামী ইসলামিক সেন্টার, জেনেভা ।
- ❖ রোকন, মজলিসে ফিকহে ইসলামী, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, সৌদী আরব ।
- ❖ রোকন, মজলিসে শূরা দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত ।
- ❖ রোকন, মজলিসে আমেলা, ইসলামিক ইউনিভার্সিটিজ ফেডারেশন, রাবাত, মরক্কো ।
- ❖ রোকন, একাডেমী অব অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজেস, ওমান ।
- ❖ রোকন, ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফার ট্রান্সলেশন রিসার্চ এন্ড স্ট্যাডিজ, তিউনিস ।
- ❖ ভিজিটিং প্রফেসর, দামেশক-মদীনা ইউনিভার্সিটি, সৌদী আরব ।

মাওলানার সফরসমূহ

১৯২৯ সালে লাহোর সফর করেছেন । এটাই ছিল প্রথম দূরের সফর । এই সফরে লাহোরের ইলমী ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব ও বুয়ুর্গগণের সঙ্গে সাক্ষাত করেন । এই সফরে প্রাচ্যের কবি ড. মুহাম্মাদ ইকবালের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থ **جانده** এর আরবী অনুবাদ তাঁর সামনে পেশ করেন । মাওলানা নিজেই আরবীতে কাব্যগ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন ।

১৯৩৫ সনে হরিজন নেতা ড. আশ্বেদকরকে ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে বোম্বে সফর করেন ।

১৯৪৭ সনে হজ্জের সফর করেন । এটাই ছিল তাঁর হজ্জের প্রথম সফর । বহির্দেশের সফর এটাই ছিল প্রথম । কয়েক মাস হিজাজে অবস্থান করেন । হজ্জের দ্বিতীয় সফর হয়েছিল ১৯৫০ সনে । হজ্জ সমাপণান্তে সেখান থেকে মিশর, সুদান, জর্ডান ও শামের সফর করেন ।

১৯৫১ সনে মিশরের প্রথম সফর করেন । মাওলানার গমনের পূর্বেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين** সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং কিতাবটি যেমন সেখানকার সর্বস্তরের বিদ্যানদের কাছে ব্যাপক পরিচিতি

লাভ করেছিল, তেমনি কিতাবটির বদৌলতে তিনিও পূর্ব থেকে সেখানে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই সফরেই ফিলিস্তিন গমন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। ফিরতি পথে জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

১৯৫৬ সনে তুর্কী সফর করেন। তুর্কীতে এটাই ছিল প্রথম সফর। এই সফরের বিবরণী ‘তুর্কীতে দুই সপ্তাহ’ নামে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই লেবানন সফর করেন।

১৯৬০ সনে বার্মা সফর করেন।

১৯৬২ সনে কুয়েতের প্রথম সফর করেন। পরবর্তীতে কুয়েত সহ উপসাগরীয় দেশসমূহে একাধিকবার সফর করেন। জর্ডান ও ইয়েমেনেও সফর করেছেন।

১৯৬৩ সনে ইউরোপ সফর করেন। এটাই ছিল ইউরোপে প্রথম সফর। এই সফরে লন্ডন, প্যারিস, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছেন এবং স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে গিয়েছেন।

১৯৭৬ সনে মসজিদে আকসা সফর করেছেন।

১৯৭৭ সনে আমেরিকার প্রথম সফর হয়েছে। এই সফর ছিল দুই মাস দশ দিনের। এই সফরে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে গিয়েছেন এবং দ্বীনী ও দাওয়াতী শ্রদ্ধা প্রদান করেছেন। এই সফরে চোখেরও অপারেশন করিয়েছেন।

১৯৭৭ সনে আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান এবং লেবাননের উদ্দেশ্যে রাবেতায় আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান করেছেন।

১৯৮৫ সনে বেলজিয়াম সফর করেছেন।

১৯৮৭ সনে তাসখন্দ, সমরকন্দ প্রভৃতি শহর সফর করেছেন।

জর্ডানে সফর করেছেন ১৯৭৩ ও ১৯৮৪ সনে।

স্পেনে ১৯৭৩ সনে।

সংযুক্ত আরব আমীরাতে ১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৮৩, ১৯৮৮, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৯ সনে।

উত্তর আমেরিকা সফর করেছেন ১৯৭৭ ও ১৯৯৩ সনে।

ইউরোপ সফর করেছেন ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৮৩, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৩ সনে।

ইরান, সফর করেছেন ১৯৭৩ সনে।

পাকিস্তান সফর করেছেন ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৬ সনে।
বোথারা সফর করেছেন ১৯৮৬ সনে।
বুটেনে সফর করেছেন ১৯৬৩ সনে এবং ১৯৮৫ সনে।
বার্মা সফর করেছেন ১৯৬০ সনে।
তুর্কী সফর করেছেন ১৯৫৬, ১৯৬৪, ১৯৮৯, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৯ সনে।
আল-জাযায়ের সফর করেছেন ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সনে।
হেজাজ সফর করেছেন ১৯৪৭, ১৯৫১, ১৯৬২, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সনে।
কাতার সফর করেছেন ১৯৭৯ ও ১৯৯৫ সনে।
রাবাত সফর করেছেন ১৯৭৬ সনে।
শ্রীলংকা সফর করেছেন ১৯৮২ সনে।
সমরকন্দ সফর করেছেন ১৯৯৩ সনে।
সুদান সফর করেছেন ১৯৫১ সনে।
শাম সফর করেছেন ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৬৪ ও ১৯৭৩ সনে।
ইরাক সফর করেছেন ১৯৫৬ ও ১৯৭৩ সনে।
ওমান সফর করেছেন ১৯৫১, ১৯৭৩, ১৯৮৪ ও ১৯৯৮ সনে।
ফিলিস্তিন সফর করেছেন ১৯৫১ সনে।
কুয়েত ১৯৬২, ১৯৬৮, ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সনে।
লেবানন ১৯৫৬, ১৯৭৩ সনে।
লাহোর ১৯৬৯ সনে।
মালয়েশিয়া ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সনে।
মরক্কো ১৯৮৬ সনে।
মিশর ১৯৫১ সনে।
নেপাল ১৯৯২ সনে।
ইয়েমেন ১৯৮৪ সনে।
বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভাষণ সমগ্র-১

উলামা-তলাবা

পরিচিতি, মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য

নববী জ্ঞান অন্বেষণকারীদের মর্যাদা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৯৫৪ ইং সনের মার্চ মাসে দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রদের এক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। এতে দ্বীনী মাদরাসাসমূহের শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সমাপনকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাঁদের নিকট বর্তমান যুগের চাহিদা ও প্রত্যাশা কী, এই প্রত্যাশা পূরণে দ্বীনের দাঈ ও খাদেম হিসাবে তাঁদের কীরূপ প্রস্তুতি প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করছি— লিখিতরূপে ভাষণটি তাঁদের জন্য যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক ও উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। - সংকলক

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
يَدْعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
رَبِّ اِشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاَحْلِلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আপনারা একটি দ্বীনী মাদরাসার তালিবুল ইলম ও ছাত্র। আমিও দ্বীনী মাদরাসার একজন খাদেম ও সেবক এবং আপনাদেরই সফর-সঙ্গী। এই মুহূর্তে আমার জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাসমূহ, সীমিত অধ্যবসায় ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল এবং জীবন চলার পথে অর্জিত সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয় সওয়াব অকৃত্রিমভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করাই সময়ের নাজকুতা ও আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের দাবি। আপনারা আমাকে কথা বলার সুযোগ দান করে সম্মানিত করেছেন, আমার উপর আপনাদের আস্থার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা ও লক্ষ্য হওয়া উচিত, আপনাদের আস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করা, সবিশেষ মর্যাদা দান করা এবং এই স্বল্প সময়কে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। কারণ, এই

সময়টুকু আপনারা আপনাদের মহা মূল্যবান ব্যস্ত সময় থেকে বের করে এখানে সমবেত হয়েছেন। সময়টুকু ঐ সকল ব্যক্তির সময় যাদের প্রতিটি সেকেণ্ড প্রতিটি মুহূর্ত মাসাধিক ও বৎসরাধিক কালের সঙ্গে তুলনীয়।

মাদরাসা কাকে বলে?

আমাদের সকলের সর্বপ্রথম অবগত হওয়া উচিত যে, একটি দ্বীনী মাদরাসার মূল্যমান ও মর্যাদাগত অবস্থান কত উচ্চে? মাদরাসা একটি বৃহৎ কারখানা। মানুষ গড়ার কারখানা। ব্যক্তি গঠনের কারখানা। এখানে দ্বীনের দাঁড় এবং ইসলামের সৈনিক তৈরি করা হয়। মাদরাসা ইসলামী বিশ্বের বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা (Power House), যেখান থেকে মুসলিম জাতির মাঝে বরং গোটা মানবজাতির মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এ এরূপ এক কারখানা যেখানে হৃদয় ও দৃষ্টি, মন ও মস্তিষ্ক যথারূপে গড়ে ওঠে। মাদরাসা এরূপ এক স্থান যেখান থেকে সমগ্র জীবন জগতকে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং গোটা মানব জীবনের তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালিত হয়, যেখানকার ফরমান জগত জুড়ে কার্যকর কিন্তু জগতের ফরমান যেখানে কার্যকর নয়। তথাকথিত কোন আদর্শ ও মূল্যবোধ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কোন ভাষা ও সাহিত্য, কোন নির্দিষ্ট যুগ ও কালের সাথে মাদরাসার সম্পর্ক নয় যে তা প্রাচীনত্ব দোষে দোষযুক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে কিংবা তা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। মাদরাসার সম্পর্ক সরাসরি নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঙ্গে, যার আবেদন জগৎ জোড়া যা চিরজীবন্ত। মাদরাসার সম্পর্ক ঐ ইনসানিয়াত ও মানবতার সাথে যা চিরযুবা, ঐ জীবনের সাথে যা সদা চলমান। সত্যি বলতে কি, মাদরাসা প্রাচীন কি নবীন- এই বিতর্কের অনেক উর্ধ্বে। এ তো এমন এক স্থান যেখানে পাওয়া যায় নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর চিরন্তনত্ব, জীবনের উৎকর্ষের সন্ধান, জীবনের স্পন্দন ও আলোড়ন।

মাদরাসার গুরুদায়িত্ব

সুধী!

মাদরাসা ‘সেকেলে শিক্ষাব্যবস্থার নমুনা সংরক্ষণকারী জাদুঘর বিশেষ’ কিংবা তা ‘পুরাত্নতার স্মারক বিশেষ’ -মাদরাসা সম্পর্কে এতদপেক্ষা অন্যায় ও আপত্তিকর অভিধা আর হতে পারে না। আমি এটাকে মাদরাসার সাধারণ পরিচিতিরও পরিপন্থী, ন্যূনতম মর্যাদারও হানীকর বলে মনে করি। আমি বিশ্বাস করি- মাদরাসা সর্বাপেক্ষা দৃঢ়, শক্তিশালী, সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন এবং প্রাণচাঞ্চল্যে

ভরপুর এক প্রতিষ্ঠান। এর এক প্রান্ত যুক্ত নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঙ্গে, অপর প্রান্ত যুক্ত এই জীবন জগতের সঙ্গে। নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঞ্জীবনী বরনা হতে তা পানি সংগ্রহ করে বিস্তীর্ণ জীবন ক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করে। মাদরাসা যদি তার এই সেচকার্য পরিত্যাগ করে তবে জীবনক্ষেত্র পরিণত হতে থাকবে শুষ্ক মরুভূমিতে, মানবতার ঘটবে মৃত্যু। না নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সমৃদ্ধ বরনা হতে অকৃপণ দানের কোন প্রকার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বিদ্যমান, না মানবজাতির অভাবী পেয়ালার পক্ষ হতে তা গ্রহণে কুণ্ঠা প্রকাশ বিদ্যমান। এদিকে انما انا قاسم واللّٰه يعطى (আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ তাআলা দান করেন)-এর বারংবার উচ্চারণ, ওদিকে هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ (আর আছে কি, আর আছে কি?)-এর অব্যাহত চাহিদাধ্বনি। এই পৃথিবীতে মাদরাসা অপেক্ষা অধিক জীবন্ত, অধিক প্রাণচঞ্চল ও ব্যস্ত প্রতিষ্ঠান আর কোন্টিকে আপনারা দেখাতে পারবেন? জীবনের সমস্যা অগণিত, জীবনের নানা রকম পরিবর্তন অগণিত, জীবনের প্রয়োজন অগণিত, জীবনের ভ্রান্তি অগণিত, জীবন পথে স্থলন অগণিত, জীবনের প্রবঞ্চনা অগণিত, জীবন-পথের পথ-দস্যু অগণিত, জীবনের আকাজক্ষা ও উচ্চাশা অগণিত ও অসংখ্য। মাদরাসা যখন জীবনের পথ প্রদর্শন এবং পথ চলায় জীবনকে সহায়তা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তখন তার ক্লাস্ত সময় অতিবাহিত করার অবকাশ কোথায়? পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীর, প্রত্যেকটি ব্যক্তির, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বিশ্রাম গ্রহণ ও অবকাশ যাপনের অধিকার আছে। তাদের সকলেরই ছুটি গ্রহণের সুযোগ লাভ হতে পারে কিন্তু মাদরাসার কোন ছুটি নাই। দুনিয়ায় সকল অভিযাত্রীর জন্যই বিশ্রামের সুযোগ আছে, কিন্তু মাদরাসা নামক এই অভিযাত্রীর জন্য ছুটি ভোগ হারাম। জীবন চলায় যদি কোন বিরতি থাকত, জীবনের গতিতে যদি যতি ও স্থিরতা বলে কিছু থাকত তাহলে না হয় মাদরাসাও কিছুটা দম নিয়ে নিতে পারত। কিন্তু জীবন যখন সতত চলমান, সদা গতিশীল, তখন মাদরাসার জন্য নিষ্ক্রিয়তা ও অলস সময় উদযাপনের সুযোগ কোথায়? তাকে তো পদে পদে জীবনের হিসাব গ্রহণ করতে হবে। নিত্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত দানে টলায়মান পদসমূহকে দৃঢ় ও অনড় পদে পরিণত করতে হবে। মাদরাসা যদি জীবন থেকে দূরে অবস্থান করে অথবা ক্লাস্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে অথবা কোন এক মনযিলে নিশ্চল স্থানুবৎ হয়ে পড়ে অথবা কোন এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে আত্মতুষ্টিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তাহলে জীবনের সঙ্গদান, জীবনের নেতৃত্ব দানের গুরুদায়িত্ব কে পালন করবে? জীবনকে শ্বাশত বীনার সুর-লহরি, পয়গামে মুহাম্মাদী শোনাবে

কে? মাদরাসার নিষ্ক্রিয়তা, নেতৃত্ব দান হতে পিছু হটা, কোন মনযিলে নিশ্চল হয়ে পড়া আত্মহত্যার শামিল, মানবতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক। আত্মপরিচয়ে সমৃদ্ধ, কর্তব্য-সচেতন কোন মাদরাসার পক্ষে এহেন কল্লনাও দুঃসাধ্য।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সমাপনকারী আলেমে দ্বীনের গুরুদায়িত্ব

বন্ধুগণ!

মাদরাসা-শিক্ষার্থী ও তালিবুল ইলম হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব সর্বাধিক নাজুক, সর্বাধিক মহান।

বর্তমান পৃথিবীতে অপর কোন দল ও গোষ্ঠীর কাঁধে এরূপ নাজুক, এত ব্যাপক ও এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে বলে আমার জানা নাই। এই কথাটি পুনরায় স্মরণ করুন যে, আপনার এক প্রান্ত সংযুক্ত নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঙ্গে, অপর প্রান্ত সংযুক্ত জীবন জগতের সঙ্গে। এটাই আপনাদের মহানত্বের রহস্য। নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঙ্গে সংযোগ একদিকে যেমন মহা সৌভাগ্য ও মহাপ্রাপ্তি। অপর দিকে তা তেমনি অপরিস্রব মহা দায়িত্বের কারণ। আপনাদের নিকট আছে পরম সত্য এবং আকীদা-বিশ্বাস নামক মহা মূল্যবান সম্পদ।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঙ্গে এই সম্পৃক্ততার কারণে আপনাদের উপর বেশ কিছু দায়িত্ব বর্তায়। আপনাদের মধ্যে থাকা উচিত দৃঢ় ঈমান, অবিচল আস্থা ও ইয়াকীন। এরূপ সাহস ও দৃঢ়তা থাকা উচিত যেন সমগ্র জগতের বিনিময়েও নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর এক বিন্দু উত্তরাধিকারও হাতছাড়া হওয়ার প্রশ্নে আপোষের চিন্তা মস্তিষ্কে স্থান না পায়। হৃদয় পূর্ণ থাকা উচিত এর নুসরাত ও সহায়তার উদ্বল আবেগে। আপনাদের অন্তর থাকবে এই অমূল্য সম্পদের গর্বে গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এর সত্যতা ও যথার্থতা, এর যৌক্তিকতা ও চিরন্তনতা, এর সর্বকালীন উপযোগিতা, এর ব্যাপ্তি ও বিশালতা, এর অতুল্য মর্যাদা এবং এর বিশুদ্ধতা ও পূর্ণাঙ্গতার ব্যাপারে আপনাদের অন্তরে থাকবে অবিচল ইয়াকীন, দ্বিধাহীন বিশ্বাস। এর বিপরীতে অন্য সবকিছুকে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে জাহিলিয়াত ও মূর্খতার উত্তরাধিকার বলে জ্ঞান করবেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও ইসলামী শিক্ষা কানে পড়লে আপনারা যেখানে বলবেন سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (শুনলাম এবং মানলাম), সেখানে জাহিলিয়াত প্রসূত বিধিব্যবস্থা ও তার ধ্বজাধারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন,

كُفِّرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
 ۱

আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ; যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।

(সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

ইসলামের দিক-নির্দেশনা এবং রাসূলের আদর্শের মধ্যেই জগতের মুক্তি নিহিত বলে বিশ্বাস রাখবেন। এই বিশ্বাস আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকবে যে, আধুনিক নুহী প্রাবনে নুহ (আ.)-এর কিশতী একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত এবং শুধুই তাঁর ইমামত ও নেতৃত্ব। আপনাদের ইয়াকীন থাকবে যে, ব্যক্তি ও সমষ্টির সফলতা এবং উৎকর্ষ ও উন্নতির শীর্ষে পৌঁছার শর্ত একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। এটা যথার্থ সত্য যে,

محمد عربی کما برؤئے ہر دودر است کیسکہ خاک درش نیست خاک بر سراد

আরবের মুহাম্মাদ উভয় জাহানের ইজ্জত ও সম্মান, যার মাঝে তাঁর আদর্শের উর্বর মাটি নেই, তার ললাট ধুলোয় লুটাক।

আপনারা নববী শিক্ষার যথার্থ মর্ম, এর গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম। সুতরাং এর বিপরীতে জগতের সকল মতবাদ ও দর্শনকে সকল পরাবাস্তব ও অনুমান নির্ভর জ্ঞান বিজ্ঞানকে, সকল তত্ত্বকথা ও বুলিকে অসার ও কল্প-কাহিনী অপেক্ষা বেশি কিছু মনে করবেন না। আপনারা তাওহীদের মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করত তাওহীদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে বদ্ধমূল রাখবেন। শিরকসহ জগতে প্রচলিত সকল মানব-মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে— চাই তা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিভাষায় এবং দার্শনিক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হোক— বাগাড়ম্বর ও ফাঁকা বুলিসর্বস্ব তুচ্ছ বিষয় বলে জ্ঞান করবেন। *زخرف القول غرورا* (তাক লাগানো প্রবঞ্চনাকর বাক্য) অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করতে কখনই প্রস্তুত হবেন না। সুন্নাহের অনুসরণে অতিশয় আকাঙ্ক্ষী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলে বিশ্বাস রাখবেন। বিদআত যে ক্ষতিকর এবং সর্বনাশা সে সম্পর্কে আপনাদের অন্তরে থাকবে স্বচ্ছ বিশ্বাস। মোটকথা আপনারা হবেন বিশ্বাস ও মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও আধ্যাত্মিকতা, মেজাজ ও প্রকৃতি, আমল ও কার্য ইত্যাদি সকল দিক থেকে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর পূর্ণাঙ্গতা ও তার বাস্তবে প্রয়োগ উপযোগিতার প্রবক্তা এবং বাস্তব নমুনা।

আলেম ও তালিবুল ইলমের স্বাতন্ত্র্য

বন্ধুগণ! পৃথিবীর অন্য সকলের তুলনায় আপনাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের ও আপনাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপর্যুক্ত সত্যসমূহে সাদামাটা ঈমান আনাই অন্যদের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু আপনাদের জন্য এইসব বিষয়ে মানসিক প্রশান্তি, চিন্তাগত স্বচ্ছতা ও হৃদয়ে ঔজ্জ্বল্য থাকতে হবে। শুধু বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তিই আপনাদের জন্য যথেষ্ট নয়, আপনাদের জন্য জরুরী দ্বীনের প্রচারক ও দাঁষ্ট হওয়া, দ্বীন বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ হওয়া। অন্যদের ঈমান যদি ঈমানধারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবুও যথেষ্ট কিন্তু আপনাদের ঈমান হতে হবে আপনাদের সত্ত্বা অতিক্রম করত অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী, যা শত-সহস্র মানুষকে ইয়াকীন ও বিশ্বাসে আপ্ত করবে। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আপনাদের এই আবেগাপ্তি আত্মবিলোপের স্তরে উপনীত হয় এবং যতক্ষণ না আপনাদের মধ্যে **يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار** (কুফরীতে প্রত্যাবর্তন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় অপছন্দ করে)-এর ভাবার্থ ও তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়। নববী শিক্ষা সম্পর্কে অন্যদের ভাষা ভাষা জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনাদের জন্য এই জ্ঞানে পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতা, নিপুণতা ও দৃঢ়তা অপরিহার্য।

(অপরিহার্য এই ইলমের প্রতি ইশক ও প্রেম, অনুরাগ ও ভালবাসা। অতীব জরুরী নববী ইলমে আত্মলীনতা, একগ্রতা ও অনন্যমনস্কতা। এতদ্ব্যতীত দাওয়াতী কার্যক্রমের কল্লনাও অর্থহীন। বরং বহুমুখী দাওয়াত ও প্রচার-প্রচারণার এই মহা প্লাবনের যুগে উপর্যুক্ত গুণাবলী ব্যতীত নিজের ঈমানী বৈশিষ্ট্যাবলী ও ঈমানী সম্পদকে রক্ষা করাও সুকঠিন ও দুরূহ ব্যাপার।)

আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলী

এটাও স্মরণ রাখুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম জ্ঞানরাশি ও বাহ্য বিধানাবলীর বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন—

فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم

‘কেননা নবীগণ দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকার ছেড়ে যান না তাঁরা উত্তরাধিকারীদের জন্য যা রেখে যান তা হচ্ছে ইলম ও জ্ঞান ভাণ্ডার।’

এই জ্ঞান কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আকারে সংরক্ষিত আছে এবং আপনাদের মাদরাসা আলহামদুলিল্লাহ সেই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের সংরক্ষণ,

প্রতিপালন, পরিষেবা ও প্রচার-প্রসারের বিশাল এক কেন্দ্র। উলূমে নবুওয়াত ও বাহ্য বিধানাবলীর সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, কিছু আত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলীর উত্তরাধিকারও রেখে গেছেন। প্রথম প্রকার সম্পদ যেরূপ যুগ হতে যুগান্তরে, প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তার সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন, তদ্রূপ দ্বিতীয় প্রকারের সম্পদও যুগ ও প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে এসেছে এবং এর সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সম্পন্ন করেছেন আল্লাহ রাক্বুল আলামীন। সেই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী হচ্ছে— ইয়াকীন ও ইখলাস, ঈমান ও ইহতিসাব তথা বিশ্বাস ও নিয়তের পরিশুদ্ধতা, সকল কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাআলুক মাতাআল্লাহ ও আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, ইনাবত ও ইখবাত তথা আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহ-নিবিষ্টতা, খুশুখুয়ু, বিনয় ও নম্রতা, দুআ ও ইবতিহাল তথা প্রার্থনা ও কাকুতি- মিনতি, আত্ম বিনাশন ও আত্মমর্যাদা সচেতনতা ইত্যাদি। উলূম ও আহকাম— জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাহ্য বিধানাবলী এবং আত্মিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী— এই উভয়বিধ সম্পদের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল নবুওয়াতে মুহাম্মাদীতে। নবুওয়াতে মুহাম্মাদী ছিল উভয় প্রকার সম্পদের আকর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

‘তিনিই উম্মীদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য হতে একজন রাসূলকে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হেকমত।’ (সূরা জুমুআ : ২)

নবুওয়াতে মুহাম্মাদী হতে বাহ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিধানাবলী গ্রহণ আর অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাবলী ও আত্মিক গুণাবলী বিবর্জন আসলে ক্রটিপূর্ণ উত্তরাধিকারিত্ব, অসম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব। যাঁরা নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যাঁরা ইসলামের মহা মূল্যবান আমানত আমাদের নিকট বয়ে এনেছেন তাঁরা কখনই একটিমাত্র অংশের ধারক ও বাহক ছিলেন না। তাঁরা উভয়বিধ ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিলেন, উভয় প্রকার সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। শুধু প্রথম অংশ দ্বারা বর্তমান যুগেও ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। নিকট অতীতের যে সকল আসলাফ ও পূর্বসূরীর সাথে সম্পৃক্ততার সৌভাগ্যে আপনারা সৌভাগ্যবান তাঁদের মধ্যেও সমাবেশ ঘটেছিল এই উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যের। আপনারা যদি প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের অতুচ্ছ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার

ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে চান তবে আপনাদেরকেও এই উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে সমানভাবে। এতদ্ব্যতীত ইলম ও জ্ঞানের পাণ্ডিত্য পরিণত হবে সৌরভ ও সজীবতাহীন কাগজের ফুলে। বর্তমান দুনিয়ার কোথাও কাণ্ডজে ফুলের কোন অভাব নেই। আরও কিছু কাণ্ডজে ফুল বৃদ্ধি করে আমরা কিছু নতুন মাত্রা সৃষ্টি করতে পারব না। এখানে তো প্রয়োজন বাগে নবুওয়াতের সজীব ও সুরভিত ফুল, যা জীবনতন্ত্রীকে করবে আন্দোলিত, আপন সৌরভে জীবন জগতকে করবে মাতোয়ারা। কৃত্রিম কাগজের ফুল যার সামনে লজ্জায় হবে অবনত।

فَرَّقَ الْحَقُّ وَيَطْلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ : সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তাদের কর্ম মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। (সূরা আরাফ ১১৮)

মাদরাসার আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়

আমার পরবর্তী কথায় আপনারা দুঃখ পাবেন না। এই অধম কথকও আপনাদেরই একজন। আমাদের এই মাদরাসাগুলো ঐ ফুলের সজীবতা হারাচ্ছে। আলেম ও তালিবুল ইলমদের মধ্যে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের শোনা উচিত এবং ভাবা উচিত, কবির এই কথার সত্যতা কতটুকু?

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک
نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

মাদরাসা ও খানকাহ হতে বের হয়েছি আমি শিশিরসিক্ত হয়ে, না আছে প্রাণ, না প্রেম ও ভালবাসা, না মারেফাত, না বিচক্ষণ দৃষ্টি।

ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষাগ্রহণ শেষে অধিক সংখ্যক হারে আলেম বের হবার পরও সমাজে তাঁদের কোন প্রভাব দৃষ্ট হচ্ছে না, জীবন জগতে আলেমগণ কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারছেন না।

বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্ব

এই ভারতবর্ষেই খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী অথবা সাইয়েদ আলী হামদানী কাশ্মীরীর ন্যায় দুনিয়া-বিরাগী এক ফকীর, এক সুফী আগমন করেন আর গোটা ভারতবর্ষকে আপন হৃদয়ের উত্তাপে উত্তপ্ত এবং ঈমানী নুরের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করে তোলেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর আবির্ভাব

ঘটে আর মোঘল রাজশাসনে সৃষ্টি হয় বিপ্লব, আমূল পরিবর্তন। তাঁরই নীরব ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে আকবরের সিংহাসনে আমরা আসীন দেখতে পাই আওরঙ্গজেবের ন্যায় ইসলামী আইন শাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ ফকীহ এবং শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ ও কটর অনুসারী একজন বাদশাহকে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) এই বিশাল ভূখণ্ডের গতি-প্রকৃতিই বদলে দিলেন। সমগ্র দেশের চিন্তা-জগত ও শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর প্রভাবে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত হল।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) জাতির চরম হতাশা ও স্থবিরতার এক মহা সংকটকালে বিশাল এক ইসলামী দুর্গ নির্মাণ করলেন আর নববী ইলমের চর্চায় সঞ্চারিত করলেন নবজীবন। সাম্প্রতিক অতীতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)কে দেখুন। ঈমানী ও দ্বীনী কর্মকাণ্ডে এক নতুন রূহ, নতুন প্রাণের সঞ্চার করলেন। মোটকথা

ع جہانے را در گوں کرد یک مرد خودا گاہے

(আত্ম-সচেতন একজন ব্যক্তিই ওলট-পালট করে দিয়েছে সমগ্র জগতকে।)

আমাদের বর্তমান ফুালায়ে কেরামের মধ্যে সেই প্রাণ অনুপস্থিত, সেইসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য হতে তারা নিঃস্ব, সেই সঞ্জীবনী শক্তি হতে বঞ্চিত, যা জাতিকে নতুনভাবে চিন্তা করার প্রেরণা যোগাতে পারত, তাদেরকে আমূল পরিবর্তন গ্রহণ করতে শক্তি দান করতে পারত। যুগ বড় সত্যপ্রার্থী, সত্য-সচেতন। সে শ্রদ্ধা করে শুধু সমুন্নতকেই। মেধা ও মস্তিষ্ক শুধু নত হয় উন্নত মেধার সামনেই। শীতল ও শূন্য হৃদয় বশীভূত হয় শুধু উন্নত ও সমৃদ্ধ হৃদয়ের। মাদরাসাগুলোতে বর্তমানে মেধা ও প্রতিভার অবনতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদয়ের উষ্ণতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। শীতলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ওয়াজ ও নসীহত করার মত গাণীর অভাব নাই, কিন্তু কবি জিগারের ভাষায়—

آنکھوں میں سرور عشق نہیں چہرہ پہ یقیں کا نور نہیں

চোখে নাই প্রেমানন্দের দীপ্তি, চেহায়ায় নাই ইয়াকীন ও বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য।

মাদরাসার দুতিহীন পরিবেশ

এককালে মাদরাসা ছিল জীবন ও শক্তির কেন্দ্র। যেখানে একের পর এক জন্ম নিাত জীবন জগতের আমূল পরিবর্তন সাধনকারী বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। আর আজ? আজ সেই মাদরাসাগুলো হতাশা, স্থবিরতা আর হীনমন্যতার শিকার। সংখ্যাগত

দিক থেকে মাদরাসা, ছাত্র, পাঠ্য কিতাব, কিতাবের সরবরাহ, শিক্ষক বেতনের পরিমাণ সবই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু জীবন-তন্ত্রী হয়ে পড়েছে বড় দুর্বল, হৃদয়ের আবেগ ও উত্তাপে পড়েছে ভাটা। সচেতন ও দরদী কেউ এই অবস্থা দেখলে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে। এই মৃতপ্রায় সাগর দেখলে সে হয়তো বলে উঠবে—

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے
 کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں
 تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو
 کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

‘খোদা কোন তুফানের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটিয়ে দিন। কারণ তোমার সাগর তরঙ্গে কোন উত্তালতা নাই। কিতাব হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি কিতাব আবৃত্তিকারী, কিন্তু কিতাব তোমাতে আত্মস্থ হয়নি।’

কিন্তু মাদরাসা নামক এই সাগর উত্তাল হোক, এতে ঝড় উঠুক— এই দুআ করতেও এখন শঙ্কা বোধ করি। কেননা বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে ঝড় বইছে, পরিলক্ষিত হচ্ছে তুফানের আলামত। মাদরাসাগুলোর রক্ষণ প্রাচীরে সে ঝড় আঘাত হানছে। সে তুফানের উত্তাল তরঙ্গ মাদরাসার ভিত ধসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে ঝড় আর তুফান বাইরের। তা বহির্জগতের অন্তসারশূন্য চিন্তা-চেতনা, মূর্তপ্রসূত দাওয়াত ও আত্মহানের প্রতিধ্বনি। মাদরাসার ছাত্রেরা যার লাউড স্পীকার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্ব-নেতৃত্বের যোগ্যতার অধিকারীরা

আজ অপরের অন্ধ অনুসারী

যে সকল কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি, যে সকল চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ, যে সকল প্রচার-প্রচারণা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বস্তা পচা, বাসী ও পুরোনো বলে প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে, অচল বলে পরিগণিত হচ্ছে বড় দুঃখজনক ও মর্মপিড়ক সত্য হল বর্তমানে মাদরাসায় সেগুলোরই অনুপ্রবেশ ঘটছে (যাদের হওয়ার কথা ছিল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যুগ সৃষ্টিকারী নেতা, যুগের দিগদিশারী, সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী দাঈ ও আত্মহায়ক আজ তারাই অপর কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়ে দীন ও ধর্মহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুসরণ ও অনুকরণে গর্ববোধ করছে)।

کر سکتے تھے جو اپنے زمانہ کی امامت
و کہند دماغ اپنے زمانہ کے ہیں پیرو

یہ ہتہ پارہت آسین یوگ-نہتہتہر آسنے
سہی یوہہ دہرا مہسٹکھ اہنن یوہہر داس ।

بہرمانہ مادراسای بیراجیت سبچہیہ بڈ فہتنا، سبچہیہ بڈ مانسک
مہاماری ہکھ، ہاڈرہدہر مہیہ کرمبہریشکھ ہینمنناتہا۔ یا یوہہ ہوکاکار نیاہ اہی
بیشال بکھکے کورے کورے کاکھ۔ کون ہرہٹہٹان یادی اہی روہہ آکرائت ہیہ
ہڈہ تبہ تار اہٹتہ راکھت ہوہا اسہٹہر۔

کهن اہی ہینمنناتہا؟

ہریہ ہاڈرہد!

کهن آپنارا ہینمنناتار شیکار ہہہن؟ ہینمنناتار کارہہ آکایدا-
بیشاس و کمانہر دہرلناتہا ہاتہت آار کیکھ نہی۔ اہر کوشاباب اتاتہٹ گہیر و
سودہرہساری۔

آپنارا ناہیہہہ نہی۔ نہہی ہلہہہر دہرک و باہک۔ آپنارا یادی
ہینمنناتار شیکار ہن تاہلہ تار اہرہ داڈای، آپنارا نہوہااتہر اتوکھ
مہااا سہہہرہہ اہٹ، ہیاکین و بیشاسہ آپنارا ہینہل۔ مہہ راکھہہن،
آپنارا اہ سکل مہان ہاکٹہر اڈورسوری ہاڈہر سہہہرہہ آارہف رکیہہ یٹارٹہہ
ہلہہہن-

نوتہ دارند وکبرے چوشہاں

چاکری خواہند از اہل جہاں

‘بادشاہ نہی کیکھ بادشاہر نیاہ ہرہٹہٹت و گہہرہر اہیکاری
ٹارا سہٹ جگتہر مالک آالٹاہر نکٹ ہرارٹنا کورہن چاکوری۔’
شہٹ سادی (رہہ) ہاڈہر سہہہرہہ ہلہہہن-

شہان ہے کلہ وخر وان ہے کرائند

‘مুকٹ نہی تبو و سٹراٹ، باہینی نہی تبو و بادشاہ۔’

آاہٹہرہٹٹ و آاہٹہرہٹااہوٹ

ہریہ ہاڈرہد آمار!

یہ سہہٹ آپنارہرہر نکٹ رہیہہہ تہ ہٹھہہرہر کار و نکٹ ناہی۔
آپنارہرہر ہکھہ رہیہہہہ ہلہہہ وہی، ہلہہہ نہہی۔ آپنارہرہر نکٹ رہیہہہہ

এসব মহা সত্যের আলো, দুনিয়া হতে যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যার বিলুপ্তির ফলে জগত আজ ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত, মহা অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলায় নিপতিত।

আপনারা আপনাদের এই সাদাসিধে অনাড়ম্বর পোশাক, দারিদ্র-পীড়িত শরীর আর অর্থশূন্য পকেটের দিকে তাকাবেন না। আপনারা দেখবেন, আপনাদের বুক কোন সম্পদে সমৃদ্ধ, আপনাদের মধ্যে কিরূপ পূর্ণ-চন্দ্র সংগুপ্ত রয়েছে তা।

برخود نظر کش از تہی دامنہ مرع

در سینه تو ماہ تمانہ نہادہ اند

‘দৃষ্টি নিবদ্ধ কর নিজের প্রতি, শূন্য তহবিলে দুঃখ করো না

তোমার বক্ষে রক্ষিত আছে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ।’

আপনারা মনে রাখবেন, হীনতা ও দীনতা অন্তর্জগতের সাথে সম্পৃক্ত। বহির্জগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেহায়েতই গোপন। হীনতা মনোজাগতিক একটি অবস্থা। হীনতাবোধের অনিবার্য ফল হল— দ্বিধা ও সংশয়, ভীর্ণতা ও কাপুরুষতা এবং আত্মপরিচয় বিস্মৃতি। মানুষ বস্তুত নিজেই নিজেকে হীন মনে করে, নিঃস্ব ও লাঞ্ছিত মনে করে, নিজেই নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। প্রকৃতপক্ষে সে আত্মপ্রতারণার শিকার হয়, সে অযথাই ভাবতে থাকে যে, মানুষ তাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে, সে পৃথিবীতে মূল্যহীন, অপাংক্তেয়। এইরূপে সে নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে, অবিচার করে। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিতেই উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত বলে দৃষ্ট হয়, অন্য কেউ তাকে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় বলে জ্ঞান করতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজেকে নিজের দৃষ্টি হতে দূরে সরিয়ে দেয় অপরের কী দায় ঠেকেছে যে, তাকে সে নিজের হৃদয়ে স্থান দান করবে? নিজের কাছেই যার স্থান ও মূল্যায়ন নেই, পৃথিবীর কোথাও তার স্থান ও মূল্যায়ন নেই। প্রত্যেকের স্ব-স্ব হৃদয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ অনুপাতেই এই পৃথিবী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, তার বিস্মৃতি ও ব্যাপ্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ব্যক্তির লক্ষ্য করা উচিত, নিজের অন্তরে সে নিজ সত্ত্বাকে কতটুকু স্থান দান করেছে, নিজ সত্ত্বার সঙ্গে তার আচরণ কীরূপ হচ্ছে? কেউ যদি নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ, অক্ষম ও অসহায় জ্ঞান করে; নিজেকে নিঃস্ব ও অপদার্থ মনে করে, দুনিয়ার বাজারে নিজেকে ভাবে অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন তবে পৃথিবীর নিকট হতে কোন রকম সুবিচার ও সম্মানের প্রত্যাশা করা তার উচিত নয়। এই ধ্রুব সত্যটাকেই হাতেম তাঈ ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

ونفسك اكرمها فانك ان تهن

عليك فلن تلقى من الناس مكرما

তুমি নিজেকে সম্মান কর। কেননা নিজের দৃষ্টিতেই তুমি যদি নীচ ও হেয় বলে
পরিগণিত হও তাহলে তোমাকে সম্মান দানের জন্য কাউকে তুমি পাবে না।

বন্ধুগণ!

আমি দ্বিধাহীনচিন্তে বলতে পারি, আমরা হেয় নই, হীন নই, শুধু হীনতাবোধের
গাধিতে আক্রান্ত। এই হীনতাবোধের সৃষ্টি মূলত আত্মপরিচয়ের অভাব এবং
আত্মবিস্মৃতি হতে। এর একমাত্র চিকিৎসা স্বীয় মর্যাদা সচেতনতা এবং স্বীয় সম্পদ
ও ঐশ্বর্যের সঠিক পরিমাপ নির্ণয়। পৃথিবীর পরিবর্তন, আমাদের সম্পর্কে পৃথিবীর
দৃষ্টির পরিবর্তন আমাদের নিজেদের দৃষ্টির পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। নিজেদের
সম্পর্কে আমাদের নিজেদের বোধ ও দৃষ্টির যে দিন পরিবর্তন ঘটবে, সে দিন
পৃথিবীরও পরিবর্তন ঘটবে, হেয়তাবোধ ও হীনমন্যতার ভীতিকর যে অপচ্ছায়া
আমাদের মন ও মস্তিষ্কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আমাদেরকে শক্তিত করে রেখেছে
তা কর্পুরের ন্যায় উবে যাবে। কথক কিছুমাত্র ভুল বলেনি-

اور اگر باخبرانی شرافت سے ہو

تیری سپہ اس وجہ، تو ہے امیر جنود

স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে তুমি যদি হও সচেতন

জীন ও ইনসান হবে তোমার সৈনিক, তুমি হবে সেনাপতি।

আমাদের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাসের যে সকল ব্যক্তিত্ব নিজেদের মর্যাদা
সম্পর্কে ছিলেন সম্যক ওয়াকিফহাল, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কোন্ ঐশ্বর্যে
মণ্ডিত করেছেন এবং কিরূপ পদমর্যাদায় ভূষিত করেছেন সে সম্পর্কে যাদের
উপলব্ধি ছিল পরিপূর্ণ মাত্রায় তাঁরা সমগ্র জগতকে অসার ও তুচ্ছ বলে জ্ঞান
করতেন। বিশাল রাজত্বের অধিকারী রাজ-রাজড়ারাও তাদেরকে কখনও কোন
মূল্যে খরিদ করে নিতে পারেনি। দুনিয়ার বড় বড় সম্পদের, বড় বড় পদমর্যাদার
লোভনীয় ও মোহনীয় প্রস্তাব শুনে তাঁরা ওষ্ঠপ্রান্তে মুচকি হাসি টেনে বলে উঠেছেন-

بردایں دام بر مرغ دگر نہ

کہ عنقار ابلندست آشیانہ

‘যাও, এ ফাঁদ অন্য কোন পাখি শিকার করার জন্য পাতো (আমাকে-শিকার করতে চেয়ো না)। কারণ, আনকা পাখি (এক কাল্পনিক বিশালকায় পাখি)-র নীড় অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত।’

যে মানব ইতিহাস আত্ম-বিস্মৃতি ও সস্তা মূল্যে বিকিয়ে যাওয়ার কলঙ্কে কলঙ্কিত তার ইজ্জত ও সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ঐ সকল দৃঢ়চেতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দ্বারাই যাঁরা ছিলেন আত্ম-পরিচয়ে সমৃদ্ধ এবং আল্লাহর মারেফাতে ধন্য। মানবতার শির সমুন্নত থেকেছে তাঁদের দ্বারাই যাঁরা নিজেদের শির রেখেছেন সমুন্নত।

যাঁদের নিঃশ্বাসে জীবনের মর্যাদা রয়েছে আজও অক্ষুণ্ণ

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

মানব জীবনের অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য যেমন প্রয়োজন হয় খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ সহ যাবতীয় পার্থিব উপায়-উপকরণের, তেমনই জীবনকে উজ্জ্বল ও মাহাত্ম্যপূর্ণ করে তুলতে, মানবতাকে উৎকৃষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে প্রয়োজন হয় বস্তুপূজারী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন পৃথিবীর এই সমাজে মাঝে মাঝে পয়গম্বর সুলভ আত্মমর্যাদাবোধ এবং পার্থিব জগতের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের প্রকাশ ঘটান। প্রয়োজন হয় কোন দিক থেকে এই দৃঢ় উচ্চারণের—

اَتِمُّدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا اَتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرًا مِّمَّا اَتَاكُمْ

‘তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন তা তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা থেকে উৎকৃষ্ট।’ (সূরা নামল ৩৬)

যে দিন এই উচ্চারণ আর উচ্চারিত হবে না, এই সাহসী ধ্বনি আর শ্রুত হবে না, সমগ্র পৃথিবী পরিণত হয়ে যাবে নিলামের বাজারে, যে বাজারে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি হতে থাকবে বিবেক-বুদ্ধি নামক অমূল্য রতন, ঈমানের উত্তাপ আর জ্ঞান-সম্পদ, মানুষ বিক্রিত হতে থাকবে স্থূল পদার্থ আর পশুর দামে সেই দিন এই পৃথিবী বসবাসেরই অনুপযোগী হয়ে পড়বে। মানবতা হারাতে তার প্রাণ ও উত্তাপ।

মানবতার মর্যাদা, নবীগণের নেতৃত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব আপনাদেরই। ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এর প্রত্যাশা অবান্তর যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার লক্ষ্য কেবলই উদরপূজা। উদরপূজার উর্ধ্বে অন্য কোন লক্ষ্যের দাবি যারা নিজেরাও করে না। এর প্রত্যাশা শুধু আপনাদের নিকট থেকেই করা যেতে পারে। কারণ, আপনাদের পূর্বসূরীদের তালিকায় রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ন্যায় আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবোধের

অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহান ইমাম। আব্বাসী শাসন যাদেরকে কোন মূল্যেই খরিদ করে নিতে পারেনি। রয়েছেন ইমাম গায়যালীর ন্যায় অমিত সাহসী ব্যক্তিত্ব। রাজশাসনের অধিকারী খলীফার পদের পর সর্বোচ্চ দ্বীনী সম্মানজনক পদ বাগদাদের নিজামীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদ যিনি খলীফার অনুরোধ সত্ত্বেও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। রয়েছেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর ন্যায় দৃঢ়চিত্ত অসম সাহসী ব্যক্তি, যিনি বরণ করে নিয়েছিলেন গোয়ালিয়র কারাগারের বন্দীজীবন, তবুও বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে কুর্নিশ করতে সম্মত হননি। আপনাদের আসলাফ ও আকাবিরের মধ্যে রয়েছেন মির্জা মাযহার জানে জানা। দিল্লীর সম্রাট যাঁর নিকট বার্তা প্রেরণ করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে বিশাল রাজত্ব দান করেছেন তার কিছু অংশ আপনি গ্রহণ করুন। উত্তরে তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা সাত মহাদেশকে (তথা সমগ্র পৃথিবীকে) مَنَاعَ الدُّنْيَا قَبْلَ 'দুনিয়ার সামগ্রী স্বল্প ও তুচ্ছ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই সাত মহাদেশের মধ্য থেকে একটি মাত্র মহাদেশেরও অংশবিশেষ রাজত্বের অধিকারী আপনি। তা কতটুকুন যে, এই ফকীর তার দিকে শোভের হাত প্রসারিত করবে? নওয়াব আসফ জাহ একবার তাঁকে বিশ হাজার টাকা হাদিয়া স্বরূপ দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। নওয়াব বললেন, আপনি গ্রহণ করুন এবং দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিন। তিনি বললেন, পথে আপনি নিজেই দান করতে করতে যান। প্রাসাদ পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই এই টাকা নিঃশেষ হয়ে যাবে। পথে নিঃশেষ না হলে প্রাসাদে পৌছার পর নিঃশেষ হয়ে যাবে। আপনাদের আসলাফ ও পূর্বসূরীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (রহ.)। টুংক প্রদেশের গভর্নর মীর খাঁ তাঁর খানকা শরীফের খরচাদির জন্য বাৎসরিক কিছু অর্থ বরাদ্দ করতে চাইলে তিনি লিখে পাঠালেন—

مَا بَرَوْنِي فَقَرَوْنِي بِرِيمِ

بামیر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است

‘দারিদ্র ও অশ্লেষভূষ্টির গর্ব ত্যাগ করতে আমি নই রাজী
মীর খাঁকে বল, এই পৃথিবীতে নির্ধারিত সকলের রুজী।’

আপনাদের পূর্বসূরীদের তালিকায় রয়েছেন আবদুর রহীম রামপুরীর ন্যায় নার্মোহ মুদাররিস ও শিক্ষক। মাসিক দশ টাকা মাসোহারাকে যিনি বেরেলী কলেশের আড়াইশ টাকার উপর এবং আল্লাহর ওয়াস্তে মুফতে শিক্ষাদানকে

সম্মানজনক প্রফেসর পদের উপর প্রাধান্য দান করেছিলেন এবং কারণ হিসাবে বলেছিলেন, আল্লাহ যদি এ ব্যাপারে আমাকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহী করতে বলেন তাহলে কী জবাব দিব? আপনাদের আসলাফ ও পূর্বসূরীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)। যিনি আলীগড়ের জনৈক দ্বীনদার ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট থেকে বেতনরূপে প্রাপ্ত মাসিক দশ টাকা হতে দুই টাকা কমিয়ে দিতে বললেন। কারণ দর্শিয়ে বললেন, আমি আমার মাকে মাসে দু টাকা করে দিতাম। তাঁর ইন্তিকালের পর এই দুই টাকা আমার জন্য অতিরিক্ত হয়ে যাবে। আমি কিয়ামতের দিন এই অতিরিক্ত অর্থের হিসাব দান থেকে রক্ষা পেতে চাই। নিকট অতীতের পূর্বসূরীদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই ঐসব ত্যাগী মুদাররিসকে যারা স্বল্প বেতনে এবং স্বীয় উস্তাদ ও শায়খের সান্নিধ্যে পরিতুষ্ট থেকে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় উচ্চ বেতনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সংকট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। অতএব আমি নিশ্চিত যে, আপনাদেরই অধিকার রয়েছে কবিতার এই পংক্তিটি পাঠ করার।

اولئك ابائى فجئنى بمثلهم - اذا جمعنا يا جبرير المجامع

‘তাঁরা আমাদের পূর্বসূরী, বিভিন্ন সমাবেশে যখন আমরা সমবেত হই তখন হে জারীর! তাঁদের অনুরূপ কাউকে দেখাও তো তুমি।’

এটা সুখ ও আরামপ্রিয়তার পথ নয়

বন্ধুগণ!

আমার এতক্ষণের বক্তব্যে আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনারা মনে করবেন না যে, যুগের পরিবর্তন, প্রয়োজন ও চাহিদার ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, সাহস ও সামর্থ্যের ঘাটতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্কট ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আপনারা এই ধারণা পোষণ করবেন না যে, আমি এই যুগে আপনাদের নিকট থেকে হযরত মাওলানা আবদুর রহীম এবং মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ত্যাগ ও কুরবানীর ন্যায় ত্যাগ ও কুরবানী দাবি করছি। তবে একথা আমি না বলে পারছি না যে, আপনাদের পথ নিঃসন্দেহে ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথ, অল্পে তুষ্টি এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পথ। আরামপ্রিয়তা এবং জাগতিক সমৃদ্ধি লাভের পথ আপনাদের পথ নয় কখনও। এই পথে—

قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

‘তুমি তো পূর্বে আমাদের আশাশূল ছিলে’-জাতীয় তিরস্কারমূলক বাক্যবানে জর্জরিত হতেই হবে। এই পথে তো-

لَا تَعْدَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَىٰ

(‘তুমি তোমার চোখ দুটিকে প্রসারিত করো না তার দিকে যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দান করেছি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে। তোমার প্রতিপালকের নিকট রক্ষিত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী’)-র পাঠ গ্রহণ করতেই হবে।

তবে এর প্রতিদান কী তাও শুনে নিন। তা হল-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

‘তাদের মধ্য হতে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, আর তারা ছিল আমার আয়াতসমূহে দৃঢ়বিশ্বাসী।’ (সূরা সাজদা ২৪)

মাওলানা রুমী (রহ.) এই স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন-

معه راغبوار سوائے دل خرام تا کہ بے پردہ ز حق آید سلام

‘উদরপূজা পরিহার কর, ধাবিত হও হৃদয় পাণে
সরাসরি যেন সালাম আসে প্রভু হতে তোমার পাণে।’

যুগ বড় অসহায় ও তৃষ্ণার্ত

যে হীনমন্যতা আপনাদেরকে ক্লিষ্ট করছে তার একটা কারণ, নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে আপনাদের অজ্ঞতা। এ সম্পর্কে আমি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় কারণ, জগত ও যুগ সম্পর্কে আপনাদের অজ্ঞতা। আপনারা জানেন না, বর্তমান পৃথিবী কতটা সম্বলহীন, অসহায়, কতটা নিঃস্ব, কতটুকু তৃষ্ণার্ত। আপনারা যুগকে দেখেন মোহাবিষ্ট ও লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে। কারণ যুগ সম্পর্কে আপনারা অজ্ঞ। যুগের সঙ্গে আপনারা অপরিচিত। আপনারা যদি গভীর ও নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে যুগকে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে আপনাদের উপলব্ধি জনাবে যে, বর্তমান যুগ ও সমাজ কী পরিমাণ দেউলিয়াত্বের শিকার এবং আপনাদের দৃষ্টিতে এটাও ধরা পড়বে যে, যুগ ও সমাজ এই দেউলিয়াত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিও রাখে। বর্তমান

পৃথিবীর সকল মুদ্রা অচল সাব্যস্ত হয়েছে। তার সকল তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তার সকল ঝরনা, সকল জলাধার মরীচিকা প্রমাণিত হয়েছে। সকল দর্শন, সকল মতবাদ ও ইজম ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সকল স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে, বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

আপনাদের নিকট আছে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী কর্তৃক আনীত মহাসত্য। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতির উৎকর্ষের এই যুগে নিজেদের হীনমন্যতার কারণে আপনারা জগতের সামনে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সেই মহা সত্যকে উপস্থাপন করতে কুণ্ঠিত হন, লজ্জাবোধ করেন। অথচ বর্তমান পৃথিবী ঐ মহাসত্যের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষারত। সমাজ আজ এসব ব্যক্তির অপেক্ষায় আছে যাঁরা সমাজকে দেবেন নতুন পথের সন্ধান, নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঞ্জীবনী বার্তা সমাজের নিকট পৌছে দিয়ে যাঁরা সমাজকে দান করবেন নবজীবন।

ہم آسمان صحرائے خودنہادہ برکف
بامید آن کہ روزے بشکار خواہی آمد

‘সকল মরু হরিণী হাতে মাথা রেখে প্রতীক্ষায় আছে
কবে তুমি আসবে তাদেরকে শিকার করতে।’

ইলমে নববীই আসল সম্পদ

যেসব বিষয়কে আপনারা সাধারণ মনে করেন, যেসব বিষয়কে আপনারা মূল্য দেন না সেসব বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে বড় বড় পণ্ডিত ও বিদ্বানকে আমি মাথা কুটতে দেখেছি, অনুশোচনা প্রকাশ করতে দেখেছি। যখন তাদের সামনে নবীগণের শিক্ষা ও আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে তখন মনে হয়েছে, যেন তারা আকাশ থেকে পড়ল। মনে হয়েছে, এইসব শিক্ষা ও আদর্শের কথা তাদের কানে কখনই পড়েনি। আপনারা দুনিয়ার বাজারে দুনিয়ার পণ্যই সরবরাহ করতে চান। দুনিয়া যদি ‘আমাদেরই পণ্য আমাদেরকে প্রত্যাৰ্পণ করা হয়েছে’ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার দোষ কোথায়? আপনাদের নিকট দুনিয়ার প্রত্যাশা হল, আপনারা দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করবেন নববী দিক-নির্দেশনা, নবী-নির্দেশিত পথ। দুনিয়া আজও নবী-প্রদর্শিত পথ ও দিক-নির্দেশনা মেনে নিতে প্রস্তুত যেমন মেনে নিয়েছিল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিষ্টান জগত। এটা ঠিক যে, আপনাদের নিকট ইউনানী দর্শন, জ্যোতির্শাস্ত্র, প্রকৃতি ও বস্তু-বিজ্ঞানের সীমিত কয়েক পৃষ্ঠার

যে ভাণ্ডার রয়েছে তার বিপরীতে ইউরোপের নিকটে আছে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। আর এটাও বাস্তব যে, ইউনানী দর্শনের যুক্তি-তর্ক ও প্রতিপাদিত বিষয় দিয়ে ইউরোপকে কাবু করা সম্ভব নয়। কারণ ঐসব পুরোনো যুক্তি-তর্কের মধ্যে এখন আর কোন প্রাণ অবশিষ্ট নেই। সেসব এখন শবাধারে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আপনাদের নিকট নববী ইলম, নববী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মহাসত্যের যে বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে ইউরোপ ও এশিয়া তা থেকে অদ্যাবধি বঞ্চিত রয়েছে। তাদের নিকট আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তা-চেতনাগত জ্ঞানের বিরোধিতায় কিছু না কিছু জবাব থাকলেও নবীগণ কর্তৃক আনীত মুজিয়াসমূহের কোন যৌক্তিক জবাব তাদের কাছে নেই। আপনারা প্রকৃত শক্তি ও সম্পদ সাথে নিয়ে অত্যন্ত আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে জীবনের ময়দানে অবতীর্ণ হন। দেখবেন, আপনাদের মুকাবেলা করার কেউ থাকবে না। আপনাদের নিকট বিদ্যমান জ্ঞান ও মহাসত্যের অমিয় প্রস্রবণ, আপনাদের নিকট রয়েছে মানবতার জন্য আহ্বান ও পয়গাম, মহাসত্যের সঙ্গে আপনাদের দাসত্ব সম্পর্ক বিদ্যমান। এসবের পর আপনারা প্রত্যেকে একথা বলতেই পারেন—

عجب کیا گرمہ و پرویں نچیر ہو جائیں
کہ برفتر اک صاحب دولتی بستم سر خود را
وہ دانا ئے بل بستم الرسل مولائے کل جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

এতে আশ্চর্যের কী, যদি চাঁদ ও সপ্তশীমণ্ডল আমার শিকার হয়ে যায়। কেননা দৌলতের অধিকারী এক ব্যক্তিত্বের (তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) শিকার ধরার রশিতে নিজের মস্তক বেঁধে দিয়েছি। তিনি আল্লাহর পথের সেই প্রাজ্ঞ পথিক, সর্বশেষ রাসূল, সবার অভিভাবক, যিনি পথের দুর্লভগণকে দান করেছেন সীনা উপত্যকার উজ্জ্বল্য।

**জীবনের সাথে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং
তার জন্য আমাদের পূর্বসূরীদের সাধনা**

প্রিয় বন্ধুগণ!

আমি পূর্বে বলেছি যে, আপনাদের এক প্রান্ত সংযুক্ত নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর গাঙ্গে। সেই কারণে আপনাদের উপর কী কী দায়িত্ব বর্তায় সে সম্পর্কে এতক্ষণ

দীর্ঘ আলোচনা করলাম। আমি একথাও বলেছিলাম যে, আপনাদের অপর প্রান্ত সংযুক্ত জীবন জগতের সঙ্গে। এখন আমি আরজ করব যে, এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব ও প্রস্তুতিসমূহ কি কি? কিভাবে আপনারা সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেন।

বন্ধুগণ!

নবুওয়াতে মুহাম্মাদী যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মহাসত্য এবং যে মৌলিক ও বুনিনাদী বিধি-বিধান দান করেছে তাতে তিল পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব নয়। আপনাদের পূর্বসূরীগণ তাতে কোনরূপ বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধিত হতে দেননি। এটাই ছিল তাঁদের সংস্কারমূলক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য, এটাই ছিল তাঁদের মহান কীর্তি। তাঁরা উলূমে নবুওয়াতরূপ ঐ সম্পদকে কোন রকম পরিবর্তন, কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যতীত নিখুঁতভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটাও স্মরণ রাখুন যে, প্রত্যেক যুগেই আমাদের পূর্বসূরীগণ নববী উলূমের ঐ মহা সম্পদকে জীবন জগতে বাস্তবায়নের বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁরা তাঁদের মেধা ও প্রতিভা, মেহনত ও পরিশ্রম দ্বারা নববী জ্ঞানভাণ্ডারকে আমলযোগ্য এক প্রাণবন্ত ও সচল জ্ঞানভাণ্ডার রূপে জগতবাসীর সামনে প্রমাণ করে ছেড়েছেন। তাঁরা উলূমে নবুওয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় এরূপ পথ অবলম্বন করেছিলেন যাতে উলূমে নবুওয়াত জনসমাজের সম্মুখে সহজবোধ্য রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ফলে সমকালীন জনসাধারণের মস্তিষ্ক উলূমে নবুওয়াতকে অতি সহজে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে পেরেছিল। জনসাধারণ তাদের যুক্তিবুদ্ধি এবং সমকালীন যুগের সঙ্গে উলূমে নবুওয়াত ও শরীয়া বিধি-বিধানের কোন সামঞ্জস্যহীনতা বা অসঙ্গতি খুঁজে পায়নি। আমাদের সেই সকল পূর্বসূরীর মাঝে বিদ্যমান ছিল শরীয়তের মূলধারা, দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে পর্বতসম অবিচলতা ও ইম্পাত কঠিন দৃঢ়তা। কিন্তু এতদসংক্রান্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, মানুষের নিকট তা হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে তাঁরা ছিলেন ফুলশাখের ন্যায় নরম, রেশমের ন্যায় স্নিগ্ধ ও কোমল। তাঁদের কার্যপ্রণালী মূলত ছিল হযরত আলী (রাযি.)-এর উপদেশের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন—

كلموا الناس على قدر عقولهم اتريدون ان يكذب الله ورسوله

‘মানুষের সঙ্গে তাদের মেধা ও বুদ্ধির গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বল। তোমরা কি চাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হোক?’

এ কারণে তাঁরা যুগের বুদ্ধিক্ষেত্রের যোগ্যতা অনুযায়ী দ্বীনের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেছেন। যুগের বাস্তবতা, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সংকটের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কথা বলেছেন। তৃতীয় শতাব্দীতে খলীফা মামুন ও মুতাসিমের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইউনানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আকীদা- বিশ্বাস মুতাযিলাপহীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। মুতাযিলা- পহীদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী হওয়াটা যুগের ফ্যাশন এবং প্রগতিশীলতার নিদর্শন বলে পরিগণিত হতে শুরু করেছিল। যুগের এই সঙ্কটকালে হযরত আবুল হাসান আশআরী (রহ.) মুতাযিলাপহীদের যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এই এক তরফা ঠিকাদারীর বিরুদ্ধে জ্ঞানগত ও যুক্তি-তর্কগত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মুতাযিলাপহীরা যে ভাষা ও যে পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করে, যে পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেদের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও চিন্তা-চেতনাগত নেতৃত্ব কায়ম করে রেখেছিল তিনি আহলুস সুন্নাহর আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে ঠিক ঐ ভাষা ও পরিভাষাসমূহই ব্যবহার করলেন এবং তাদের অবলম্বিত পদ্ধতিই অবলম্বন করলেন। ফলে অতি অল্প দিনেই মুতাযিলাপহীদের বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক সকল তেলসমাতির কিস্তিমাত হয়ে গিয়েছিল এবং শরীয়াহ ও সুন্নাহপহীদের মাঝে দ্রুত প্রসারমান হীনমন্যতা, হতাশা ও স্থবিরতা দূরীভূত হয়ে তাদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল। আবু বকর ইবনুস সাইরাফীর উক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মুতাযিলাপহীদের বাড় বেশ বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মুকাবেলায় আল্লাহ তাআলা আবুল হাসান আশআরী (রহ.)কে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর অনন্য মেধা ও প্রতিভা ব্যবহার করে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাদের গতি রোধ করে দিয়েছিলেন।' তাঁর অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের কারণেই আবু বকর ইসমাইলীর ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত তাঁকে মুজাদ্দিদে উম্মত আখ্যা দান করেছেন।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর ইস্তিকাল-পরবর্তী যুগে তাঁর চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির অনুসারী আলেমগণ তাঁর কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর পরে কাযী আবু বকর বাকিল্লানী, শায়খ আবু ইসহাক ইসফিরাইনীর ন্যায় মুতাকাল্লিম ও ধর্মতত্ত্ববিদ এবং আল্লামা ইসহাক সিরাজী ও ইমামুল হারামাইনের ন্যায় সুযোগ্য মুদাররিস ও উস্তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা আহলুস সুন্নাহর ইলমী ও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু সেই যুগে ইতোমধ্যে ইউনানী দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে গিয়েছিল। আধ্যাত্মবাদী ও দার্শনিকেরা মিলে দর্শনকে পবিত্রতা ও শুভ্রতার লেবাস

পরিয়ে দিয়েছিল। ফলে দর্শন হয়ে পড়েছিল যুক্তি, বুদ্ধি ও সত্যের মানদণ্ড। এদিকে যে ইলমেকালামবিশারদ ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের প্রয়োজন ছিল যুগ সচেতন ও জাগ্রত মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়ার, তাঁদের মধ্যে স্থবিরতা ও পূর্ব যুগীয় পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ জেঁকে বসেছিল। আশআরী ও মাতুরিদী আকীদা-বিশ্বাসে অনড় থাকার প্রতি তাঁরা সর্বিশেষ জোর দিতেন। এটা তো ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু এ বিষয়েও তাঁরা অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যে, ঐসব আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় ন্যায়শাস্ত্রীয় ঐ পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে, ঐসব প্রমাণ, ঐসব ভাষা ও পরিভাষাসমূহই প্রয়োগ করতে হবে, আশআরী ও মাতুরিদী মতাবলম্বীগণ পূর্ব যুগে যেগুলোর অনুসরণ করতেন, প্রয়োগ করতেন। অথচ সমকালীন যুগের চাহিদা ছিল ভিন্নতর। পরিবর্তিত যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন ছিল নতুন প্রমাণাদি উপস্থাপনের, প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের, প্রয়োজন ছিল নতুন গবেষণার, নতুন অনুসন্ধিৎসার। ইমাম আবুল হাসান আশআরীর কাল ছিল দর্শনের শৈশবকাল। তখন পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের সাথে এর পরিচিতি গভীর হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীতে তা যৌবনে উপনীত হয় এবং সমাজ জীবনে তার থাবা বিস্তার করে। সেই সময় প্রয়োজন ছিল একজন নতুন ব্যক্তিত্বের, নতুন গবেষণার, সতেজ মেধার এবং নতুন ইলমে কালাম ও ধর্মতত্ত্ববিশারদদের। খোদায়ী ব্যবস্থাপনা এর জন্য নির্বাচিত করল ইমাম গায়যালী (রহ.)কে।

তিনি তাঁর লেখায় ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহের পক্ষে নতুন ধরণ ও ঢঙে কথা বললেন। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহ প্রমাণ করতে এরূপ তথ্য উপাত্ত ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করলেন, যুগের চাহিদা অনুযায়ী যা ছিল অধিকতর কার্যকর, হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়। তাঁর প্রমাণ উপস্থাপন-পদ্ধতি এবং আলোচনা-পর্যালোচনা রীতি নতুনভাবে দ্বীনের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করল, নতুনভাবে আহলুস সুন্নাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাঁর লেখা দ্বিধা ও সংশয়গ্রস্ত হাজার হাজার মানুষের জন্য প্রশান্তির কারণ হল, তাদের ঈমান দৃঢ়তর হল। যদিও ইলমে কালাম চর্চাকারী ও তৎকালীন ধর্মতত্ত্ববিশারদগণ তাঁর এই অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি দান করেননি বরং ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের প্রাচীন পদ্ধতি পরিহার করার কারণে তাঁকে তাঁরা সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করেছেন। ইমাম গায়যালী (রহ.) অবশ্য *فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة* নামক গ্রন্থে তাঁদের এসব সমালোচনার জবাব দান করেছেন। যা হোক, অবশেষে মুসলিম বিশ্ব তাঁর এই সংস্কারমূলক কার্য ও কীর্তির মূল্যায়ন করেছে।

ইমাম গায়যালী (রহ.) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দর্শনের জবাব দানের জন্য দর্শনশাস্ত্রের মূল গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের কোন বিকল্প নাই। দর্শনের যৌক্তিক সমালোচনা ও দর্শনের প্রতিপাদিত বিষয়সমূহ খণ্ডনের জন্য এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করত এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন নেহাত জরুরী। তাই তিনি পূর্ণ দুই বৎসর সময় লাগিয়ে গভীরভাবে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং আধ্যাত্মবাদীদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি প্রথমে *مقاصد الفلاسفة* (দার্শনিকগণের লক্ষ্য), অতঃপর *تهافت الفلاسفة* (দর্শনের বিনাশ) নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তখন পর্যন্ত মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিশারদগণ (মুতাকাল্লিম) শুধু দর্শনের আলোকে ইসলামের উপর আপত্তি আপত্তি ও সমালোচনার আত্মরক্ষামূলক জবাব দান করেই ক্ষান্ত হতেন। আর আত্মরক্ষা পদ্ধতি সর্বকালেই একটি দুর্বলতম পদ্ধতি। ইমাম গায়যালীই সর্বপ্রথম দর্শনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি দর্শনের প্রতিপাদিত তত্ত্বগুলোর অসারতা প্রমাণ করে দর্শনের শীশমহল ও কাঁচের প্রাসাদকে যুক্তির প্রস্তরঘাটে ভেঙে খান খান করে দেন। ফলে পাশ্চাত্যের দর্শন-ইতিহাসবিদদের স্বীকারোক্তি মতে প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত দর্শনের প্রাসাদ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। দীর্ঘ নব্বই বৎসর পর দার্শনিক মহলের একজন ইবনে রুশদ *تهافت التهافت* নামক গ্রন্থ লিখে ইমাম গায়যালীর গ্রন্থের জবাব দিতে চেষ্টা করেছে।

ইমাম গায়যালীর পরে প্রয়োজন ছিল দর্শনের ভিত্তিমূলে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ অব্যাহত রাখার এবং সমালোচনা, আপত্তি ও প্রশ্নবাণে দর্শনকে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার। প্রয়োজন ছিল একথা প্রমাণ করার যে, দর্শনের যাবতীয় তত্ত্ব ও প্রতিপাদিত বিষয়গুলো অনুমাননির্ভর এবং উন্মাদের প্রলাপের অতিরিক্ত কিছু নয়। আর এর জন্য যুগ প্রতীক্ষায় ছিল দর্শনশাস্ত্রে গভীর ও বিস্তীর্ণ জ্ঞানের অধিকারী একজন বৃহৎ মাপের ধীমান ব্যক্তিত্বের, একটি সাহসী ও শক্তিশালী ধারালো কলমের। সে সময়েই শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব ঘটল। তিনি সর্বদিক থেকে এই কাজের জন্য ছিলেন যথোপযুক্ত। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষত *الرد على المنطقيين* গ্রন্থে দর্শন এবং দর্শনের যাবতীয় মতবাদ ও তথ্য-উপাত্তকে অসার প্রমাণ করে ছাড়লেন। তাঁর গবেষণামূলক ও নবধারার উন্মোচনকারী গ্রন্থাদি এখন পর্যন্ত গবেষক মস্তিষ্কের জন্য নতুন খোরাক যোগায়, দৃঢ় করে আস্থাশীল, চিন্তা ও চেতনাকে দান করে সজীবতা ও প্রফুল্লতা।

এদিকে দর্শন ও ইলমে কালামের (Theology) সংমিশ্রণ যে বুদ্ধিবৃত্তিক গাণিত্য মাত্রা সৃষ্টি করেছিল এবং সারশূন্য দার্শনিকতার জন্ম দিয়েছিল তার ফলে

ইসলামী জগতে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সত্যপথ ও বিশ্বাস অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদি। এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) কলম যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর রচিত মছনবী প্রকৃতপক্ষে সপ্তম শতাব্দীর যুক্তি ও বুদ্ধিপূজার বিরুদ্ধে কলব ও হৃদয়, রূহ ও আত্মার এক চিত্তাকর্ষক সুর ঝংকার। তাঁর এই গ্রন্থটি ইলমে কালাম ও ধর্মতত্ত্বের স্বকীয় ধারার গবেষণামূলক গ্রন্থই শুধু নয় বরং তা ইলমে কালামের নতুন ধারার ভিত্তি স্থাপক, যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের এক নয়া কৌশলের জন্মদাতা। তিনি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নতুন নতুন প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, নতুন নতুন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। ফলে তা হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়কে একই সাথে প্রভাবিত করে, উভয়ের সংশয় ও আবিলতা দূরীভূত করে অন্তরের অন্তস্থলে গ্রোথিত হয়ে যায়। অদ্যাবধি গ্রন্থটির প্রভাব পূর্বের ন্যায় বহাল ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দার্শনিক মহলে এখন পর্যন্ত তার তীর লক্ষ্যভেদী।

মাওলানা রুমী ও হাফেয ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর পরে দর্শন নতুন রূপ ধারণ করল, গতিপথ পরিবর্তন করল। তাসাওউফ ও নীতিবিজ্ঞানের অভ্যন্তরে তার অনুপ্রবেশ ঘটল এবং রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থাতেও তা দখল দিতে শুরু করল। এর মুকাবেলায় সেকালে শুধু ইলমে কালাম ও ইলমে ইলাহিয়াত তথা ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধান ও প্রয়োগ যথেষ্ট ছিল না। বরং দর্শনের সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী আত্মাসনের মুকাবেলা তখন শুধু তিনিই করতে পারতেন যিনি গ্রীক ধর্ম দর্শনের সাথে সাথে গ্রীক নীতিবিজ্ঞান, মিসরীয় নব্য প্লেটো দর্শন, প্রাচ্য দর্শন, ভারতীয় যোগীবাদ এবং মধ্য যুগের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে বিচক্ষণ ও শ্যেন দৃষ্টির অধিকারী, ভ্রান্ত অভ্রান্ত পরখ করতে সিদ্ধহস্ত। সঙ্গে সঙ্গে দর্শন ও তাসাওউফ, নীতিবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা সম্পর্কেও যার অধ্যয়ন ও জ্ঞান অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুগভীর। কালের এই চাহিদা পূরণে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর আবির্ভাব ঘটল। তিনি ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ ও ‘ইয়ালাতুল খফা’ নামক দুটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের মাহাত্ম্য ও সত্যতার সফল চিত্র অঙ্কণ করে দিলেন এবং বিদ্বান ও পণ্ডিত মহলে নতুনভাবে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বকালীনতা ও তার চিরজীবন্ততা প্রমাণ করলেন এবং আলেমগণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

১৮৫৭ ঈসাব্দে ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক ও পাদ্রীরা ইসলামের উপর প্রকাশ্য

আক্রমণ শুরু করে এবং আলেমগণকে তাদের মোকাবেলা করার আহ্বান জানায়। পাদ্রীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানের জন্য ইঞ্জিলসমূহ ও তার ভাষ্যগ্রন্থসমূহ, এর সংকলন ইতিহাস এবং ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজন ছিল। সেই সময়ে উলামা মহলেরই একজন মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এবং ইয়হারুল হক এবং ইয়ালাতুল আওহাম জাতীয় গ্রন্থাদি রচনা করে খ্রিস্টীয় মতবাদের প্রচার প্রসারের পথে এক জগদল পাথর বসিয়ে দিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি হিন্দুস্তান থেকে শুরু করে মিসর সহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত স্ব-বিষয়ে অতুলনীয় গণ্য করা হয়।

অপর দিকে ইংরেজ সরকারের আনুকূল্য লাভকারী হিন্দুসমাজ ইংরেজদের मदদে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামী তত্ত্ব ও দর্শনের বিরুদ্ধে নতুনভাবে আক্রমণ শুরু করল। তারা জগতের নশ্বরতা, আল্লাহর সত্ত্বা, গুণাবলী ও তাঁর কালামের অবিনশ্বরতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা পুনরুত্থান, কেবলা পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক আপত্তি উত্থাপন করে এসব বিষয়কে অযৌক্তিক প্রমাণ করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। তাদের উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন করতে প্রাচীন ধর্মতাত্ত্বিক প্রমাণাদি, প্রাচীন তথ্য-উপাত্ত এবং প্রাচীন পদ্ধতি ছিল অনেকাংশেই অকার্যকর। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) তাদের আপত্তির জবাবে একটি নতুন ইলমে কালাম ও ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি-প্রমাণাদির জন্ম দিলেন। তিনি প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হালকা ও সহজ ভাষায় ছোট ছোট উদাহরণ এবং সাধারণের জন্য সহজবোধ্য প্রমাণাদি দ্বারা বড় বড় জটিল ইলমী বিষয়সমূহ বোঝালেন এবং বড় বড় বিতর্কের অবসান ঘটালেন। তাকরীরে দিল পাযীর, হজ্জাতুল ইসলাম, আবে হায়াত, কিবলা নুমা ইত্যাদি কিতাবগুলো তাঁর মেধা ও প্রতিভা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অপর দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পাঞ্জাবের কাদিয়ানে নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিল। ফেতনাটি ছিল নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত বিদ্রোহ, ছিল ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার গোটা প্রাসাদকে ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দিয়ে (আল্লাহ না করুন) তার ধ্বংসস্তূপের উপর জাল নবুওয়াত ও মিথ্যা ইমামতের প্রাসাদ নির্মাণের অপচেষ্টা। এর মোকাবেলায় কিছু মুখলিস ও একনিষ্ঠ, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ আলেম ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঞ্জেরী এবং মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর নাম ও কাম তাঁদের মধ্যে গর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুগকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং যুগের দাবি পূরণ

আমার আলোচনাকে বিস্তারিত করণের উদ্দেশ্য, আপনারা যেন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, উলামায়ে ইসলামের মেধা ও চিন্তা, ইসলামের খেদমতে তাঁদের আবেগ ও উদ্দীপনা কখনও কোন স্থানে এসে স্থবিরতার শিকার হয়ে পড়েনি কিংবা প্রাচীন প্রথা ও রীতি-নীতির কাঙ্গাল হয়ে থাকেনি। তাঁরা চলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের হাত যুগের জীবনস্পন্দন জ্ঞাপক ধমনী হতে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা যুগের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। ইসলামের খেদমতের জন্য যে যুগে যা কিছু প্রয়োজন, যে পদ্ধতি ও যে প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রয়োজন অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে তাঁরা তাই গ্রহণ করেছেন, তাই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার, ইসলাম ও দ্বীনের খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন। নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান কি নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর কি নির্দিষ্ট কোন উৎসের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও কর্মপদ্ধতি অপ্রয়োজনেও তারা আঁকড়ে ধরে রাখবেন—এরূপ কোন কসম তারা করেননি। মিসর ও ভারতে যখন তাহযীব-তামাদুন, ইতিহাস ও সাহিত্যের পথে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হল, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য লেখকেরা ইসলামের সোনালী যুগ ও তৎকালীন মহান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমালোচনার তীর নিক্ষেপ শুরু করল এবং বিকৃত বীভৎস ও কুৎসিত রূপে ইসলামকে উপস্থাপন করতে শুরু করল তখন উলামা মহল থেকেই তীক্ষ্ণ কলমে অধিকারী শক্তিশালী লেখক ও সাহিত্যিক একদল সৈনিক এগিয়ে এলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা এরূপ কিছু গ্রন্থ রচনা করলেন, যা ধর্মীয় বিচারে নয় শুধু, সাহিত্য বিচারেও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁরা তাঁদের উচ্চ সাহিত্যমান সম্পন্ন লেখনী দ্বারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হাজার হাজার দ্বিধান্বিত ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে দ্বিধা ও সংশয়মুক্ত করেছেন। তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাগত মালিন্য দূর করে তাদের মন ও মস্তিষ্কে প্রশান্তির বীজ বপন করেছেন। ফলে তাদের ভ্রান্তি ও দ্বিধাই শুধু অপসৃত হয়নি, ইসলামের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণও সৃষ্টি হয়েছে। মাওলানা শিবলীর আল-ফারুক, আল জিযইয়াহ ফিল ইসলাম এই ধারার রচনাবলীর উৎকৃষ্ট ও সফল দৃষ্টান্ত।

পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন

আপনাদের বর্তমান পাঠ্যসূচিই স্বয়ং এই সত্যের মহাসাক্ষী যে, আলেমগণ কোন প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে এবং তৎসাময়িক কল্যাণকর ও অপরিহার্য

কোন বিষয়কে গ্রহণ করে নিতে কখনও দ্বিধা করেননি। এ কারণেই মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে প্রত্যেক যুগেই নিয়মিত ধারায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়োজনের ঘটনা ঘটেছে। শুধু চলতি শত বৎসরেই পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে সর্বাধিক স্বল্প পরিমাণে। অথচ রাজনৈতিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাগত ব্যাপক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই যুগই ছিল পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের সর্বাধিক দাবিদার, সর্বাধিক উপযুক্ত।

দ্বীনের প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমুখী যোগ্যতার

বন্ধুগণ!

আধুনিক বিপ্লবের এই যুগে দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব ও ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যই শুধু নয়; বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার চিত্র রূপায়নের জন্যও প্রয়োজন অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের এবং বিভিন্নমুখী যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার। আপনারা ইসলামের সৈনিক। জীবনের বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য আপনারা নিজেকে প্রস্তুত করছেন। কোন সেনা প্রশিক্ষণ শিবির এবং সেখানে প্রশিক্ষণ রত সৈনিকদের জন্য সর্বাধিক অসঙ্গত ও মারাত্মক বিতর্ক হল নতুন ও পুরাতন অস্ত্র বিতর্ক, নতুন ও পুরাতন রণকৌশল বিতর্ক। সৈনিকের জন্য কোন অস্ত্রই পুরাতন নয়, কোন অস্ত্রই নতুন নয়। তার দেখা উচিত কোন অস্ত্র যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক কার্যকর, কোন রণকৌশল অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রসূ। সৈনিকের জন্য মৃদুতা ও হঠকারিতার অবকাশ নেই। না বিশেষ কোন অস্ত্রের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ও জিদ থাকা উচিত, না বিশেষ কোন রণকৌশলের প্রতি। প্রয়োজনীয় ও কার্যকর সকল অস্ত্রে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হওয়া তার জন্য অপরিহার্য।

আরবী কবি অনেক পূর্বেই বলেছেন—

كل امرئ يسعى الى يوم الهياج بما استعدا

প্রত্যেক ব্যক্তিই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে তার প্রস্তুতি ঋদ্ধতা নিয়ে।

নবাগত সকল মতবাদ ও তত্ত্ব তত্ত্ব সম্পর্কে

স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা অপরিহার্য

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদের উচিত, নবাগত সকল ফেতনা সম্পর্কে অবগত থাকা। তবে কোন বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান ও অভিজ্ঞান অজ্ঞানতা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে কোন কোন ফেতনা ও মতবাদ এবং

মেধা ও মনন সুষ্ঠু পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে বক্তৃতা ও ভ্রান্তি পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে গেলে তার সবকিছুই দোষনীয় ও অসুস্থতার প্রতিকৃতি হয়ে যাবে।

ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠতা

এই পর্যায়ে আমি আরও দুটো বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোন দেশে দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনী কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য ঐ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ দখল থাকা জরুরী। রুচিশীল ও মানোত্তীর্ণ ভাষায় নিজের চিন্তা-চেতনা প্রকাশের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে। বক্তৃতা ও লেখনীতে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় ভাষাশৈলী প্রয়োগের দক্ষতা থাকতে হবে। এটা এমনই এক প্রকৃতিগত সত্য ও অনিবার্য বাস্তবতা যে, নবীগণকে পর্যন্ত স্থায়ী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তারকারী উচ্চমান সম্পন্ন সম্মোহক ভাষা দান করা হয়েছিল।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

‘আমি ইহাকে আরবী ভাষার কুরআনরূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হও।’ (সূরা ইউসুফ ২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

‘অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।’ (সূরা শুআরা ১৯৫)

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

‘আমি প্রত্যেক রাসূলকেই স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি যাতে তাদের সামনে তারা পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।’ (সূরা ইবরাহীম ৪)

বোদ্ধাগণ বোঝেন যে, স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণের অর্থ শুধু এই নয় যে, নবীগণ স্বজাতির ভাষা বোঝেন এবং জাতিকে সেই ভাষায় বক্তব্য বোঝাতে পারেন। বরং এর মর্ম এই যে, নবীগণের ভাষা হত সমকালীন ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানে উত্তীর্ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মান সম্পন্ন। এর সত্যতার সন্ধান পাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তিতে—

انا افصح العرب

‘আমি সর্বাধিক বিশুদ্ধ আরবী ভাষার অধিকারী।’

আপনারা জানেন, ইসলামের ইতিহাসে যারা বৃহৎ কোন সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, মানব সমাজের চিন্তা-চেতনা ও গতি-প্রকৃতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে যাদের প্রভাব ছিল গভীর ও সুবিস্তারী তাঁদের প্রায় সকলেই বাগিতা ও লেখনীতে ওজস্বিতার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের লেখনী ও বক্তৃতায় আমরা ভাষার সাহিত্য ও আলংকারিক উচ্চমান পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান পাই। হযরত শায়খ জিলানী (রহ.)-এর মাওয়ায়েজ ও ভাষণ সংকলন আজ অবধি ওজস্বী ভাষনের উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ইমাম রব্বানী (হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী [রহ.] -এর পত্রাবলী সাহিত্য স্বকীয়তায়, তেজস্বিতা ও গতিশীলতায় সাবলীলতা ও শব্দচয়নে অক্লেশতায় আবুল ফজল এবং ফয়জীর রচনাশৈলী অপেক্ষা অধিক উচ্চমানসম্পন্ন বৈ নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থটি যুগপৎ আরবী সাহিত্য ও ইলমী ও শাস্ত্রীয় ভাষার উচ্চমান সম্পন্ন এরূপ এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যে, মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন-পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যার নজীর লক্ষ্য করা যায় না। আরবীর ন্যায় ফার্সী ভাষাতেও শাহ সাহেবের দক্ষতা ও সাবলীলতা ছিল অতুলনীয়। ফার্সী ভাষায় প্রণীত তাঁর ইয়ালাতুল খাফা গ্রন্থের কোন কোন অংশ তো সাহিত্যের শাহী মার্গ স্পর্শ করেছে। এই কাহিনী তখনকার যখন আরবী ফার্সী এই দেশীয় মুসলিম সমাজের জ্ঞানচর্চা ও লেখনীর ভাষা ছিল। উর্দু ভাষার প্রচলন লাভের পরে শাহ সাহেবের সন্তানগণ উর্দু ভাষায় লেখালেখি শুরু করেন। শাহ আবদুল কাদের (রহ.)-এর কুরআনের অনুবাদ তৎকালীন দিল্লীর প্রমিত ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা। সাহিত্যগত সৌন্দর্য ও ভাষা সুসমার কারণে অনুবাদটি ক্ল্যাসিক্যাল উর্দু সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। উর্দু ভাষায় রচিত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর গ্রন্থাদিতে এরূপ সাবলীল সরল ও স্বচ্ছন্দ্য ভাষাশৈলী বিদ্যমান যে, সূক্ষ্ম ও জটিল জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও উর্দু-প্রিয় পাঠকের রুচিতে কোনরূপ বিশ্বাস দিকি বিরাগ সৃষ্টি করতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রের নেতৃত্ব দীর্ঘকাল যাবৎ এ দেশের আলেমগণের হাতেই থেকেছে। এ দেশের সাহিত্য জগতে তাঁরাই দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে এসেছেন। খাজা আলতাফ হোসাইন হালী, মৌলভী নযীর আহমদ দেহলভী এবং মাওলানা শিবলী নোমানীকে উর্দু ভাষার নির্মাতারূপে গণ্য করা উচিত। আলেমগণ সাহিত্যরুচি ও রচনাশৈলীর এরূপ আদর্শ নমুনা রেখে গেছেন যা উর্দু

ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। মাওলানা হাবিবুর রহমান শেরওয়ানীর মাযামীন এবং মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাই (নাযেমে নাদওয়াতুল উলামা) প্রণীত তায়কিয়ায়ে গুলে রানা (تذکرہ گل رعنا) এবং তারীখে ইয়াদে আইয়াম গ্রন্থ দুটি নির্ভরযোগ্যতা ও তথ্য-নির্ভুল ইতিহাস-সমৃদ্ধতার পাশাপাশি উচ্চ সাহিত্যমান ও অলংকারে পূর্ণ উর্দু গদ্য সাহিত্যের উজ্জল এক উদাহরণ। মাওলানা সুলাইমান নদভীকে আল্লাহ কল্যাণ দান করুন! ধর্মীয় জ্ঞান গবেষণা বিষয়ক ও সাহিত্যমূলক রচনা দ্বারা তিনি উর্দু সাহিত্যকে ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাদি অদ্যাবধি এবং দূর-ভবিষ্যত অবধি ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামান পরিমাপের নিক্তি ও মানদণ্ড হয়ে থাকবে। তদ্রূপ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রচনাবলী উর্দু ভাষাকে শক্তিমান এবং উর্দুকে নতুন এক শিক্ষিত ভাষাশৈলী দান করেছে। তাঁর সম্পাদিত আল-হেলাল পত্রিকার যাদুকরী লেখাসমূহ এক কালে গোটা ভারতবর্ষকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। তাঁর বিশেষ রচনাশৈলী আজ অবধি সাহিত্য জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে। আলেমগণের এই জাগ্রত মস্তিষ্কতা ও যুগ সচেতনতার কারণেই দেশ গঠন ও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনে আলেমগণের নিক্তিয় থাকার অভিযোগ কিংবা দেশের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে কখনও উত্থাপিত হয়নি। তাঁরা নিজেদেরকে জনবিশ্বিন্ণ উপদ্বীপ বানিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। অন্যান্য মুসলিম দেশের আলেমগণের ন্যায় তাঁরা যুগের নকীব দল হতে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন।

তাঁরা দাওয়াতী কার্যক্রমে ও দ্বীনের লক্ষ্য অর্জনে স্বদেশের ভাষা ব্যবহার করতেন এবং সাহিত্যিক মহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত উচ্চমানের ভাষা ব্যবহার করতেন। আমাদের উচিত এই কর্মধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, এই উত্তরাধিকার-লব্ধ সম্পদকে সংরক্ষণ করা। আমরা যদি দ্বীনের কার্যকর খেদমত আঞ্জামে অভিলাষী হই এবং বিশ্বদ্ব আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা সাধারণ ও বিশিষ্টজন সকলের নিকট পৌছাতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই যুগেও নিজেদের রচনা ও বক্তৃতা-শৈলীতে সাবলীল ও আকর্ষণীয় ভাষা প্রয়োগের কৌশল এবং সৃষ্টিশীল ভাষাশৈলী প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হবে। বক্তৃতা ও রচনাবলীকে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রচলিত সাহিত্যের উচ্চমানে উত্তরণ ঘটাতে হবে। এতে না আপনাদের মান-মর্যাদার হানী হবে, না পূর্বসূরীদের অবলম্বিত পথ পরিহারের দোষ আপনাদের উপর আরোপিত হবে। বরং তা হবে দ্বীনের হেকমত ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন

দ্বিতীয় কথা এই যে, বর্তমানে আরবী ভাষা শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত একটি ভাষা। আরব দেশসমূহে এই ভাষা বর্তমানে উৎকর্ষের শীর্ষে উপনীত পূর্ণ যৌবনদীপ্ত এক ভাষা। রচনা ও সংকলন, বক্তৃতা ও ভাষণ, রাজনীতি ও সাংবাদিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন এবং আইন-কানুন সহ সর্বক্ষেত্রে এই ভাষা বর্তমানে প্রতাপ-গর্বিতরূপে বিচরণশীল। আরবী মাদরাসাগুলোতে বর্তমানে মারাত্মক এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ধারণা করা হয় যে, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রেই প্রাচীন আরবীর অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ। অন্যত্র এর অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। আরবী ভাষার নামে এক নবতর ভাষা জন্মলাভ করেছে এবং এর মধ্যে ইংরেজী ও ফরাসী শব্দ বহুল পরিমাণে কোথাও সরাসরি কোথাও আরবীরূপ নিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। ভ্রান্ত এই ধারণার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এক জাতীয় ভীতি ও হতাশার শিকার হয়ে পড়েছে। আপনারা যদি আমার উপর আস্থা রাখেন তাহলে আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করব যে, ‘নতুন আরবী’ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব কোথাও নেই। মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্বান ও লেখক শ্রেণী বর্তমানে যে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন কুরআন, হাদীস ও ইসলাম-যুগের বরং প্রাক-ইসলামী যুগেরও ভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত নিবিড়। আধুনিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাঁরা আরবী ভাষার প্রাচীন সাহিত্য ভাণ্ডার এবং কুরআন ও হাদীস থেকেই প্রয়োজনীয় শব্দাবলী চয়ন করে করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের যে অবদান ও ভূমিকা তা যেমন বিশ্বয়কর তেমন প্রশংসনীয়ও বটে। নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর আক্রান্ত হওয়ার পর যে সকল পাশ্চাত্য শব্দাবলী আরবী ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছিল তা একটি একটি করে মূল আরবী ভাষা হতে বহিস্কৃত হয়েছে এবং তদস্থলে বিশুদ্ধ আরবী শব্দাবলী ব্যবহারের প্রচলন দান করা হয়েছে। বর্তমানে আরব দেশসমূহের ভাষা ও সাহিত্যমান এত উচ্চপর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং সংবাদ ও প্রচার জগত আরবীর সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে লুকায়িত ধন-ঐশ্বর্যকে এত ব্যাপক প্রচলন দান করেছে যে, এই ভাষায় কোন কাজ করতে গেলে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে এই ভাষায় দক্ষতা ও বৈদগ্ধ অর্জন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমাদের মাদরাসাগুলোতে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে, যে মানের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদান করা হচ্ছে তাতে আর যাই হোক আরব দেশসমূহে তা দিয়ে কোন ইলমী খেদমত ও দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা অসম্ভব। আপনাদের যদি আরব দেশসমূহে দ্বীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় অথবা ভারতীয় দ্বীনী আন্দোলন ও কার্যক্রমের সঙ্গে তাদেরকে পরিচিত করে

তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই উচ্চমানের ভাষা দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আরব দেশসমূহ হতে ভারত এখন দূরে থাকতে পারে না। বিশ্ব রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মধ্যপ্রাচ্য এখনও বিশ্বের হৃৎপিণ্ড এবং স্নায়ুকেন্দ্র। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে এবং দ্বীন ও মুসলমানের সঠিক দিক-নির্দেশনার কার্যে আলেমগণ যদি অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব এই বিষয়টির প্রতিও মাদরাসাগুলোর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আবশ্যিক। ভাষা ও সাহিত্য সত্যত জীবন্ত ও চলমান। এ থেকে কোন ব্যক্তি কি প্রতিষ্ঠান কিছুদিনের জন্যও যদি দূর-অবস্থান গ্রহণ করে তবে তজ্জনিত ক্ষতি ও ক্ষত বয়ে বেড়াতে হবে বহুকাল।

বিস্তৃত আকীদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ

ভাই ও বন্ধুগণ!

আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়ে নিলাম। কিন্তু কী করব বলুন—

“لَذِيذُ يَوْمِكَايَتٍ دَرَا زَرْفَقْتُمْ” ٤

‘কাহিনী তো বড় মজাদার, বিবরণ-আলাপ তাই করতে হল দীর্ঘ।’

বিদায় গ্রহণের পূর্বে একটি শেষ কথা বলতে চাই। কথাটি যদিও শেষে বলছি কিন্তু এর গুরুত্ব পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। আপনাদের ও আমাদের যারা আসলাফ ও পূর্বসূরী তাঁদের সর্বাধিক মহান কীর্তি হল, তাঁরা মুসলিম সমাজের দ্বীন চেতনা ও দ্বীনী মূল্যবোধের হেফাযত করেছেন। সমকালীন সমূহ ফেতনা ও বৈরী সঙ্কটের মোকাবেলায় তাঁরা ছিলেন নিরলস ও সংশ্লিষ্ট। রসম ও রেওয়াজ, বেদআত ও কুসংস্কার এবং জাহেলী রীতি-নীতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে নিরন্তর দাওয়াত ও সংগ্রামে কোন প্রকার অবহেলা কি শৈথিল্য তাঁরা প্রদর্শন করেননি। সেই সব পূর্বসূরীদের মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল, মাওলানা রশীদ আহমদ গাজুহীর ন্যায় পর্বতসম অটল নকীবে শরীয়তের নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা সবকিছুই বরদাশত করেছেন কিন্তু বিদআত কি শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ তাঁরা কখনও বরদাশত করেননি। ইংরেজ শাসনামলে যখন এই দেশে পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও সভ্যতা ও নাস্তিক্য ধ্যান-ধারণা ও আকীদা বিশ্বাস প্রাবনের রূপ ধারণ করল তখন পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে নিজেদের আদর্শ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, নিজেকে কি সমাজকে সেই প্রাবনে ভেসে যেতে দেননি। আপনাদের

আসলাফ ও পূর্বসূরীগণ ছিলেন বুদ্ধি-দীপ্ত চেতনার অধিকারী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও দ্বীনী মূল্যবোধের বিষয়ে নিরতিশয় আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। বহুরূপী যে বিদআতসমূহ মুসলমানদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে চলেছিল তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও সেগুলোকে বৈধতার সনদ দেননি। তাঁরা শরীয়ত রক্ষায় নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ প্রহরীর দায়িত্ব আজ্ঞাম দিয়ে গেছেন। শরীয়তের কোনরূপ বিকৃতি কি কোন বিদআত তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। জনসাধারণের গালি-গালাজ ও তিরস্কার তাদের উপেক্ষা ও জ্বালাতন এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া- এসব কিছুই তাঁরা বরদাশত করেছেন কিন্তু নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রশ্নে তাঁরা এতটুকু আপোষ করেননি। সমাজের লাখ লাখ মানুষ যে আজ সর্বনাশা বিদআত হতে সুরক্ষিত আছে এবং এখন পর্যন্তও যে মুসলিম সমাজে ঐ সকল বিদআত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃতি পায়নি তা তাঁদের ঐ সর্বসহা প্রচেষ্টা ও সংগ্রামেরই ফসল। আল্লাহ তাআলা শরীয়তের ঐ সকল সেবাকর্মীর, দ্বীনের ঐ সকল রক্ষকের কবরকে শীতল রাখুন এবং উম্মতের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান দান করুন। আমীন!

آسمان ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے

سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

তাঁর সমাধিকে আসমান করুক শিশিরসিক্ত

ঐ গৃহকে পাহারা দিক নতুন গজানো সব্জ তৃণলতা।

তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যে অসামান্য নিষ্ঠা ও সুন্দর ও সুচারুরূপে আজ্ঞাম দিয়েছেন তাতে তাঁদের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা, তাঁদের দ্বীনী উপলব্ধি, তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা ও দৃঢ়তার সত্যিকারের পরিচয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظَرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

‘মুমিনদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, আর তাদের কেউ কেউ তাদের জীবন দান করেছে। তারা তাদের অঙ্গীকারের কোন পরিবর্তন করে নাই।’ (সূরা আহযাব ২৩)

তারা তাঁদের জীবনকে রক্ষাপ্রাচীর বানিয়ে এই বাগানের হেফাযত করেছেন। তারা তাদের রক্ত দ্বারা তার বৃক্ষাদি সিদ্ধিগত করেছেন এবং আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন যে, বাগে শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ ও মালিগিরি এইভাবেই করতে হয়।

آغشتم ايم هر سر خارے بخون دل
قانون باغبانی صحرانوسته ايم

কলজের খুন দ্বারা প্রতিটি কাঁটার মাথা নিষিক্ত করেছি (এবং তা দ্বারা) বিয়াবানের বাগান পরিচর্যার নিয়ম-কানুন লিখে দিয়েছি।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এই সম্পদকে আমাদের বুকে জড়িয়ে রাখা উচিত। সকল সম্পদ অপেক্ষা একে অধিকতর প্রিয় ও মূল্যবান গণ্য করা উচিত। আপনাদের প্রতি আমার বন্ধু সুলভ অভিযোগ, বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অভিমানী অনুযোগ হল আপনারা এই সম্পদ হতে রিক্ত হতে চলেছেন। আপনাদের পূর্বসূরীদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কের সূত্রটি এখনও অভিন্ন ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের অনেকেই তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। অনেকে তো তাঁদের নাম পর্যন্ত জানে না। আপনাদের কতজন হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল? আপনাদের কতজন তাঁর লিখিত সীরাতে মুস্তাকীম ও তাকবিয়াতুল ঈমান পাঠ করেছেন? আপনাদের কয়জন তাওহীদ ও সুন্নাহের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন? কতজন বলতে পারবেন যে, জাহেলী যুগের ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহ-বিশ্বাসের স্বরূপ কী ছিল, কেনইবা কুরআন তাদেরকে মুশরিক বলে ঘোষণা করেছে? আপনাদের কতজন জানেন যে, তাওহীদের স্তরসমূহ কি কি, শিরক কতরূপে প্রকাশ পায়, তার ধরণ-ধারণ কত প্রকার, বিদআতের সুসংহত ও যথার্থ সংজ্ঞা কী, বিদআতের অপকারিতাই বা কী? এসব বিষয়ে আপনাদের অধ্যয়ন ও জ্ঞানের গভীরতা অন্য দশজনের তুলনায় অনেক বেশি থাকতে হবে। কিন্তু আমার ধারণা, আপনাদের অনেকের মস্তিষ্কই এসব বিষয় হতে শূন্য ও রিক্ত।

আধুনিক যুগের ফেতনা

সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আধুনিক যুগে নতুন নতুন ফেতনা আত্মপ্রকাশ করছে। পুরানো জাহিলিয়াতের প্রকাশ ঘটছে নতুন রূপে। পূর্বে ছিল বিদআতের সমস্যা, কিন্তু এখন প্রচলন লাভ করছে স্পষ্ট পৌত্তলিকতা ও

প্রাচীন মূর্তিপূজা সদৃশ ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপ। এই পরিস্থিতি আমাদের দ্বীনী মূল্যবোধ, আমাদের দ্বীনী স্বাভাব্য ও আমাদের তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। দেখার বিষয় হল- যারা বিদ্যাত ও সাধারণ রসম-রেওয়াজকে পর্যন্ত বরদাশত করেননি তারা এইসব শিরক-আশ্রয়ী রসম রেওয়াজকে ও শিরকী কর্মকাণ্ডকে বরদাশত করেন কীরূপে এবং এসবের বিরুদ্ধে তাদের কর্মধারাই বা কী হয়। আমাদের পূর্বসূরীগণের ইম্পাত-সম দ্বীনী দৃঢ়তা, দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদের অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি এবং আল্লাহ ও মানুষের সামনে এই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত যে, বাতিলের মোকাবেলায় তাঁরা কখনও মাথা নত করেননি, কখনও অস্ত্র ত্যাগ করেননি। দেখার বিষয় হল, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করবে এবং ইতিহাসের পাতায় আমাদের সম্পর্কে কিরূপ চিত্র অঙ্কিত হবে।

আধুনিক যুগে আমাদের দায়িত্ব

বন্ধুগণ!

তাকদীরে ইলাহী ও আল্লাহ তাআলার রহস্যময় নির্বাচন আমাদের জন্য যে যুগ নির্বাচিত করেছে সেই যুগে আমাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব অত্যন্ত বিশাল ও বিস্তৃত। তবে এই দায়িত্ব পালন যথাযথ হলে এর প্রতিদান ও সফলতাও বিশাল ও বিপুল। দায়িত্ব হতে পলায়ন কি যুগের নিকট পরাজয়বরণ কাপুরুষতা ব্যতীত কিছু নয়। ভবিষ্যতের অবশিষ্ট সময়টুকু প্রস্তুতি কাজে ব্যয় করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সর্বোত্তম মুরব্বী এবং দরদী উস্তাদ দান করেছেন। একটি দ্বীনী পরিবেশ এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আপনারা লাভ করেছেন। যুগের নাজুকতা, কালের চাহিদা ও আবেদন এবং নিজেদের কর্তব্য কর্মের বিপুলতা সম্যকরূপে অনুধাবন করুন। নিজেকে মূল্যবান ও কার্যকররূপে গড়ে তুলুন। যেন জাতির জন্য আপনারা মূল্যবান ও কার্যকর ও অপরিহার্য প্রমাণিত হতে পারেন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

একটি স্বাধীন মুসলিম দেশে আলিমগণের দায়িত্ব ও তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলী

বিল্লৌরী টাউন করাচীর জামে মসজিদে সমবেত জামিয়াতুল উলুমিল

ইসলামিয়া আল্লামা বিল্লৌরী টাউনের শিক্ষক, ছাত্র এবং

শহরের আলেম ফাযিলগণের সামনে প্রদত্ত ভাষণ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

সম্মানিত সুধী ও আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার পরিবারের মাঝে অবস্থান করছি। বিশেষত মাওলানা মুফতী ওলী হাসান টুংকী^১ সাহেব আমার পারিবারিক যে পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে আমি আরও বেশি নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা অনুভব করছি। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ ও সঙ্গী শিক্ষকগণের সামনে বসে কথা বলছি। এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার অসুস্থতা ও অতি ব্যস্ততার কারণে আমাকে মাহফিলে আমন্ত্রণ না জানানোর এক প্রকার সম্ভাবনা ছিল। তবুও আমন্ত্রণ ও দাওয়াত প্রদান করে আপনারা ভালোই করেছেন, আমাকে আপনাদের মাঝে কথা বলার মূল্যবান এই সুযোগ করে দিয়েছেন।

করাচীতে চার দিন অবস্থানকালে প্রত্যক্ষজাত ও পর্যবেক্ষণজাত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার আলোকে কোন রকম বিনয় ও রাখঢাক ব্যতীত আপনাদের সামনে কিছু তথ্য ও তত্ত্ব, কিছু দাবি ও আবেদন পেশ করব।

১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.)-এর পরে মুফতী ওলী হাসান সাহেবকেই পাকিস্তানের ‘মুফতীয়ে আযম’ হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনি দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার গর্ব বিশিষ্ট উস্তাদ মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকীর নাতি।

রাজনৈতিক পরিভাষা ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা তো স্বতন্ত্র বিষয়, কিন্তু বাস্তবতা হল, ভারতীয় মুসলিম সমাজের আলেমগণ দুইটি শাখারূপে দুই জায়গায় অবস্থানরত। আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়-নির্ধারিত নিয়তির সিদ্ধান্ত হল যে, এদের একটি শাখা হিন্দুস্তান তথা ভারতের মূল ভূখণ্ডেই থেকে যাবে যাতে তারা সেখানে ইসলামী দাওয়াতের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ও বহাল রাখার প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে পারেন। দ্বিতীয় শাখার জন্য আল্লাহ-নির্ধারিত নিয়তির সিদ্ধান্ত হল এই যে, তাঁরা সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডে থাকবেন এবং সমাজকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে তোলার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন। সেই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি অনুকরণীয় ও আদর্শ স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের উজ্জ্বল নমুনা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সমাজকে দিক-নির্দেশনা দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

বন্ধুগণ!

পৃথিবীর ইতিহাসে অসাধারণ সব বৈপ্লবিক সফলতা এবং মানবিক চেতনা-দৃঢ়তার অনন্য সাধারণ সব সফলতার ইতিহাস নিয়ে যদি কোন গ্রন্থ লিখিত হয় তবে নায়েবীনে আশিয়া ও উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের মধ্য থেকে একটি বাণী ও বাক্যকে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা, সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দিতে হবে এবং বাক্যটিকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতে হবে। বাক্যটি সমকালীন সঙ্কটময় পরিস্থিতির মোড় ও গতি-প্রকৃতি এরূপভাবে পাণ্টে দিয়েছিল, যার নজীর সমাজ ও ধর্মের ইতিহাসে দুর্লভ। আরব উপদ্বীপের একটি অংশে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইরতিদাদ ও ধর্ম ত্যাগের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পরিস্থিতি ছিল কঠিন সঙ্কটময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই এই সর্বনাশা প্রবণতা ইসলামের কালিমা ও হৃদপিণ্ডকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়ার উপক্রম করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন মাত্র কয়েক মাস হল। এরই মধ্যে যে আরবের দায়িত্ব ছিল সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সুরভি ছড়িয়ে দেওয়ার, ‘প্রেরিত উম্মত’-এর মর্যাদা নিয়ে যাদের কর্তব্য ছিল ইসলামের দাওয়াত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার তারা নিজেরাই ধর্ম ত্যাগের মহা সর্বনাশা পথের যাত্রী হল। ইসলামে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত) এরূপ কঠিন সঙ্কটময় কালের উদ্ভব কখনও ঘটেনি। ইসলামের এই কঠিনতম বিপদ ও সঙ্কটকালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পবিত্র যবান

দ্বারা একটি বাক্য উচ্চারিত হল। বাক্যটি পরিস্থিতির ধারা এবং ভবিষ্যত ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি আমূল পরিবর্তন করে দিল। শঙ্কার যে অন্ধকার ইসলামী জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা এমনভাবে বিদূরিত হল, যেমন সূর্যের উদয়ে বিদূরিত হয় রাতের ঘন অন্ধকার। তিনি বললেন, (ইতিহাস বাক্যটি বড় বিশ্বস্ততার সাথে ছব্ব সংরক্ষণ করেছে) *ينقص الدين وانا حي* (আমি জীবিত থাকব আর দ্বীন হাস পাবে?) অর্থাৎ আবু বকর জীবিত থাকবে আর দ্বীন কাটছাঁট হয়ে যাবে, দ্বীনে কাঁচি চলবে, গ্রহণ ও বর্জনমূলক বাছ-বিচার চলবে যে, এই রোকন গ্রহণ করব আর ঐ রোকন বর্জন করব? অসম্ভব! আমি জীবিত থাকতে দ্বীনের এই সর্বনাশ কিছুতেই হতে দেব না। আপনারা জানেন, সেই সময় যাকাত অস্বীকারের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। অপর দিকে মুসায়লামা কায্যাব নবুওয়াতের দাবি করেছিল এবং ইরতিদাদ বা দ্বীন ত্যাগের ভয়াবহ ব্যাধি মহামারী রূপ ধারণ করেছিল। মদীনা তাইয়েবা, জুআছা ইত্যাদি কিছু জায়গা ব্যতীত আরব উপদ্বীপের প্রায় সর্বত্র এই ফেতনা ইসলামের অস্তিত্বকে চির দিনের জন্য বিলুপ্ত করণের আশঙ্কায় নিপতিত করেছিল। এই ভয়াবহতম সঙ্কটকালে আল্লাহর এক বান্দা তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বাক্যটি উচ্চারণ করলেন। বাক্যটি স্বল্প কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। কিন্তু হৃদয়ের যে দরদ ও আকুতি, যে বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতা তাতে নিহিত তা কালির আঁচড়ে পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। বাক্যটি উৎসারিত হয়েছিল হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে এবং তা স্পর্শ করেছিল আবেগ ও উত্তাপের শীর্ষদেশ। পানীয় ভর্তি পানপাত্র থেকে পানীয় যেরূপ চলকে পড়ে, ভূমিতে তার অংশ বিশেষ নিপতিত হয়, বাক্যটি ছিল তেমনি হৃদয় উপচে পড়া আত্ননাদের প্রকাশ, নয় শুধু কতিপয় শব্দের সমষ্টি মাত্র।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এই চেতনা আমাদের পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া সম্পদ। এই সম্পদের উত্তরাধিকারীত্ব যুগপরম্পরায় সাধারণভাবে উন্নতের সকলের স্বত্বে আর বিশেষভাবে নায়েবীনে আখিয়া ও উলামায়ে কেরামের স্বত্বে আগত হয়েছে। এই চেতনার উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন দেশে ইসলাম বিপন্ন হওয়ার নিদর্শন সহ্য করা তো দূরের বিষয়, কল্পনা করাও দুঃসাধ্য হওয়া উচিত। কোন দেশে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে আর ইসলাম বিপন্ন হয়ে যাবে তা কি করে সম্ভব? এই চেতনাই দ্বিনী সংগ্রাম ও সাধনার, সকল দ্বিনী বিপ্লবের সমৃদ্ধ সব ইতিহাসের ভিত্তি।

আপনারা দাওয়াত ও আযীমতের ইতিহাস পাঠ করেছেন। এই সেই চেতনা যা খাল্কে কুরআন বা কুরআনের সৃষ্টত্ব বিশ্বাসের মুকাবিলায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে উজ্জীবিত করেছিল নিজ জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করতে। মুতাযিলা- পন্থীদের

মোকাবেলায় ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার পিছনেও ছিল এই চেতনা ও প্রেরণা। ভ্রান্ত আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মোকাবেলায় ইমাম গায্যালীর অসম দৃঢ় ভূমিকার পিছনে, রাফেজী ও শিয়া মতাবলম্বীদের মতবাদ ও বিশ্বাস খণ্ডনে এবং ধর্ম তত্ত্ব নির্ভর বহু জটিল বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা পূর্বক সত্য উদঘাটনে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার অতুলনীয় ভূমিকা গ্রহণের পিছনেও কার্যকর ছিল এই চেতনা। হিন্দুস্তানের ঐ সংস্কার কার্যক্রমের পিছনে যার প্রভাব প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত প্রলম্বিত ও জীবন্ত হয়ে আছে, এই চেতনাই ছিল কার্যকর। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর যুগান্তকারী সংস্কার কার্যক্রম ও বিপ্লবী আহ্বানের মূলেও ছিল এই চেতনা। হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) এবং আকাবিরে দেওবন্দের প্রত্যেকের স্ব-স্ব যুগে স্ব-স্ব রঙ ও ঢঙে সংস্কার ও শিক্ষা-দীক্ষামূলক কার্যক্রমের মূলে এবং কিতাব ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসার আর বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করার নিরন্তর সাধনা ও সংগ্রামের মূলেও ছিল এই চেতনা। এই সেই চেতনা যার স্কুরণ ঘটেছিল হযরত সিদ্দীকে আকবরের ঐ ছোট্ট অথচ বিপুল শক্তি জাগানিয়া, আবেগ ও উত্তাপে পূর্ণ ঐতিহাসিক বাক্যাটিতে- প্রত্যেক যুগেই নায়েবীনে রাসূলকে তেজোদীপ্ত পথের আলোকবর্তিকারূপে পথ দেখিয়েছে যে বাক্যাটি।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থ : সে এই কথাটিকে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গিয়েছে তার পরবর্তীদের জন্য, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা যুখরুফ ২৮)

আলেমগণ চিন্তা করুন

এর আলোকে আলেমগণ নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, তাঁরা উক্ত বাক্যাটিকে স্বীয় জীবনের মূলনীতি ও স্বীয় কর্মধারা ও কর্মতৎপরতার মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন কতটুকু? তাঁরা ভাবুন যে, তাঁরা জীবিত থাকতে নিজ দেশে ইসলাম অথবা ইসলামী জীবনাদর্শের বিপন্নতার অবকাশ আছে কি? মুসলমানদের অতীত ইতিহাস আমাদের জন্য বড় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। যেসব দেশে ইসলাম বিপন্ন কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অথবা ইসলাম বিদেষীদের সদৃশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা প্রতিষ্ঠিত আছে, যদি অনুসন্ধান করেন তবে সেসব দেশের ইতিহাসে এরূপ কিছু উপাদান পাবেন যা থেকে এই যুগে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি উপাদান ছিল আলেমগণের তীব্র মতভেদ ও অনৈক্য। দ্বিতীয় উপাদান ছিল জনসাধারণ থেকে আলেমগণের বিচ্ছিন্নতা। জনসাধারণের অন্তরে দীন কি দ্বিনের আলেমগণের প্রতি আকর্ষণ ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার মত

ব্যক্তিত্ব-প্রভাব তাঁদের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। যে দেশ খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী এবং খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের ন্যায় ব্যক্তির জন্ম দিয়েছিল সেই দেশ এই জাতীয় শক্তিশালী রূহানী ব্যক্তিত্বশূন্য হয়ে গিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী জীবনমান হয়ে গিয়েছিল উচ্চতর, বস্তুবাদিতা ও বৈষয়িক প্রীতি উপনীত হয়েছিল চূড়ান্ত মার্গে। বুখারার আমীরের প্রাসাদ এখনও বিদ্যমান। কমিউনিস্ট সরকার কমিউনিস্ট বিপ্লবের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে এই প্রাসাদ দেখিয়েই প্রচার করে যে, দেখ-কিভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়েছিল, স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কিভাবে বিলাসী তৈজসপত্র নির্মিত হয়েছিল। তাদের ভাষায়, ক্ষুধার্ত জনগণ মরছিল খাদ্যাভাবে অথচ আমীরের প্রাসাদ ছিল এইসব বিলাসী সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে আপনারা আন্দালুসের ইতিহাসে মদীনাতুয যোহরা এবং কিলআতুল হিরার বিবরণ পাঠ করুন। স্বপ্ন, কল্পনা ও রূপকাহিনীর মত মনে হবে। সেখানে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার পিছনে দুটি বড় উপাদানের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। এক. জীবনযাপনে বিলাসিতা ও আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের অপব্যবহার। দুই. ইসলামের প্রচার-প্রসারের পরিবর্তে ও নিজেদের জীবন যাপনকে ইসলামী আদর্শের আদলে পরিচালিত করার পরিবর্তে তারা তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিল শুধু কবিতা ও কাব্য চর্চা ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে। তৃতীয় উপাদানটি ছিল শাসক পরিবারের মধ্যে শাসন ক্ষমতার লোভে পারস্পরিক হানাহানি। তৎকালীন যুগে রাজনৈতিক দল ছিল না। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক হানাহানি এই উপাদানটির স্থান দখল করেছে। আন্দালুস পতনের কারণ ছিল এই তিনটি। এর সঙ্গে চারিত্রিক অবক্ষয় ও অধঃপাতের বিষয়টি তো ছিলই। আপনারা যদি ‘সুবহে সমরকন্দ’ গ্রন্থটি পাঠ করেন তবে আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন যে, সেখানে চারিত্রিক অবক্ষয় ও অধঃপাত কী পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

কিছু ভয়াবহ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

কিছু শঙ্কাজনক বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গৃহ মধ্যে অনেক সময় এমন কিছু বিরাজ করে যা বহিরাগত ব্যক্তির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে অথচ গৃহে বসবাসকারীরা তা উপলব্ধি করতে পারে না। আপনি হয়তো আলোতে অবস্থান করছেন। আপনার অনুভূতি হবে এক রকম, কিন্তু ঘন অন্ধকার হতে কোন ব্যক্তি যদি আপনার আলোকিত গৃহে প্রবেশ করে তবে তার অনুভূতি ও উপলব্ধি হবে ভিন্ন রকম। কোন বিষয় সর্বদা দেখা ও শোনার কারণে তা এরূপ স্বাভাবিক ও সাধারণ হয়ে যায় যে, তাতে কোন নতুনত্ব ও অভিনবত্ব দৃষ্ট হয় না। তা কোনরূপ

মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হয় না। কিন্তু বহির্দেশ থেকে আগত ব্যক্তি বিষয়টিকে তড়িৎ উপলব্ধি করতে পারে।

উদাহরণত এই দেশের সাইনবোর্ডগুলো সাধারণত উর্দুতে লিখিত। আপনাদের দৃষ্টিতে এতে কোন বৈচিত্র ধরা পড়ে না। কিন্তু আমরা হিন্দুস্তানীর যেহেতু ইংরেজী অথবা হিন্দী সাইনবোর্ড দেখে অভ্যস্ত, তাই আপনাদের দেশের সাইনবোর্ডগুলো দেখে আমরা পুলকিত হব এবং বলে উঠব, মাশাআল্লাহ এখানে তো সর্বত্র উর্দু আর উর্দুই দৃষ্ট হচ্ছে!

আমার নিজের ব্যাপারে আমি না দূরদর্শিতার দাবি করি, না গভীর দর্শিতার, না বিচক্ষণতার দাবি করি, না অতি সচেতনতার।

ইকবালের ভাষায়—

میں نہ عارف نہ مجر دنہ محدث نہ فقیہ
مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام
ہاں عالم اسلام پر رکھتا ہوں نظر
فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیل فام

‘আমি না আরেফ, না মুজাদ্দিদ, না মুহাদ্দিস না ফকীহ
নবুওয়াতের মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ
তবে ইসলামী বিশ্বের ব্যাপারে সচকিত আমার দৃষ্টি
আমার নিকট উদ্ভাসিত নীল আকাশের রহস্য।’

হাঁ আমি এতটুকু বলতে পারি যে, আমি বহির্দেশ হতে আগত। অতএব আমার বক্তব্য বিবেচনাযোগ্য হওয়া উচিত। ইতিহাস অধ্যয়ন এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে নিবিড় প্রত্যক্ষজাত জ্ঞানের আলোকে বলছি যে, আকীদা-বিশ্বাসগত মতভেদ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই ভূখণ্ডের জন্য মারাত্মক এক হুমকি। এখানকার ধর্মীয় দল ও উপদলগুলো একে অপরের প্রতিপক্ষ ও শত্রু হয়ে আছে। বিতর্কিত যে বিষয়গুলোর সমাধান জ্ঞানগত যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে ঘরোয়াভাবে করা যেত তা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সর্বত্র যুদ্ধংদেহী মনোভাব গড়ে উঠেছে। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ ও সর্বনাশা ব্যাপার। আমিও ঐ দলেরই একজন, আপনাদের সম্পর্ক যে দলের সঙ্গে। আমার উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনা হবহু তাই যে

উপলব্ধি ও যে চিন্তা-চেতনা আপনারা লালন করেন। আমাদের মুরব্বীগণ তো ঐ পতাকা সমুন্নত করেছেন যার কারণে আমরা নানা রকম বিদ্রূপাত্মক ও নিন্দা প্রাপক উপাধি লাভ করেছি এবং সমূহ বিপদ ও তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু পায়ের তলায় যদি মাটিই না থাকে তবে এই প্রাসাদ গড়ে উঠবে কিসের উপর? একদল প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, তারাই পাকিস্তানের জনক। অপর দল প্রমাণ করতে মরিয়া যে, তারাই সঠিক পথাবলম্বী, এই দেশের সর্বোচ্চ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ার অধিকারী একমাত্র তারাই। মাফ করবেন আমি নির্দিষ্ট কোন দলের প্রতি ইঙ্গিত করছি না; অনুসন্ধান করলে এর পিছনে যশপ্রীতি ও মর্যাদা মোহের সন্ধান পাওয়া যাবে। আমাদের পূর্বসূরীগণ দীন রক্ষার তাগিদে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। প্রয়োজনে অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন, নতি স্বীকার করেছেন, নিজ অবস্থান থেকে বিনীতভাবে নিম্নে অবতরণ করেছেন। তাঁরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ভাই! আপনিই উপরে থাকুন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু দীন অটুট থাকুক। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর মাসলাকের অনুসারী এবং তাঁর চেতনায় উজ্জীবিত আমাদের হিন্দুস্তানী বুয়ুর্গগণের কর্মধারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এইরূপই ছিল। শ্রেণী কক্ষে এবং ইলমী মজলিসসমূহে বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা প্রাণ খুলে আলোচনা করুন, কিন্তু দেশকে হুমকির দিকে ঠেলে দেবেন না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে যখন কোন মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে এরূপ দাবি উচ্চারিত হয় যাতে থাকে অহংবোধ কিংবা দণ্ডের প্রকাশ তখন এর প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী আরেকটি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে “ہم چوں من دیگرے نیست” ‘আমাদের সমকক্ষ কেউ নাই’ ধ্বনি সোচ্চার হয়ে ওঠে।

আমাদের বুয়ুর্গগণ সর্বদা নিজেদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতেন বিনয়ের সাথে, নিজেকে দোষযুক্ত ভেবে এবং ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে, সওয়াবের প্রত্যাশায়। তাঁরা না কখনও নেতৃত্বের দাবি করতেন, না ক্ষমতা লাভের। তাঁরা এই দাবিও করতেন না যে, তাদের দলই সবকিছু করেছে বা তাদের দলই সমৃদ্ধ দল।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর (রহ.) পত্রাবলী পাঠ করুন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহর (রহ.) পত্রাবলী পাঠ করুন। ভারতবর্ষে যখন মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার প্রদীপ নিপ্রভ হয়ে আসছিল, মোঘল শাসনের অবসান ছিল সময়ের ন্যাপার মাত্র তখন তাঁরা আহমদ শাহ আবদালী, নজীবুদ্দৌল্লাহ প্রমুখের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন তা পাঠ করুন। দেখবেন, তাঁরা কি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, কী বেদনা ভরা হৃদয়ে পত্র লিখেছিলেন।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) মুসলমানদের অসহায়ত্বের বিবরণ তুলে ধরে যে বিশদ পত্র লিখেছিলেন তা থেকে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাঁর দরদ ও ইখলাস কী পরিমাণ ছিল তা অনুমান করা যায়। তন্মধ্যে একটি বাক্য ছিল অত্যন্ত আবেগ সৃষ্টিকারী। তিনি লিখেছিলেন— আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশকারী মেনে বলছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের প্রতি রহম করুন এবং একটিবার আসুন। আবেগ ভরা এই পত্র পেয়েই আহমদ শাহ আবদালী হিন্দুস্তানে আসলেন এবং মারাঠা শক্তির কোমর এমনভাবে ভেঙ্গে দিলেন যে, তারা আর কখনও মাথা উঁচু করতে পারেনি। এই ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)। যাঁর হৃদয়ের আকুতি ও দরদ এবং যাঁর দূরদর্শিতা হিন্দুস্তানের ইতিহাস ও চিত্র পাল্টে দিয়েছিল। আপনারা নিজেকে তাঁরই উত্তরসূরী বলে গণ্য করেন। এই সম্পর্কের দাবি অনুযায়ী দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন আপনারা তা প্রদর্শন করুন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিন যে, ‘আচ্ছা ভাই! তোমরাই সঠিক, তোমাদের কীর্তিই সর্ব মহান। আস, আমরা তোমরা সকলে মিলে এই দেশকে রক্ষা করি। বর্তমানে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আলেমগণের পারস্পরিক এই হানাহানি কতটুকু সঙ্গত? আমার আকীদা-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ রক্ষা করেই আমি বলছি যে, আলহামদুলিল্লাহ আমার আকীদা-বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটতে দিতে আমি প্রস্তুত নই। না ইবাদতের বিধি-বিধান সংক্রান্ত প্রশ্নে, না আকীদা-বিশ্বাসের মূলনীতির প্রশ্নে— কোন ক্ষেত্রেই কোন রকম সমঝোতার জন্য আমি প্রস্তুত নই। কিন্তু এক তো হল নিজে আমল করা। আরেক হল গুণগোল পাকানো, জনসাধারণকে বলির পাঁঠা বানানো এবং সমগ্র দেশকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা। এটা সমীচীন নয়। একটি কনফারেন্স হচ্ছে ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ’র, আরেকটি হচ্ছে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’র। এটা সুস্থ জীবন যাপনের পদ্ধতি নয়।

জনগণের সাথে আলেমগণের ঘনিষ্ঠতা

দ্বিতীয় কথা হল, জনসাধারণের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। এখানে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, জনসাধারণের সঙ্গে আলেমগণের যেরূপ সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল, তাতে ঘাটতি রয়েছে। হিন্দুস্তানে জনসাধারণের সঙ্গে আলেমগণের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা এখানকার তুলনায় অধিক— এই কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। হিন্দুস্তানে রাজনৈতিক ময়দানেও এবং সাহিত্য ও গবেষণার ময়দানেও আলেমগণই চালকের

আসনে আসীন। তাঁদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তিও সেখানে স্বীকৃত। হিন্দুস্তানে আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতজনেরা আলেমগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নয়। সাহিত্য সভা ও জ্ঞানগবেষণামূলক সভা-সমাবেশে আমরা আলেমরা উপস্থিত হই এবং আলহামদুলিল্লাহ, সেখানে আমাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদান করা হয়। জনসাধারণের সাথে আপনাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। জনসাধারণ যেন আপনাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়।

আলেমগণের জীবন হবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়

তৃতীয় যে কথাটি বলার তা হল, আমাদের জীবন জনসাধারণের জীবন হতে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া উচিত। দর্শক যেন স্পষ্ট দেখতে পায় যে, আলেমগণ দুনিয়ালোভী নয়। তাঁদের নিকট ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব জীবনের মাপকাঠি নয়। আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলার অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ। আমাদের পূর্বসূরীগণের জীবনে আমরা এরই প্রতিফলন দেখতে পাই। আলেমগণের মধ্যে যত দিন চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্য জন্মলাভ না করবে, যত দিন তাঁদের মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর মহৎ গুণ সৃষ্টি না হবে তত দিন তাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রভাববিস্তারী এবং সম্মানার্থ হবে না, হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে দ্বীনের গভীর প্রভাব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। অমুক মাদরাসা এত বিশাল, তমুক মাদরাসা অত বিশাল, অমুক মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা এত এত—এসব কিছু দ্বারা আলেমগণের মর্যাদা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। আলেমগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে নিজেকে অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে তোলার দ্বারা। জনসাধারণ যখন দেখবে যে, তারা যেসব বিষয়ে জান কুরবান করতে প্রস্তুত সেসব স্পর্শ করাকেও আলেমগণ গুনাহ ও গর্হিত বলে বিবেচনা করেন, তাঁদের অন্তরে সেসব বিষয়ের প্রতি কোন আকাজক্ষা নেই, তখনই আলেমগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। জনসাধারণ যখন দেখবে, যে বিত্ত-বৈভব ও ধন-সম্পদকে তারা জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান অনুষ্ণ বলে ধারণা করে আলেমগণের নিকট তার কোন মূল্যই নেই, তা তাদের নিকট নিতান্তই তুচ্ছ বিষয় তখন আলেমগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের আকাবিরগণের ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ঢাকার নবাব একবার হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (রহ.)কে ঢাকায় এসে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আবেদন জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করলেন। হযরত খানবী (রহ.) উত্তরে বলে পাঠালেন, ‘আপনার নিকট (ধন-সম্পদের) যা আছে তা আমার প্রয়োজন অনুপাতে আমার নিকটও আছে, কিন্তু আমার নিকট যা

আছে (তথা দ্বীনী ইলম) তা আপনার নিকট আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুও নেই। অতএব আপনার উচিত আমার নিকট আপনার আগমন করা, আপনার নিকট আমার গমনের কোন প্রয়োজন নেই।

আরেকটি আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আপনাদেরকে শুনাই। শায়খ সাঈদ হালাবী নামক একজন বুয়ুর্গ আলেম ছিলেন। দামেশকের একটি মসজিদে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে পাঠদান করছিলেন। তাঁর পায়ে ব্যথাজনিত সমস্যা ছিল। মসজিদে শিক্ষাদানের রীতি হল উস্তাদ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসেন। আর তাঁর সামনে ছাত্ররা তাঁর দিকে মুখ করে বসে। ফলে মসজিদে কেউ প্রবেশ করলে উস্তাদ তাকে দেখতে পান কিন্তু ছাত্ররা আগন্তুককে দেখতে পায় না। শায়খ হালাবী ছাত্রদেরকে সামনে নিয়ে তাদেরকে পাঠদান করছিলেন। এমন সময় মসজিদে প্রবেশ করলেন খেদীবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতাশাসক মুহাম্মাদ আলীর পুত্র তৎকালীন শাসক ইবরাহীম পাশা খেদীব। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত শাসক। তার নাম শুনে জনগণের কাঁপুনি শুরু হত। জনগণের মাঝে তার প্রতি ছিল প্রচণ্ড ভীতি। তিনি সঙ্গে জল্লাদ নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। শায়খ হালাবী ব্যথাজনিত সমস্যার কারণে তাঁর পা দুটো সামনের দিকে মেলে দিয়ে ছাত্রদেরকে পাঠদান করছিলেন। ইবরাহীম পাশা নিকটে আসতেই ছাত্ররা তাকে দেখল এবং ছাত্রদের ধারণা হল, শায়খ এবার পা গুটিয়ে নেবেন। কারণ, বাদশাহ বলে কথা। তাঁকে তো সম্মান করতেই হয়। কিন্তু শায়খ ছিলেন নির্বিকার। তিনি একটুও নড়লেন না। পা দুটো প্রসারিত রেখেই তিনি তাঁর পাঠদান কার্য অব্যাহত রাখলেন। ইবরাহীম পাশা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ছাত্ররা তখন নিজেদের পরিহিত জামা কাপড় গুটাতে লাগল। কারণ, তাদের নিশ্চিত ধারণা হল, এখনই জল্লাদের প্রতি নির্দেশ হবে শায়খকে হত্যা করার। শায়খের পবিত্র রক্তে নিজেদের কাপড় রঞ্জিত হোক ছাত্ররা তা চাচ্ছিল না। ইবরাহীম পাশা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শায়খের সবক'শুনতে লাগলেন। শায়খের ব্যক্তিত্বের ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভীতির এরূপ প্রভাব বাদশাহর উপর পড়ল যে, তিনি কিছু বলতে পারলেন না। অবশেষে নীরবে চলে গেলেন। পরবর্তীতে তিনি শায়খ হালাবীর জন্য স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলি গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে প্রেরণ করলেন। আল্লাহুওয়ালাদের প্রভাব ঐরূপই হয়। জবাবে শায়খ যে বাক্যটি উচ্চারণ করলেন তা ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। আমি মনে করি এরূপ একটি বাক্যের জন্য গীতি-কবিতা সংকলনের দশ বিশ গ্রন্থ উৎসর্গ করে দেওয়া যায়। তিনি বললেন—

الذى يمد رجله لا يمد يده

‘যে ব্যক্তি পা প্রসারিত করে রাখে সে কখনও তার হাত প্রসারিত করে না। অর্থাৎ যদি হাত প্রসারিত করে কিছু গ্রহণের ইচ্ছা আমার থাকত তবে আমি তোমার আগমন কালে পা প্রসারিত করে রাখতাম না, গুটিয়ে রাখতাম। আমার পা মেলে রাখাটাই প্রমাণ করে যে, আমি দুনিয়ার কিছু গ্রহণ করার জন্য হাত প্রসারিত করার লোক নই। যে পা প্রসারিত করে সে হাত প্রসারিত করে না। এই চেতনা ও মূল্যবোধ আলেমগণের মধ্যে, দ্বীনের সেবকদের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকা উচিত। যদি এই চেতনা ও মূল্যবোধ না থাকে তবে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি, আপনার সকল ইলমী যোগ্যতা, আপনার পাণ্ডিত্য, আপনার বাগ্মীতা সব নিষ্ফল। অপরের মাঝে কোন প্রভাবই আপনি বিস্তার করতে পারবেন না। বাস্তব জীবনে আপনাকে হতে হবে অপরের জন্য আদর্শ। সমাজের বিত্তশালী ও ক্ষমতার অধিকারীদের যেন এই ধারণা না জন্মায় যে, আলেমরা পয়সার গোলাম, তাদেরকে পয়সা দিয়ে খরিদ করা যায়। বস্তৃত আলেমগণ টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের গোলাম নন। তাঁরা নিজ আদর্শের পরিপন্থী কোন কাজ করেন না। আলেমগণের জীবন যাপন অধিকতর সাদাসিধা। তাঁরা নিম্নমানের গৃহে বাস করেন, নিম্নমানের খাদ্য আহার করেন। আপনাদের মাঝে এইসব গুণের প্রকাশ ঘটা উচিত। আমাদের পূর্বসূরীগণ এইসব গুণের অধিকারী ছিলেন। সমাজ তাঁদেরকে এইসব গুণের অধিকারী রূপে দেখতে পেত। আমি আমার শিক্ষকমণ্ডলীর ঘটনা শুনাচ্ছি। মাদরাসা কাসেমুল উলূম লাহোরে আমি লেখাপড়া করতাম। সেখানে আমাদের জন্য মাঝে মাঝে অতি উন্নতমানের খাদ্য রান্না হত। মাদরাসার পিছনে হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব বসবাস করতেন। তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব মরহুমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রগাঢ়। মাদরাসায় যখন অতি উন্নতমানের খাবার রান্না হত তখন আমি বুঝতে পারতাম আজ তাদের বাড়িতে খাদ্যাভাবে উপোস চলছে।

আমাদের আকাবিরদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঐ সময়ে দ্বীনের যে বিশাল খেদমত গ্রহণ করেছেন তা তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণেই। তাঁরা ছিলেন দুনিয়াবিরাগী, নির্মোহ, ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য প্রবলভাবে উন্মুখ, পরমতসহিষ্ণু এবং অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁরা অপরকে জ্ঞানে ও গুণে নিজ অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর এগ্রে মনে করতেন। ‘আমার সমকক্ষ কেউ নেই’-এরূপ আত্মগরিভা তাঁদের কারও মাঝে কখনও ছিল না। বরং আমি বড় বড় ব্যক্তিকে দেখেছি, নিজকে অত্যন্ত হীন ও

তুচ্ছজ্ঞান করতে। শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট কেউ মুরীদ হতে চাইলে কোন কোন সময় তাঁকে আমি কবিতার এই পংক্তি আবৃত্তি করতে শুনেছি।

نہ گلم نہ برگ بزم نہ درخت سایہ دارم

در حیرتم کہ دھقان بچہ کار کا شت مرا

‘আমি না ফুল, না সবুজ পাতা, না ছায়াদানকারী বৃক্ষ
আমি ভেবে অস্থির হই যে, দিহকান’ আমাকে কোন্
কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

আমার মনে হত যে, কেউ তাঁর নিকট মুরীদ হতে আসলে তিনি খুব লজ্জাবোধ করতেন। আল্লাহর ওলীগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব প্রকৃতি এইরূপই ছিল।

গোঁড়ামী ও হঠকারিতা পরিহার করা উচিত

ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিভেদ ও তজ্জনিত গোঁড়ামী ও হঠকারিতা এবং প্রদেশ ভিত্তিক আঞ্চলিকতা ও তজ্জনিত গোঁড়ামী ও হঠকারিতাও এই দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই হঠকারিতাই বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।^১

এই জাতীয় অন্ধ ভাষাপ্রীতি ও প্রদেশপ্রীতির বিরুদ্ধে আলেমগণের উচিত সোচ্চার হওয়া এবং এতদসম্পর্কে ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শ প্রচার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

من تعذى عليكم بعداء الجاهلية فاعضوه بهن ابیه ولا تکنوا

নবীর যে পবিত্র মুখে কুরআন উচ্চারিত হত, সারা পৃথিবী যে পবিত্র মুখের মাধ্যমে কুরআন শ্রবণ করেছে, যে মুখ হতে কখনও কোন অনুচিত কথা কি বাক্য

১. দিহকান অর্থ কৃষক। রূপকার্থে ‘আল্লাহ তাআলা’ বুঝানো হয়েছে।

২. (পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা উভয় পাকিস্তানের জন্য উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল, প্রতিবাদে সারা বাংলা গর্জে ওঠে। সালাম, বরকত সহ বেশ কিছু প্রাণ বাংলাভাষা রক্ষার আন্দোলনে শহীদ হন। এই আন্দোলনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপণ করে। অবশেষে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশটি বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তানী শাসকদের এই অন্ধ উর্দুপ্রীতি ও হঠকারিতার দিকেই সাইয়েদ, আবুল হাসান নদভী (রহ.) তাঁর এই ভাষণে ইঙ্গিত করেছেন। -অনুবাদক)

নির্গত হয়নি সেই মুখ হতেই এই প্রথম এবং এই শেষ বারের মত এরূপ কঠিন ও
 ৫৮ বাক্য উচ্চারিত হল। তিনি যা বললেন, তার মর্মার্থ হল- যারা জাহেলী শ্লোগান
 উচ্চারণ করে- অন্ধ বংশপ্রীতি ও গোষ্ঠীপ্রীতি যারা উস্কে দেয় তাদেরকে তাদের
 বাপ তুলে গালি দাও, ইঙ্গিতমূলক ভাষায় নয় বরং স্পষ্ট ভাষায়। আল্লাহ্ আকবার!
 আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহর রাসুলের যে মুখ হতে ফুল ঝরে পড়ত, মধু নিঃসৃত
 হত, যে মুখে কুরআন উচ্চারিত হত, যে মুখে ওহী ব্যতীত কিছু উচ্চারিত হত না-

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

অর্থ : সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

(সূরা নাজম, আয়াত ৩-৪)

সে মুখ হতেই উচ্চারিত হল এরূপ কঠিন বাক্য। তিনি অন্য কোন বিষয়ে এরূপ
 শক্ত কথা বলেছেন বলে তো আমার স্মরণে পড়ে না। আপনাদের উচিত
 পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করা এবং প্রতিটি প্রদেশ হতে বালকদেরকে নিয়ে
 এসে শিক্ষাদান করে এরূপ আলেম তৈরি করা যাতে তাদের মধ্যে কোনরূপ মূঢ়তা
 ও অন্ধত্ব অবশিষ্ট না থাকে, তাদের মধ্যে বরং এর প্রতি ঘৃণা জন্ম নেয়। অতঃপর
 তাদেরকে স্ব-স্ব প্রদেশে প্রেরণ করতে হবে। অন্ধ প্রদেশপ্রীতি ও অন্ধ ভাষাপ্রীতির
 বিরুদ্ধে তারা হবে সোচ্চার ও প্রতিবাদী। জাহেলিয়াত প্রসূত এই ভাষা ও
 গোষ্ঠীপ্রীতিই বহু ইসলামী রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে। এর ফলে বহু ইসলামী
 রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটেছে।

জনসাধারণের মাঝে আপনারা আপনাদের ভাষার যাদু এবং পাণ্ডিত্য হয়তো
 প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। কাজের
 কাজটি হবে তখনই যখন আপনারা মানুষের জন্য হবেন আদর্শিক দৃষ্টান্ত,
 আপনাদের জীবনাচার হবে উন্নত, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আপনারা হবেন
 বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নির্মোহতা, আত্মমর্যাদাবোধ, অনন্যমুখাপেক্ষীতা ও আধ্যাত্মিকতায়
 আপনারা হবেন অনুসরণীয়। জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনাপূর্ণ দিক থেকেও এবং চারিত্রিক
 ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিক থেকেও প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হওয়া
 প্রয়োজন। আমাদের পূর্বসূরীগণ এইরূপ ছিলেন, ঐরূপ ছিলেন- এই জপ
 অকার্যকর। কোন দ্বীন ও মিল্লাত, কোন সংস্কৃতি ও সভ্যতা এইরূপ জপ ও শ্লোগান
 দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় বাস্তবানুগ কর্মসূচি
 গ্রহণের ও তা বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামের। আমরা নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও
 চিন্তা-চেতনাকে ইতিহাস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কিন্তু তা হবার নয়।

জনসাধারণ কোন এক সময়ে বলবে, 'সাহেব! অনেক শুনেছি। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আপনাদের পূর্বসূরীগণ এইরূপ ছিলেন, ঐরূপ ছিলেন। আমার পিতা বাদশাহ ছিলেন, আমার পিতা তমুক ছিলেন। বলুন আপনি কী?' ইতিহাস তো অনেক শুনানো হয়েছে, গ্রন্থও অনেক লেখা হয়েছে। এখন প্রয়োজন কর্ম-তৎপরতার, ত্যাগ ও তিতিষ্কার, প্রয়োজন মনোযোগ আকর্ষণকারী ও যাদুকরী প্রাণের।

এই দীন জীবন্ত, জীবনধারীদের

দ্বারাই তা টিকে আছে

এটি করাচীতে অবস্থিত পাকিস্তানের বৃহৎ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বিন্দৌরী টাউনের ছাত্রদের সামনে ১৯৮৭ সালের ১৩ই জুলাই প্রদত্ত ভাষণ। ছাত্র ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এশীয় ইসলামী কনফারেন্সে যোগদানের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ।

প্রিয় ছাত্র ও সুধীবৃন্দ!

এই দ্বীনের জন্য একের পর এক সজীব ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হতে থাকবে। এই দ্বীনের জন্য এটাই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত রীতি। কোন বৃক্ষকে সবুজ-শ্যামল ও জীবন্ত মনে করা হয় তখনই যখন তাতে নতুন নতুন পাতা গজায়, নতুন নতুন ফুল ফুটে থাকে আর ফল দান করে। এই দ্বীন জীবন্ত একটি দ্বীন। জীবনের অধিকারীদের জন্য এই দ্বীন। এই দ্বীনের জন্য প্রয়োজন জীবনের অধিকারী ব্যক্তিত্বের। ঐ সকল দ্বীন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে সকল দ্বীন জ্ঞানের জগতে, চিন্তার জগতে এবং নেতৃত্বের জগতে জীবনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ প্রভাবিত হয় জীবনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব দ্বারাই। কারণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় অপর প্রদীপ দ্বারা। প্রদীপ হতে অপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়া উচিত এবং তা হওয়া উচিত অব্যাহত ধারায়।

মুসলিম জাতিকে যদি টিকে থাকতে হয় তবে এই জাতির উচিত, জীবনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা। উচিত, এর জ্ঞান বৃক্ষ, সংস্কার বৃক্ষ, রূহানিয়াত ও আত্মিকতার বৃক্ষ সুপল্লবিত হওয়া এবং নতুন নতুন ফুল ও ফলে সুশোভিত হওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে— ‘আমার উম্মত রহমতের বৃষ্টির ন্যায়। কেউ এলতে পারে না বিশৃঙ্খল ও মৃত ভূমির জন্য তার প্রথম ফোটা অধিক উপকারী, না তার শেষ ফোটা। আমি ইতিহাস লেখক। আমার ভাবনা, আমার রচনা ও লেখনী ইতিহাসেরই অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমি বলতে পারি—

عمر زری ہے اس دشت کی سیاحی میں

‘বয়স পার হয়েছে আমার এই ইতিহাস জগতেরই সফরে।’

আমি এখনও এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, আমাদের আসলাফ ও পূর্বসূরীদের মহান কীর্তি, তাঁদের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠতা, তাঁদের সত্যনিষ্ঠতা, আল্লাহর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা, তাঁদের অবিচলতা, তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানী পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মহা মূল্যবান পুঁজি এবং জীবন জগতে প্রাণ সঞ্চারকারী। আমরা সর্বদা বলে থাকি যে, আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরীগণ এইরূপ ছিলেন, ঐরূপ ছিলেন, তাঁদের মেধা ও প্রতিভা ছিল এইরূপ উচ্চমানের, তাঁদের জ্ঞানের পরিধি ছিল এইরূপ বিস্তৃত, তাঁরা ছিলেন পণ্ডিত ও বিদগ্ধ আলেম। এই সবই সত্য, কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয়।

ফয়েয ও বরকত মৃতদের দ্বারাও লাভ হয় কিন্তু দিক-নির্দেশনার

কাজটি হয় শুধু জীবনের অধিকারীদের দ্বারা

অন্য কারও মুখে শুনলে হয়তো আপনারা মনে করবেন লোকটি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, ইতিহাসের প্রতি সে অবিচার করেছে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান ও চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রের সাথে আমার সম্পর্ক সেই প্রতিষ্ঠানটি ইসলামের ইতিহাস সংকলনের কাজ করেছে। যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় ইসলামের ইতিহাস রচনার সৌভাগ্য লাভ করেছে সেই প্রতিষ্ঠান তথা ‘দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা’ ও ‘দারুল মুসান্নিফীন’ এর সাথে আমার সম্পর্ক। অতএব আমার মুখ থেকে শুনুন। আমাদের আসলাফ ও পূর্বসূরীদের জীবন ও কর্ম সংরক্ষিত হওয়া উচিত। তাঁদের কীর্তিগুলোকে অনুসন্ধান করে করে লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত এবং নতুন প্রজন্মকে এর সাথে পরিচিত করে তোলা উচিত। বিষয়টি অনস্বীকার্য। কিন্তু এই দ্বীনের জন্য আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হল, এই দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। অতএব এর জন্য প্রয়োজন জীবন্ত ব্যক্তিদের। রূহানিয়াত ও আত্মিক উৎকর্ষও লাভ হয় জীবিত ব্যক্তিদের দ্বারা। গবেষক সুফী ও মাশায়েখগণের সুচিন্তিত অভিমতও এটাই যে, তাকিয়া ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা, ইলমে বাতেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান জীবিত ব্যক্তিদের নিকট থেকেই অর্জন করা যায়। তাদের নিকট থেকেই এই পথে চরম সফলতা লাভ হয়। নতুবা একজন মৃত ব্যক্তিই যথেষ্ট হত। কেননা এরূপ একাধিক ব্যক্তি অতিক্রান্ত হয়েছে যাদের মধ্য থেকে একজনই যথেষ্ট হওয়ার মত উচ্চমানসম্পন্ন ছিল। কিন্তু সুফীগণ বলেন যে, জীবনের মধ্যে রয়েছে চলমানতা ও বর্ধিষ্ণুতা। জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্য। এক রূহ থেকে অপর রূপে, এক রঙ থেকে অপর রঙে পরিবর্তন জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক ব্যাধি নিরাময় হল

তো আরেক ব্যাধির আক্রমণ শুরু হল। অতএব সদা ব্যস্ত ও চলিষ্ণু এই জগতের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, যিনি চলে গেছেন ওপারে তিনি এই পৃথিবীর জীবন্ত ও চলিষ্ণু মানবের জন্য দিক-নির্দেশনা দান করতে পারেন না। হাঁ ফয়েজ ও বরকত লাভের যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভ হতে পারে। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু দিক-নির্দেশনা লাভ হতে পারে শুধু জীবনের অধিকারীদের দ্বারাই। কোন জাতির মাঝে সবকিছুই আছে—বিশালাকারের সব গ্রন্থাগার আছে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক রয়েছে, কিন্তু জীবনের অধিকারী ঐ সকল ব্যক্তিত্ব নাই যাদের হৃদয়ের উত্তাপ থেকে ঐ জাতি উষ্ণতা হাসিল করতে পারে, যাদের চিন্তা-চেতনা ও গবেষণা থেকে, যাদের বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের গভীরতা এবং দ্বীনের যথার্থ উপলব্ধি থেকে ঐ জাতি আলো গ্রহণ করতে পারে তবে ঐ জাতির ধ্বংসের আশঙ্কা যথেষ্ট রূপে বিদ্যমান।

দ্বীন সর্বদা সজীব হতে থাকবে

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে—

ان الله يبعث على راس كل مائة سنة من يجدد لهذه الامة امر دينها

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রতি শতবর্ষে সংস্কারক প্রেরণ করেন, যিনি এই দ্বীনকে নবজীবন দান করেন এবং সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করেন। এর অর্থ এই নয় যে, সংস্কারক তাঁর কালে দ্বীনের সংস্কার করে দ্বীনকে নবরূপে সজীব করে দেবেন। অতঃপর তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীন পুনরায় সংস্কার-পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে। বরং অর্থ এই যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংস্কারকের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে এবং দ্বীন বিশুদ্ধ রূপে টিকে থাকবে। আবার এক সময় সংস্কারকের প্রয়োজন পড়বে।

من يجدد لهذه الامة امر دينها

-এর অর্থ এই নয় যে, সংস্কারক আসবেন আর ঐক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ দ্বীনের চর্চা হবে অতঃপর তিনি চলে যাবেন। বরং অর্থ তা-ই যা একটু পূর্বে বললাম। সংস্কারকগণের যে কোন একজন সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন। জানতে পারবেন যে, তাঁদের কারও কারও সংস্কারের প্রভাব শত বৎসর পর্যন্ত, কারও কারও সংস্কারের প্রভাব কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত ছিল।

রেললাইন ঠিক আছে কিনা তা পরখ করার জন্য রেললাইনের উপর দিয়ে একটি ছোট্ট গাড়ি চলাচল করে। গাড়িটিকে বলা হয় ট্রলি। (কোন কোন ট্রলি হয়

ইঞ্জিন চালিত, কোন কোনটি হয় ইঞ্জিনবিহীন ঠেলা ট্রলি।) এই ট্রলিকে দুইজন পিছন থেকে ঠেলতে থাকে, যখন তাতে গতি সৃষ্টি হয় তখন লোক দুইজন এর উপরে উঠে বসে। অতঃপর চলতে চলতে ট্রলির গতি যখন নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয় লোক দুইজন আবার নামে এবং ট্রলিকে আবার ঠেলতে থাকে। গতি সৃষ্টি হলে আবার তারা তাতে উঠে বসে। এই উষ্মতের অবস্থাও তদ্রূপ মনে করুন। এই উষ্মত ঐ ঠেলা ট্রলি সদৃশ। উলামা-মাশায়েখ এবং মুজাদ্দের ও সংস্কারক এই ঠেলা ট্রলিকে ঠেলে তাতে গতি সৃষ্টি করে দেন, ফলে তা নিজ চাকার উপর চলতে থাকে। তাঁরা সব সময়ই চালাতে থাকেন আর ঠেলতে থাকেন, তা নয়। গাড়ী নিজেই চলবে তার নিজের চাকার উপর ভর করে, কিন্তু তাতে গতি সৃষ্টি করার জন্য গতি সঞ্চারকারী, জীবনের অধিকারী, প্রাণচঞ্চল শক্তি-সামর্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন। কেননা ট্রলির জন্য দুটো জিনিসের প্রয়োজন।

এক. ট্রলির দেহ কাঠামো এরূপ হালকা-পাতলা হওয়া এবং তার চাকায় এরূপ চলন ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা, যাতে দ্রুতগতিতে তা চলতে পারে।

দুই. যারা ঠেলবে তাদের শরীর ও হাতে এরূপ শক্তি থাকা, যাতে তারা ট্রলিকে ঠেলে তাতে গতিসঞ্চার করতে পারে।

এই উষ্মতের চিরন্তন রীতি এটাই যে, যখন এই উষ্মত নিষ্ক্রিয় কি দুষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখন আল্লাহর কোন বান্দা আগমন করেন এবং এই উষ্মতকে ধাক্কা দিতে থাকেন, ঠেলতে থাকেন। অতঃপর উষ্মতের গাড়ী নিজেই চলতে থাকে এবং বেশ কিছুদূর পর্যন্ত তার গতি অব্যাহত থাকে।

আমি মুজাদ্দের আলফেসানী (রহ.) ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) উভয়কে এই কালের মুজাদ্দের মনে করি। আমি মনে করি, এই যে বিভিন্ন স্থানে দ্বীনী ইলম বিদ্যমান, সুলতানের দাওয়াত বিদ্যমান, বিভিন্ন স্থানে যে শিরক ও বিদআত হতে পবিত্র থাকার আবেগ ও প্রচেষ্টা বিদ্যমান, শিরক ও বিদআতের প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান তা এতদুভয়েরই সংগ্রাম ও সাধনার ফসল। দেখুন, একজন ব্যক্তি এই উষ্মতের গাড়িকে এত জোরে ধাক্কা দিয়েছে যে, সাড়ে তিনশত বৎসর পর্যন্ত তা অবিরাম চলেছে। আল্লাহই ভাল জানেন আর কত দিন চলবে, এরপর আর কে জন্ম নেবেন এবং ধাক্কা দেবেন এবং আবার গাড়ি কতদূর চলবে? হযরত মুজাদ্দের আলফেসানী (রহ.)-এর একশ' দেড়শ বৎসর পরে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর পুরো বংশধর জন্ম নেয় এবং তাঁদের সংগ্রাম, সাধনা ও কর্ম-তৎপরতার প্রভাব প্রকাশ পায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, মাদরাসা ও আলেম উলামাগণের দায়িত্ব হল এরূপ জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

গতকাল আমি দারুল উলূম কৌরঙ্গীতে একটি কথা বলেছিলাম। তা হল, পাকিস্তানের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হল এমন কিছু আলেম তৈরি হওয়া যাঁরা আধুনিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলা ও সমস্যাগুলো যথাযথ অনুধাবন করতে পারেন এবং সেগুলো সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তাঁরা কিতাব ও সুন্নাহ, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের সাহায্যে, শরীয়তের আলোকে সেইসব বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দান করবেন। অন্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাধিক প্রয়োজন যে জিনিসের তা হল, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.), মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) এবং মাওলানা ইউসুফ বিনৌরী (রহ.)-এর ন্যায় পণ্ডিত ও গবেষক আলেম সৃষ্টি হওয়া।

আমি এরপর সেখানে একথাও বলেছিলাম যে, যুগ এত অগ্রগতি লাভ করেছে, আধুনিক ফেতনা এত মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে এবং আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ এত কঠিন আকার ধারণ করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে এই যুগে প্রয়োজন ছিল ইমাম গায়যালী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিसे দেহলভীর। যদি হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায়যালী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ জন্ম না নেয়, তবে কমপক্ষে ঐ স্তরের আলেম ও ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হওয়া অতীব জরুরী, যাদের নাম এর পূর্বে আমি উল্কারণ করেছি।

অতএব মাদরাসাগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হল- এইরূপ চূড়ান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ, যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃষ্টি হয় জ্ঞান-বৈদগ্ধ, দৃষ্টির গভীরতা ও বিস্তৃতি, বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণতা, কিতাব ও সুন্নাহর প্রকৃতি ও মেজাজ সম্পর্কে জ্ঞান, শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিতি। যাতে তারা পরিবর্তিত এই যুগে উন্নততক দিক-নির্দেশনা দান করতে পারে। শুধু কিতাব পড়া ও বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া যথেষ্ট নয়। কেননা কিতাবগুলো তো স্ব-স্ব যুগে লিখিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা একমাত্র তাঁর কিতাবকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে,

لا تبلى جدته ولا تنتهى عجائبه

তা কখনও পুরানো হয় না। এছাড়া মানব রচিত প্রতিটি কিতাব ও গ্রন্থেই সমকালীন যুগের ছাপ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, সমকালীন যুগের নিবিড় ছায়া তাতে স্পষ্ট থাকে। আপনি যে কোন আলেমের লিখিত গ্রন্থ উঠিয়ে দেখুন, আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে রুচি ও জ্ঞানগত বিচক্ষণতা দান করে থাকেন তবে আপনি

কিতাব দেখেই তা কোন যুগে লিখিত তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন। উদাহরণত আপনি বুঝতে পারবেন যে, কিতাবটি তাতারী ফেতনার পরে লিখিত হয়েছে, এই কিতাবটি অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত। কারণ প্রত্যেক শতাব্দীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী রচনাশৈলী ভিন্ন রূপ হয়, চিন্তা ও মননের পার্থক্য হয়। এই মাদরাসাগুলো অত্যন্ত বরকতময়, অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমরা সকলেই মাদরাসার নেয়ামতের দস্তরখান হতেই আহার সংগ্রহকারী। এই যে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি এটা মাদরাসারই অবদান। আমার শিক্ষা জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি এই মাদরাসাতেই হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে, এই দ্বীন জীবন্ত দ্বীন, এই দ্বীনের জন্য প্রয়োজন জীবনের অধিকারী ব্যক্তিত্বের। জীবন্ত ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম ও সাধনা তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টাতেই এই দ্বীন বহাল থাকবে। আসলাফ ও পূর্বসূরীদের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটুক তা আমার ইচ্ছা নয়। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, একথা বোঝানো যে, শুধু এতটুকু নিয়ে বসে থাকলে চলবে না যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ এরূপ ছিলেন, তাঁরা এই-এই করেছেন। পূর্বসূরীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বসে থাকলে শুধু আত্মপ্রসাদই লাভ হবে, ফল কিছুই হবে না। কেউ একটি মাসআলার সমাধান চাইতে আসল, আর তাকে বলা হল যে, আমাদের এখানে বড় বড় আলেম জন্ম নিয়েছে, ইলমের আকাশ, ইলমের পাহাড় জন্ম নিয়েছে। মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী বলছে যে, কুপের মধ্যে অমুক প্রাণী পতিত হয়েছে, এলাকাবাসী চিন্তিত ও পেরেশান যে, কত বালতি পানি এই কূপ থেকে বের করে ফেললে পানি পবিত্র হবে আর আপনি বলছেন যে, এখানে ইমাম আবু হানীফা জন্ম নিয়েছেন, ইমাম যুফার জন্ম নিয়েছেন, বাদায়েউস সানায়ে'র লেখক জন্ম নিয়েছেন, আল-বাহরর রায়েকে'র লেখক, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর লেখক জন্ম নিয়েছেন। প্রশ্নকারী বলবে যে, সবই তো ঠিক, কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি বলুন, কিভাবে এই কূপ পবিত্র হবে, নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। কেউ আপনার নিকট কোন গ্রন্থের কি কবিতার কোন অংশ বুঝতে আসল। বলল, এই অংশটুকু বুঝতে পারছি না, কিংবা এই কবিতাটি বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে দেবেন কী? আপনি তাকে বললেন, এখানে এত বড় বড় সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছেন, যাদের কোন জুড়ি নেই। আবদুল কাদের জুরজানী জন্ম নিয়েছেন, আবু আলী ফারেসী জন্ম নিয়েছেন, ইমাম যামাখশারী জন্ম নিয়েছেন, হারীরী জন্ম নিয়েছেন, কাজী ফায়েল জন্ম নিয়েছেন। প্রশ্নকারী বলবে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো এই কবিতাটি বুঝতে চাই, ছাত্ররা অপেক্ষায় আছে, তাদেরকে কবিতাটি বুঝাতে হবে সুতরাং

আপনি কবিতাটি বুঝিয়ে দিন। কত বড় সাহিত্যিক কোথায় জন্ম নিয়েছেন তা জেনে তো আমার লাভ নেই। সর্বক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। কোন ক্ষেত্রে কোন পূর্বসূরীর কি যোগ্যতা ছিল, তাঁরা কত বড় পণ্ডিত ছিলেন এইসব বলে লাভ নেই।

প্রতিটি শহরেই অভিজ্ঞ আলেম থাকা প্রয়োজন

প্রতিটি দেশে বরং প্রতিটি শহরেই অভিজ্ঞ আলেম থাকা উচিত, যিনি যথাসময়ে দ্বীনী ব্যাপারে মানুষকে সহায়তা করতে পারেন, দিক-নির্দেশনা দান করতে পারেন। কমপক্ষে সঠিক পথের অনুসারী কোন আলেমের নিকট প্রেরণ করতে পারেন। আমি নিজেও এই কাজ করি। কেউ গুরুত্বপূর্ণ কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলে আমি বলে দেই যে, আমাদের মাদরাসায় মুফতী সাহেব আছেন তাঁর নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। কারণ—

لكل فن رجال

‘প্রত্যেক শাস্ত্রের জন্য আলাদা আলাদা ব্যক্তি থাকে।’

আল্লামা ইবনে হাযম সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন যে, তিনি সাফা ও মারওয়ার সায়ী করণকালে রমল ও ইজতিবা করতে হবে বলে লিখেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া অত্যন্ত আদবের সাথে লিখেছেন যে, আসলে আল্লামা ইবনে হাযম যেহেতু হজ্জ পালন করেননি তাই তাওয়াফ ও সায়ীর মাঝে তাঁর বিভ্রম ঘটে গেছে। যাক এটা তো ভিন্ন বিষয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি যদি পূর্বসূরী আকাবিরগণের তালিকা প্রদান করতে থাকেন আর বলেন যে, আমাদের পূর্বসূরী আকাবিরদের মাঝে এইরূপ আর ঐরূপ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছেন তবে তার উদাহরণ হবে এইরূপ যে, কোন পিপাসার্ত ব্যক্তি আপনার নিকট পানি প্রার্থনা করল আর আপনি তাকে বলতে থাকলেন, পৃথিবীতে এইরূপ উচ্চমানের আইসক্রিম প্রস্তুত হয়েছে, এইরূপ সুপেয় মজাদার পানীয় আবিষ্কৃত হয়েছে ইত্যাদি। ভাই, এসব পানীয়ের নাম উল্লেখ এবং সেগুলোর গুণমান বর্ণনা করে কী লাভ হবে? তার তো প্রয়োজন পানির। আপনি যখন তাকে পানি দিবেন তখনই তার পিপাসা নিবারিত হবে নতুবা নয়। তা সেই পানি আপনি কাঁচের গ্লাসেই দেন অথবা মাটির কোন পাত্রেই দেন।

শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যার এবং কোন জাতির অবক্ষয় এভাবেই ঘটেছে যে, যখন উপযুক্ত কোন ব্যক্তি বিদায় গ্রহণ করেছে তখন তার শূন্যস্থান পূরণের জন্য কেউ

সৃষ্টি হয়নি। বর্তমানে এই আশঙ্কাই সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যিনি বিদায় গ্রহণ করছেন তাঁর শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে না। আপনাদের নিকট কী বলব। বলতেও বুক ফেটে যায়। হিন্দুস্তানে মারাত্মক শূন্যতা অনুভূত হচ্ছে। কোন মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের প্রয়োজন কিন্তু শায়খুল হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও উসূলে ফিকহ পড়ানোর জন্য যোগ্য উস্তাদের প্রয়োজন কিন্তু তা পাওয়া যাচ্ছে না। কোন আল্লাহর বান্দা হয়তো আল্লাহর নিকট চলে গেছেন, কেউ হয়তো অন্য মাদরাসায় চলে গেছেন। আমাদের জন্য ফলাফল একই। যিনি চলে গেছেন তাঁর শূন্যস্থান পূরণের কেউ নেই। আমার বক্তব্যের সারকথা হল, শূন্যস্থান পূরণ হওয়া উচিত। আর এর জন্য প্রয়োজন কিছু নিবেদিতপ্রাণ উৎসাহী ব্যক্তির। যদি আপনারা চান, হাদীস শাস্ত্রে কিছু অভিজ্ঞ আলেম তৈরি হোক, ফিকহ শাস্ত্রে কিছু অভিজ্ঞ আলেম তৈরি হোক তাহলে রক্ত পানি করার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, মাদরাসাসমূহে বর্তমানে এই বিষয়টিরই নিদারুণ অভাব। মাদরাসাগুলোতে সবকিছুই আছে কিন্তু সেই মেহনত, সেই অক্লান্ত পরিশ্রম আর নাই। ইউরোপ যে পার্থিব উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে তার পিছনে এই মেহনত ও পরিশ্রমেরই ভূমিকা রয়েছে। তারা তাদের পথে চূড়ান্ত মেহনতে লিপ্ত। আমি বহু ঘটনা শুনেছি যে, তাদের কোন কোন গবেষণাকর্মে গবেষকরা এমনভাবে তাদের গবেষণায় লিপ্ত ছিল যে, রাত দূরীভূত হয়ে কখন ভোর হয়েছে, আবার কখন দিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, তাদের খবরও ছিল না।

আমার পরিচিত একজন জার্মানী গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন কাজ শুরু কর, তোমার এই প্রতিষ্ঠান কখন খোলে? সে বলল, আমি এখনই বলছি। অতঃপর সে ভিতরে গেল এবং একজনকে জিজ্ঞেস করল, আমার বিভাগটা কখন খোলে? লোকটি বলল, এতটার সময়ে। সে এসে আমার পরিচিত লোকটাকে তখন জানাল যে, এতটার সময়ে খোলে। আমার পরিচিত লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার প্রতিষ্ঠান ও শাখা কখন খোলে তা আপনি নিজে না বলে অন্যকে জিজ্ঞেস করে বললেন কেন? সে উত্তরে বলল, কারণ, খোলার সঠিক সময়টা আমার জানা নাই। এত ভোরে আমি চলে আসি যে, আমার কোন হুঁশ থাকে না এবং ঘড়িও দেখি না। কাজের প্রতি তার একনিষ্ঠতা এরূপই।

আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এটা মনোযোগ বিনষ্টতা ও চিন্তাচঞ্চল্যের যুগ। এটা এক মহাবিপদ যে, আপনি মাদরাসা কম্পাউন্ড থেকে বের হলেই মনোযোগ বিনষ্টকারী চিন্তাচঞ্চলতা ও চিন্তাবিক্ষেপ সৃষ্টিকারী পঞ্চাশের অধিক বিষয় আপনার দৃষ্টিগোচর হবে।

আপনি এরূপ পরিস্থিতি ও পরিবেশ দেখবেন, যা অস্থিরতা ও চিন্তাবিক্ষেপ সৃষ্টিকারী। এরূপ চিত্র আপনি দেখবেন যা সকল দ্বীনী মনোযোগকে বিনষ্ট করে দেবে। আর টেলিভিশনে আপনার চোখ পড়লে তো আপনাকে বলতে হবে—ইন্নালিল্লাহ! এগুলো কী হচ্ছে? পূর্ববর্তী যুগে চিন্তাবিক্ষেপ সৃষ্টিকারী ও মনোযোগ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। ইলম ও জ্ঞান চর্চায় আলেমগণের মনোযোগ থাকত নিবিড়। আমার একজন উস্তাদ ছিলেন মরক্কোর অধিবাসী। তিনি বর্ণনা করেছেন, মরক্কোর জনৈক আলেম ফিকহে মালেকী সংক্রান্ত একটি কিতাব লিখছিলেন। তাঁর প্রাত্যহিক কার্য তালিকা ছিল এইরূপ—তিনি দুপুরের খাবার খেতে বাড়িতে যেতেন এবং খাবার শেষে নিজের কার্যস্থলে চলে আসতেন। একদিন তিনি বাড়িতে গেলেন না। বাড়ির লোকজন জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার! আপনি আজ খাবার খেতে বাড়িতে আসলেন না যে? তিনি বললেন, আমি তো বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং খাবারও খেয়ে এসেছি। লোকজন চিন্তায় পড়ে গেল এবং খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পারল যে, একটি মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে তিনি বের হয়েছেন এবং মহল্লার একটি বাড়ির দরওয়াজা খোলা পেয়ে তাতে ঢুকে পড়েছেন। ঐ বাড়ির লোকজন যেহেতু তাঁর নিয়মিত কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল এবং তাঁরা সজ্ঞাত ও তাঁর প্রতি মমতাসীল ছিল তাই তারা দস্তুরখান বিছিয়ে তাঁর হাত ধোয়াল এবং খাবার পরিবেশন করল। তিনি আহার করলেন এবং মনে করলেন যে, নিজের বাড়িতেই আহার করলেন।

অপর একটি ঘটনা ইমাম গায়যালী (রহ.) যতদূর মনে পড়ে এহইয়াউ উলুমুদ্দীন গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একদা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বাড়িতে আসলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সন্তানরা বলেন, ‘আমরা আমাদের পিতাজীকে সর্বদা দেখতাম ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জন্য প্রতি নামাযের পর এই বলে দুআ করতে— ‘আয় আল্লাহ! মুহাম্মাদ বিন ইদরীসকে জীবিত রাখ, তাঁকে সুস্থ রাখ, তাঁর বয়সে বরকত দান কর।’ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সন্তানরা ভাবত— ‘আমাদের পিতা সমকালীন যুগের ইমাম। তাঁর উস্তাদ নিশ্চয়ই তাঁর চেয়ে বড় মাপের হবেন। এইজন্যই তিনি তাঁর জন্য সর্বদা দুআ করে থাকেন। একবার তারা পিতাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আব্বাজান! আপনি কার জন্য দুআ করেন এবং কেন করেন? তিনি বললেন,

يا بنى انه كالشمس للدنيا والعافية للبدن

‘হে বৎস! তিনি (ইমাম শাফেয়ী) পৃথিবীর জন্য সূর্য স্বরূপ এবং শরীরের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ।’

একবার একটি চমৎকার ঘটনা ঘটল। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বাড়িতে আগমন করলেন। বাড়ির লোকজন আনন্দে আত্মহারা। তাদের ধারণায় ঘরে বসেই তারা মহামূল্যবান সম্পদ পেয়ে গেছে। তারা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)কে খুব আদর-যত্ন করল। রাতের আহার শেষে যখন তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। বাড়ির বালকেরা মনে করল, যেহেতু আব্বাজানই রাতের সিংহভাগ ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন তাহলে তাঁর উস্তাদ এই শায়খ নিশ্চয় রাতে একটুও চোখ বন্ধ করবেন না, সারা রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকবেন। তারা অযুর পানির সুব্যবস্থা করে রাখল, যাতে তিনি রাতে উঠে সহজে অযু করে রাতে ইবাদত করতে পারেন। কিন্তু তিনি রাতভর বিছানাতেই শুয়ে কাটালেন। এমনকি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এসে তাঁকে বিছানা থেকে উঠালেন। তিনি উঠে অযু না করেই নামায পড়তে চলে গেলেন। এখন তো বাড়ির বালকদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। তারা ভাবতে লাগল, ইয়া আল্লাহ! ঘটনা কী? পানির পাত্রে পানি সেই রকমই আছে, তিনি অযু ব্যতীতই নামায পড়তে চলে গেলেন? সেই যুগে বড়দের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের রেওয়াজ ছিল না। যখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মজলিসে এসে বসলেন, তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে লক্ষ্য করে বললেন, আবু আবদুল্লাহ! (আহমদ ইবনে হাম্বলের উপনাম) গত রাতে বিশ্বয়কর এক ঘটনা ঘটে গেছে। যখন তুমি আমাকে শুইয়ে দিয়ে চলে গেলে তখন আমার মস্তিষ্ক অমুক হাদীসের দিকে ধাবিত হল। আমি সেই হাদীস থেকে মাসআলা বের (ইসতিমবাত) করতে শুরু করলাম। তিনি সংখ্যা বলে বললেন, এতগুলো মাসআলা হাদীসটি থেকে বের করেছি এবং তা করতে করতেই ভোর হয়ে গেছে। এজন্যই কবি বলেন—

کارپا کاں راقیاس از خودمکیر

گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر

নেককারদেরকে নিজের অনুরূপ ধারণা করো না। যদিও شیر و شیر শব্দ দুটি লেখায় একই রকম।

অর্থাৎ শব্দ দুটি লেখায় একই রকম হলেও উচ্চারণ ও অর্থে রয়েছে ভিন্নতা। কেননা شیر (শের) অর্থ বাঘ আর شیر (শীর) অর্থ দুধ।

ঐ যুগ যদি কু-ধারণার যুগ হত তাহলে পত্রিকায় ছাপা হয়ে যেত যে, কিছু কিছু আলেম আছে যারা বিনা অযুতে নামায আদায় করে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হয়তো নামাযের ইমামতিও করে থাকবেন। কারণ তাঁর উপস্থিতিতে আর কে ইমামতির সাহস করবে?

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

দ্বীনের সঙ্গে ইলমের চিরস্থায়ী সম্পর্ক

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

ভাষণটিতে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ ও আসহাবগণের উদ্দেশ্যে সালাত ও সালাম পাঠ করেন, অতঃপর সূরা তাওবার একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। আয়াতটির অনুবাদ নিম্নরূপ—

মুমিনদের সকলের এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু লোক বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন স্বপক্ষে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবা ১২২)

ইসলামের সঙ্গে ইলম ও জ্ঞানের সম্পর্ক

আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধু সকল!

ইসলামের সাথে ইলমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। ইলম ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। বাস্তবতা হল, ইলমও ইসলাম ব্যতীত টিকতে পারে না, তবে এর বিশদ ব্যাখ্যা অন্য কোন মজলিসে হতে পারে। এখানে যা বলতে চাচ্ছি তা হল, ঐ ইলম বা জ্ঞান ইলমই নয়, যা ওহীর তত্ত্বাবধান, ওহীর দিক-নির্দেশনা হতে বিচ্ছিন্ন, যা ওহী ও ইলমে নবুওয়াতের হাত ধরে পরিচালিত হয় না এবং যে ইলম ও জ্ঞানের উপর ওহীর সত্যায়ন-সীলমোহর নাই। যে জ্ঞান ও ইলম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত ও নাযিলকৃত কিতাবের জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান তাঁর কিতাবের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে নেই সেই জ্ঞান জ্ঞানই নয়, সেই ইলম ইলমই নয়।

ع علمه که ره بحق نه نمايد جهالت است

যে ইলম আল্লাহর পথ দেখায় না তা অজ্ঞতা, ইলম নয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম ইলম ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। মাছকে যেরূপ পানির ভিতর থেকে উঠিয়ে আনলে মাছের প্রাণ অবশিষ্ট থাকে না, মাছ মৃত্যুবরণ করে; তদ্রূপ ইসলামও ইলম ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে না। ইসলামের জন্য ইলম জরুরী। আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর জাত ও সত্ত্বার পরিচয় লাভ, তাঁর সিফাত ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ, বান্দার সাথে তাঁর সম্পর্ক কী, তাঁর সঙ্গে বান্দারই বা কীরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত, জীবনের উদ্দেশ্য কী, জীবনের শুরু কোথা থেকে, জীবনের শেষ কোথায়, জীবনের সূচনা হল কী করে, জীবনের পরিণামই বা কী হবে, মানুষের আগমন কোথা থেকে, পুনরায় কোথায় তাকে যেতে হবে— এই সবকিছুর ইলম ও জ্ঞান জরুরী। অতএব ইসলাম ইলম ও জ্ঞান দাবি করে, ইলম ও জ্ঞানকে সে জরুরী সাব্যস্ত করে।

প্রথম ওহীতে ইলম ও কলমের উল্লেখ

ছয় শত বৎসরের অধিক কাল যাবৎ বিচ্ছিন্ন থাকার পর আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হল। সে সম্পর্ক ছিল পৃথিবীর পক্ষ থেকে কিছু গ্রহণের জন্য আর আকাশের পক্ষ থেকে কিছু দানের জন্য। দুই হারানো বন্ধু যখন দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের সৌভাগ্য লাভ করে তখন তাদের মাঝে কত কথাই না হয়, কত অনুযোগ, কত অভিযোগই না উভয়ের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, কত কাহিনী একে অপরকে শোনায়। কিন্তু গারে হেরায় ওহী অবতরণকালে আকাশ ও পৃথিবীর সেই মিলনে আকাশ থেকে ঐ নবীকে, যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল আল্লাহর সঙ্গে পৃথিবীবাসীর সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যে ওহী, যে প্রথম বার্তা দেওয়া হল তা ছিল اقرأ (পাঠ কর)। এ দ্বারাই ইলম ও কলমের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ও বিশালত্ব আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন আশা করি। শেখ সাদী (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছিলেন—

كتب خانه چند ملت پشت

‘তিনি একাধিক জাতির গ্রন্থাগার ধৌত করে পরিষ্কার করে ফেলেছিলেন।’

তিনি ধৌত করে পরিষ্কার করেছেন যত গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠা করেছেন তদপেক্ষা অধিক গ্রন্থাগার। তিনি ধৌত করেছিলেন সেগুলোকেই যেগুলোকে ধৌত করার

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ধৌত করে পৃথিবীবাসীকে তিনি দিলেন কী? দিলেন নূর, দিলেন ইয়াকীন ও বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলার বিশুদ্ধ পরিচয়। মানুষকে বানালেন প্রকৃত মানুষ। বানালেন মূর্ততা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বরং বলা চলে পশু অপেক্ষা অধম মানুষগুলোকে পৃথিবীবাসীর শিক্ষক।

কবি আকবর ইলাহাবাদীর ভাষায়-

جو نہ تھے خود راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

‘নিজেই ছিল না যে সঠিক পথে, অন্যদের জন্য সে হয়ে গেল পথ প্রদর্শক। কী ছিল সেই দৃষ্টি যা মৃতকে পরিণত করেছিল মৃতসঞ্জীবনী সত্ত্বায়।

পৃথিবীর অন্য কোন জাতি ইলম ও জ্ঞানের প্রতি নিরাসক্ত থাকতে পারে, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তাদের নাও থাকতে পারে; তারা বলতে পারে জ্ঞানার্জন না করলে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমাদের উপর ফরয, ওয়াজিব কিছুই নাই। অতএব শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের এবং আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমান যেখানেই বসবাস করুক, মক্কা-মদীনা বা যে কোন পবিত্র স্থানে বসবাস করুন, কিংবা আরব উপদ্বীপের যেখানেই বাস করুক, কিংবা ইউরোপ-আমেরিকা, হিন্দুস্তানে বসবাস করুক, শহরে বাস করুক কিংবা গ্রামে, যেখানেই চার ঘর মুসলমান বাস করুক বরং যেখানে চারজন মুসলমান বাস করুক সেখানেই তাদের জন্য জরুরী - افرأ -র তথা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ। এটা হাসপাতাল, কল-কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষাও জরুরী। আপনাদের দোকান অপেক্ষা জরুরী। কারণ এগুলোর কোনটিকে প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দান করেননি। আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশ দান করেননি যে, তোমরা ব্যবসা কর, উপার্জন কর। বলেননি যে, এগুলো শক্তি-সামর্থ্যের উপাদান, দ্বীনকে বিজয়ী করতে পর্যাপ্ত সম্পদ সঞ্চিত কর, টাকা-পয়সার প্রবাহ বৃদ্ধি কর। যা বলেছেন তা হল افرأ ‘পাঠ কর’। এখন বলুন জ্ঞানের ও ইলমের মর্যাদা কত বিশাল!

এক ধরনের জ্ঞান ও ইলম আছে যাকে ইলমে লাদুনী বলা হয়। আল্লাহ তাআলা কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ব্যক্তিটি তখন পরিণত হয় জ্ঞানের ভাণ্ডারে। তার মুখ থেকে তখন মূল্যবান সব জ্ঞানের কথা বের হতে থাকে। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা তাকে

আমাদের নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেব। তাঁর ছায়া আমাদের কারও উপর পড়লে সে সোনার মানুষে পরিণত হবে। এই সবই অনস্বীকার্য। কিন্তু তারপরও افرأ-এর আবেদন যথাস্থানেই থাকবে। কারণ ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী ব্যক্তিদেরও প্রয়োজন হবে আলেমের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করার। افرأ-এর আবেদন নবীয়ে উম্মী থেকে শুরু করে এই উম্মতের শেষ উম্মী পর্যন্তই একইভাবে অব্যাহত থাকবে। পৃথিবীতে যতই বিপ্লব ঘটে যাক, রাজা-বাদশাহ ও কর্তৃত্ব বদল হোক, যতই সভ্যতার পরিবর্তন হোক, সভ্যতার যতই বিকাশ ঘটুক, ভাষার পরিবর্তন ঘটুক, মহাবিপ্লবই ঘটে যাক না কেন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ধারা অব্যাহত থাকবে, থাকতে হবে।

কুরআন সংরক্ষিত হওয়ার অর্থ

আল্লাহ তাআলা কোন গ্রন্থ ও ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। কিন্তু কুরআনে কারীম সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। তবে সংরক্ষিত থাকার অর্থ এই নয় যে, ব্যস কুরআনে কারীম থাকবে কিন্তু তাকে কেউ বুঝবে না, অপরকে বুঝবে না। সংরক্ষিত থাকার জন্য কুরআন বুঝার লোক থাকতে হবে, অপরকে বুঝানোর লোক থাকতে হবে এবং কুরআন যেহেতু একটি ভাষায় নাযিল হয়েছে সুতরাং সে ভাষাও সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। অতএব কুরআন সংরক্ষিত থাকার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের ভাষা আরবীও সংরক্ষিত থাকবে। পৃথিবীর বহু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শরীয়তে ইলাহীর আরবী ভাষা আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। সুতরাং প্রতিটি দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য ফরয যথাসাধ্য দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ। মাসআলা বলার মত উপযুক্ত একজন আলেম বিদ্যমান থাকাই শুধু যথেষ্ট নয়; বরং ঐরূপ আলেম তৈরি করার ধারা অব্যাহত থাকা জরুরী এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণও মুসলমানদের জন্য ফরয। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকা জরুরী। এটা কোন বিলাসিতা বা বিনোদন নয়; বরং খাঁটি দ্বীনী প্রয়োজন। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বলছি যে, মসজিদের পরে দ্বিতীয় নম্বর জরুরী বিষয় এটাই।

সত্য কথা বলতে কি, মসজিদের পৃষ্ঠপোষক এই মাদরাসাগুলোই। মাদরাসা না থাকলে ইমাম কোথায় পাবেন? দ্বীনী কথা, মাসআলা-মাসায়েল কে শোনাবে? পাঁচ ওয়াক্ত নামায কোন রকম পড়িয়ে দেওয়ার মত কোন ইমাম হয়তো পাওয়া গেল, কিন্তু জুমুআর কী হবে? তারপরে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে কার নিকট

যাবেন? সুতরাং এই মাদরাসাগুলো প্রকৃতপক্ষে মসজিদের জন্য রক্ষাকবচ, মসজিদের পুষ্টি সরবরাহকারী।

মাদরাসার শিক্ষা সমাপণকারীদের দায়িত্ব

আমি আলোচনার শুরুতে আয়াত পড়েছিলাম—

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً

‘এটা তো হতে পারে না অর্থাৎ এটা তো প্রায় অসম্ভব ও অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে, সব মুসলমান সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে দ্বীন শিখতে বের হয়ে যাবে। দোকানে কেউ বসবে না, বেচাকেনার লোক থাকবে না, কোন প্রয়োজন পূরণের মত কেউ থাকবে না, মনে হবে যে, শহরের সকল বাসিন্দা মাদরাসার তালিবুল ইলম হয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে— এটা হতে পারে না। আল্লাহ এরূপ নির্দেশ দেন না, বান্দার নিকট এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির দাবিও তিনি করেন না। আল্লাহ তাআলা আয়াতাত্‌শটুকুতে বলছেন— এটা তো সম্ভব নয় যে, মুমিনরা সবাই ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাবে, তবে

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

এরূপ কেন হয় না যে, প্রত্যেক দল থেকে কিছু লোক বের হয়ে যাবে, যাতে তারা দ্বীন শেখে, দ্বীনের বুঝ অর্জন করে, দ্বীনের বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন করে?

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

এবং ঘরে ফিরে নিজ নিজ এলাকায় হেদায়েতের কাজ করে, ওয়াজ-নসীহত এবং মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের কাজ করে? সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদেরকে সমূহ বিভ্রান্তি ও সর্বনাশ থেকে রক্ষা করবে। শিরকের সর্বনাশ থেকে কুফরের সর্বনাশা ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। যে সকল আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ দ্বারা মানুষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়, ইসলামের সীমারেখা অতিক্রম করে যায়, সে আর মুসলমান বলে গণ্য হয় না সেসব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। কেননা কোন কোন আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষের ধ্বংস সাধন হয়, সে মুরতাদ হয়ে যায়।

لِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

আয়াতাংশের দাবি একমাত্র আলেমই পূরণ করতে পারে। যদি কোন স্থানে কোন শহর বা গ্রামে মুসলমানদের বসতি থাকে, বাণিজ্য কেন্দ্রও থাকে, মুসলমান সেখানে আরাম ও সুখময় জীবন যাপন করে অথচ একটি মাদরাসাও না থাকে, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় সাধারণ সাধারণ মাসআলা বলার মত যোগ্য লোকও না থাকে, তবে শহরবাসী ও গ্রামবাসী সকলেই গোনাহগার হবে। ফরযে কেফায়ার অর্থ এটাই। আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, এত বড় শহরে তোমাদের কারও কি সুযোগ হল না একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার? মাদরাসা প্রতিষ্ঠা তাহাজ্জুদ নামাযের মত নয় যে, যেহেতু এটা ফরয নয়, কাজেই কেউ আদায় করলে লোকে মনে করে যে, লোকটা ভাল কাজ করল, আদায় না করলেও এ ব্যাপারে কেউ কাউকে খারাপ চোখে দেখে না। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি এ রকম নয় যে, তা প্রতিষ্ঠা করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা একটি বুনিয়াদী ও মৌলিক কাজ, এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মাদরাসা আপনার ঘাড়ের মোটা শিরার ন্যায়, যা ছিন্ন হলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য। যা হলেই নয় অন্তত এতটুকু দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ স্ব-স্ব অঞ্চলে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। আপনার এলাকায় দ্বীনী শিক্ষাপ্রাপ্ত এরূপ আলেম থাকা জরুরী, যিনি প্রয়োজন হলে দ্বীনী মাসআলা বলতে পারবেন। মুসলমানদের সঙ্কটের মুখে, যখন মুসলমানদের সামনে হালাল-হারাম ও কুফর ও ঈমানের প্রশ্ন আসে তখন যেন তিনি তাঁদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন। বলতে পারেন, এটা হালাল ওটা হারাম, এটা করলে তুমি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে, ওটা করলে তুমি খাঁটি মুমিন ও মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে।

জনসাধারণের দায়িত্ব

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অর্থ এই নয় যে, আমরা মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করে দিলাম, আমাদের এক দায়িত্ব আমরা পালন করে ফেললাম আর আপনাদের কোন দায়িত্ব নেই। আমরা তো আপনাদের পক্ষ থেকে ভিত্তি স্থাপন করব, যেন আপনাদের হাতেই তা হবে। যেহেতু আপনারা সকলেই হাত লাগাতে পারবেন না সেহেতু আপনাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করব। এই সূচনার পর আপনাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় মাদরাসার উন্নয়নের। এরপর অবশিষ্ট থাকে

শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়, সিলেবাস ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণের বিষয়, পরামর্শের বিষয়। এসবের জন্য আমরা আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিতে সদা প্রস্তুত। আপনাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেননা, আলেমগণ আপনাদের পক্ষ থেকে আপনাদের দায়িত্ব অনেকটাই আদায় করে দিচ্ছেন এবং দ্বীনী ও জাতীয় অবহেলার বিপদ থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে রক্ষা করছেন। এই মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত না হলে আল্লাহ তাআলার নিকট অবশ্যই আপনাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে।

স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ

একথাও মনে রাখা উচিত— যে সকল সন্তান স্কুলে লেখাপড়া করছে তাদের জন্যও দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ আপনাদের উপর ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের ঘরের সদস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।’ (সূরা তাহরীম ৬)

সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের জন্য দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ আপনাদের উপর ফরয। ভাল কোন মৌলভী সাহেবকে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। মোটকথা স্কুল পড়ুয়া সন্তানদের দ্বীন ও ঈমান হেফাযতের জন্য কোন ব্যবস্থা আপনাদের করা উচিত। এমনিতে তো আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। উদাহরণত আমরা এই গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ। এখানে নানা রকম আন্দোলন ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে, ফলে অবস্থা ও পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। নানা রকম সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে আসছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা যেন আমাদের জীবন ও মান রক্ষা করতে পারি, আমাদের দ্বীন রক্ষা করে চলতে পারি সেজন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। সে সব বিষয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি এখন ঐ দিকে যাচ্ছি না। আমি বলতে চাচ্ছি নির্ভেজাল দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে। আপনাদের জন্য আবশ্যিক ও ফরয মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং তার সার্বিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা এবং মাদরাসাকে এরূপ শীর্ষ সোপানে উন্নীত করা, যাতে মাদরাসাটি এক বিশাল এলাকা ও অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় মাদরাসায় পরিণত হয়। সেই সঙ্গে নিজের সন্তানদেরকে মাতৃভাষার শিক্ষাদান, দ্বীনী শিক্ষা প্রদান, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত মুবারক, সাহাবায়ে কেরামের জীবন চরিত এবং আল্লাহ ওয়ালাদের জীবন চরিত সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল করানো এবং তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য, ঈমান ও কুফরের পার্থক্য সম্পর্কে তাদেরকে জ্ঞানদান করা অত্যন্ত জরুরী।

আর যারা বয়স্ক তাদের নিজেদের দ্বীনী অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে, দ্বীনী প্রেরণা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখা জরুরী। তাবলীগ জামাতের ইজতেমাগুলোতে শরীক হওয়া, মাঝে মাঝে সময় দেওয়া এবং দ্বীনী কিতাবাদি পাঠ করা নেহায়েত জরুরী। নতুবা যে দেশে (ভারত) আমরা বসবাস করি এবং যে মহা সংকটের যুগে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন আমাদের ঈমান ও দ্বীন রক্ষা করা এবং আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হয়ে পড়বে। এই দেশে এবং এই যুগে সর্বদা সতর্কতার সাথে পথচলা আবশ্যিক। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং চতুর্দিকে সতর্ক ও গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার প্রয়োজন খুব বেশি। জীবনের ধারা থেকে পৃথক থাকার পরিণাম বড় ভয়াবহ। মুসলমান যদি নিজ পরিবেশ ও নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ খোলসে বন্দী হয়ে থাকে এবং খেয়াল-খুশি অনুযায়ী বিলাসী ও সুখী জীবন যাপনে ব্যস্ত থাকে আর মনে করতে থাকে যে, যা কিছু হয় হোক; আমরা তো নামায-রোযা আদায় করছি, তাহলে এই দেশে মুসলমানদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। সদা সতর্ক থাকুন। নিঃস্বার্থ ও শুভাকাজক্ষী পথ প্রদর্শক আলেমগণের কথা মনে চলুন। তাঁরা শুধু তাঁদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বিবেচনা করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে থাকেন এবং তাঁরা শুধু এই চিন্তাতেই বিভোর থাকেন যে, তাঁদের প্রতি ন্যস্ত সমাজের আমানত কীভাবে তাঁরা আদায় করবেন। দুনিয়ার কোন মোহ তাঁদেরকে স্পর্শ করেনা। অতএব তাঁদের পরামর্শ গভীর মনোযোগের সাথে শুনুন এবং মানতে থাকুন।

এই দেশে সদা-সর্বদা নিজের চোখ খোলা রাখুন এবং দেখতে থাকুন কী হয়, কোন পরিস্থিতি এরূপ সৃষ্টি হয় কি-না যার কারণে আমরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মুসলমান হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। বিষয়টিকে গভীর পর্যবেক্ষণে রাখুন। এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনের মূল্য বোঝার তাওফীক দিন। আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ঈমানের দাওয়াত ও মানবতার পয়গাম

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

প্রিয় বন্ধু ও ভ্রাতৃবন্দ!

আজ আমি আপনাদের সামনে দুটি বিষয় আরজ করব। প্রথম কথা- আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক বস্তুতে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হাজার হাজার বছর নয় বরং লাখ লাখ বছর যাবৎ বিরাজ করছে অপরিবর্তিত রূপে। যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, বড় বড় রাজা-বাদশাহদের রাজত্বের প্রদীপ নিভে গেছে। কথিত আছে যে, এক কালে আরব উপসাগরের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এটাও বলা হয় যে, কোন এক কালে শাম ও ভারতবর্ষের সীমানা এক ছিল। মিসরীয় সভ্যতার সঙ্গে যে ভারতীয় সভ্যতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও স্বভাব-প্রকৃতির যে সাযুজ্য উভয় দেশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তা থেকে অনুমিত হয় যে, কোন এককালে মিসর ও ভারত এক সূত্রে গাঁথা ছিল, উভয় দেশ মূলত ছিল একই সিংহাসনের অধীন। পরবর্তীতে এইসব পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বস্তুরাজিতে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন তা আজ অবধি অপরিবর্তিত রয়েছে। পানি এখনও আগুন নির্বাপিত করে। আগুনের দাহিকা শক্তি এখনও বিদ্যমান। এখনও তা একই রকমভাবে বস্তুসমূহকে ভস্মীভূত করে। বিষ এখনও মানুষের প্রাণ নাশ করে। শীত ও গরমের বৈশিষ্ট্য এখনও পূর্বের ন্যায়ই বিদ্যমান। লাখ লাখ বছর ধরে মানুষের জন্য আহারের প্রয়োজন হচ্ছে। তরি-তরকারী ও সজী সব সময়ই উৎপাদিত হচ্ছে। মানুষের চতুর্পার্শ্বে যা আছে মানুষের সাথে সে সবার সম্পর্ক বহু প্রাচীন কাল যাবৎ। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা মানুষের কর্মে, চরিত্রে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিহিত রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈমানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন, তাঁর যিকির ও স্মরণে, তাঁর প্রতি অভিমুখিতায় যে বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন তা লাখ

লাখ বৎসর যাবৎ একই রকমভাবে বিদ্যমান। যদি আরও হাজার হাজার বছর পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে তবে ঐসব বৈশিষ্ট্য একই রকমভাবে বিদ্যমান থাকবে।

ইতিহাসে এরূপ কোন সাক্ষ্য মেলে না যে, অতীতে ঐসব চারিত্রিক গুণাবলীর, পুণ্য কর্মের এবং ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যাবলী অন্য রকম কিছু ছিল। ইতিহাস কী বলবে? কোন আসমানী গ্রন্থও একথা বলে না যে, তাওহীদের যে বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব তা কখনও শিরক ও কুফরীর মধ্যে ছিল, সৎ কর্মের যে বৈশিষ্ট্য তা কখনও অসৎ কর্মের মধ্যে ছিল। বলে না যে, সহমর্মিতার যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তা কখনও নিষ্ঠুরতার মধ্যে ছিল, ন্যায়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রয়েছে তা কখনও অন্যায়-জুলুমের মধ্যে ছিল। কোন আসমানী গ্রন্থই এরূপ বলে না। তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল, যাবুর কিংবা সহীফায়ে ইবরাহীম বা কুরআনে কারীম— কোনটাই নয়। বরং সকল গ্রন্থ ও কিতাবই একই কথা বলে যে, ঈমান, তাওহীদ, সৎকর্ম, ইবাদত, ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ, সহমর্মিতা ইত্যাদিতে এই এই গুণ ও উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলী নিহিত রয়েছে।

অতএব দোস্ত ও বুয়ুর্গ! এই কথাটি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া উচিত যে, আমাদের সকলের মুক্তিপ্রাপ্তির, ইজ্জত ও সম্মান লাভের এবং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার নবীগণের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই, নিজের মধ্যে ঐসব গুণের উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

‘নিশ্চয়ই আমার সেনাদলই বিজয়ী দল।’

وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

‘নিশ্চয়ই আমার সেনাদলই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।’

নিজের মধ্যে চিত্তাকর্ষক ঐসব চারিত্রিক গুণ সৃষ্টি করণ যা শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করে দেয়। আমাদের মধ্যে সত্যিকারের সহমর্মিতা গুণের সৃষ্টি হতে হবে। পরসেবার নিখাদ প্রেরণার সৃষ্টি হতে হবে। আমাদের মধ্যে এই দরদ ও বেদনার সৃষ্টি হতে হবে যে, এসব কী হচ্ছে? আমাদের অন্তর হতে আমরা হিংসা বিদূরীত করে দেই, বিদ্বেষকে দূরীভূত করি, স্বার্থপরতাকে নির্মূল করি। আমাদের হৃদয় উদার হোক, আমরা ধন-সম্পদের পূজারী না হই, আমরা সরকারী চাকুরীর পূজারী না হই, আমরা শান-শওকত, ক্ষমতা ও উচ্চ পদের দাস ও পূজারী না

হই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা, সুযোগ বুঝে চলার প্রবণতা আমাদের মাঝে সৃষ্টি না হোক, পয়সার বিনিময়ে নিজকে বিক্রয় করে দেওয়ার মানসিকতা আমাদের মাঝে সৃষ্টি না হোক। আমরা যদি এরূপ চরিত্রের অধিকারী হতে পারি তবে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে, আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হব। আকাশে প্রতিধ্বনিত হবে যে, আমার অমুক বান্দা আমার প্রিয়, আমি তাকে ভালবাসি সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। এতদপেক্ষা বড় কোন অস্ত্র, বড় কোন কৌশল নবীগণ থেকে নিয়ে আউলিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত এবং আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে জনসাধারণ পর্যন্ত না কোন কালে ছিল, না আছে। কোন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, দুনিয়ার কোন দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীই এতদপেক্ষা উত্তম কোন পরামর্শ দিতে পারবে না। আল্লাহর নবীগণের প্রদর্শিত পথে চললে যে ফায়দা তা অন্য কোন পরামর্শকের পরামর্শেই লাভ হতে পারে না।

এই পৃথিবীটা বিশাল। বিশাল এই পৃথিবীতে এত বিশৃঙ্খলা, এত বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়ে আছে আর অসংখ্য বিষয় এত বেশি স্বাভাব্য নিয়ে বিরাজ করছে যে, সবকিছুকে এক সূত্রে গাঁথা আপনার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হবে না। শুধু একটি শহরের একটি মহল্লার বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলিত করা, একটি মহল্লার নানাবিধ ভেদ ও স্বাভাব্যকে এক সূত্রে গাঁথা ও সুসংহত করাও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। উপায় একটাই। সেটা হল আপনার মধ্যে স্বাভাব্য সৃষ্টি করা। আপনি যদি একক সত্ত্বা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁকে যদি নিজের করে নিতে পারেন তাহলে সমগ্র পৃথিবী আপনার হয়ে যাবে। চারিত্রিক পরিবর্তন যদি না ঘটে, বৈশিষ্ট্যগত স্বাভাব্য যদি আপনার মধ্যে সৃষ্টি না হয়, পরিবেশ ও অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে না। আপনি আপনার চারিত্রিক গুণাবলীতে পরিবর্তন আনুন। আপনি অন্যের জন্য, আপনি পরহিতৈষী; এটা প্রমাণ করুন। এই পরহিতৈষণাও আপনার স্বার্থে নয়— এটা প্রমাণ করুন যে, আপনার পরহিতৈষণা শুধুই পরহিতৈষণার জন্যে। প্রমাণ করারও প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণ করতে যাওয়া এক ধরনের কৃত্রিমতা। আপনি পরহিতৈষী হয়ে যান। এটা দেখবেন না যে, মানুষ আপনাকে পরহিতৈষী বলে, না বলে না, তারা আপনাকে পরহিতৈষীরূপে স্বীকার করে কি করে না।

পানি কি কখনও বলেছে, ‘আমি তৃষ্ণা নিবারণকারী?’ পানির কোন প্রতিনিধি, কোন দূত এসে কী বলেছে যে, পানি এ কথা বলে, আমার দ্বারা অনেক কাজ হয়, আমি পিপাসা নিবারক, অতএব আমাকে ব্যবহার করা, আমাকে পান করা উচিত?’ কখনও কি এরূপ শুনেছেন? আগুন কি কখনও বলেছে বা প্রতিনিধি পাঠিয়েছে এ

কথা বলার জন্য যে, সে খাদ্য রান্নার কাজে লাগে? এই সবকিছু বাকশক্তিহীন। তারা কিছু বলতে পারে না, বলে না। কিন্তু এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার বিষয়টি সর্বস্বীকৃত। সমগ্র জগত এগুলোর মুখাপেক্ষী, এগুলোর প্রাপ্তি প্রত্যাশী। সকলের নিকট এগুলো অত্যন্ত প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত। তদ্রূপ মুসলমান যদি কোন দেশে প্রিয় হয়ে থাকতে চায়, তাহলে নিজকে পরিবর্তন করতে হবে, নিজের মধ্যে উন্নত গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। ইতিহাস ও জীবন চরিত-র গ্রন্থসমূহে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ মেলে। আমি বহুবার ঈমান বর্ধক সেসব প্রামাণিক কাহিনী শুনেছি। সেসব কাহিনী থেকে মাত্র দুটো কাহিনী আমি আপনাদেরকে শুনাচ্ছি।

দাঈ'র সামনে কোন বাধাই টিকতে পারে না

সম্মানিত সুধী!

একটি কাহিনী তো সেই দজলা নদীর কাহিনী। মুসলিম সেনাবাহিনী মাদায়েন জয়ের উদ্দেশ্যে যখন দজলা নদীর তীরে এসে পৌঁছল তখন তারা দেখল, মাদায়েনের প্রবেশ পথ দজলা নদীর পুলগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। নদী পার হওয়ার কোন উপায়ই তাদের সামনে নাই। একটি উপায় আছে। সে শুধু সাঁতারে পার হওয়া। কিন্তু আপনারা জানেন, জামিরাতুল আরবের অধিবাসীরা সারা পৃথিবীতে দুর্দান্ত অশ্বারোহী হিসেবে পরিচিত কিন্তু নদী বা সাগরের মুখোমুখি তারা কখনও হয়নি, তারা সাঁতারে ছিল অজ্ঞ। আরব সাগরের উপকূলে যারা বাস করত তারা প্রয়োজনে নৌকা ব্যবহার করত, তাদেরও অধিকাংশ সাঁতার জানত না। সাগর থেকে অনেক দূরের অধিবাসী ঐ মুসলিম বাহিনী সাঁতার জানবে কি করে? অতএব তাদের সামনে তখন প্রশ্ন দাঁড়ায় নদী পার হওয়া যাবে কি করে? মাদায়েন তো নদীর ওপারেই। মাদায়েন জয়ের হাতছানি তাদের সামনে। কিন্তু বাধা এই দজলা নদী। হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) নদী তীরে সেনাবাহিনীকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বলে হযরত সালমান ফারসী (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করলেন, এই মুহূর্তে কী করা যায়? হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) বললেন—

ان هذا الدين لجديد

এই দ্বীন এখনও নবীন। এই দ্বীনের সূচনা হয়েছে মাত্র। মানুষের মুক্তির জন্য এই দ্বীনকে অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে। অতএব এই দ্বীনের অগ্রযাত্রা এখানেই রুদ্ধ হয়ে যাক, তার উদ্ধারতরীর এখানেই সলিল সমাধি ঘটুক এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা মেনে নিতে পারি না যে, আমাদের জীবন থাকতে, শক্তি

থাকতে আল্লাহ তাআলা যে কার্যের জন্য প্রেরণ করেছেন তা অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনি তাঁর গোলাম ও আজ্ঞাবহকে প্রেরণ করেছেন তাঁরই পরিচালিত রাজত্বে। তাঁর গোলাম ও আজ্ঞাবহের পথ রোধ করে দেবে কিংবা তাঁর নির্দেশিত কার্য সমাধা হওয়ার পূর্বেই তাকে কেউ শেষ করে দেবে— এই সাধ্য কার? হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) বললেন, এই দ্বীন এখনও সজীব ও তরতাজা। কতদিন আর হল এই দ্বীনের সূচনার যে, এর প্রতিনিধিত্বকারীরা নিঃশেষ হয়ে যাবে, ডুবে মরবে? হাঁ তবে এতটুকু অনুসন্ধানের প্রয়োজন যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন গোনাহ কর্ম তো ব্যাপক রূপ ধারণ করেনি, সেনাবাহিনীর মাঝে গোনাহকর্মের প্রচলন তো ঘটেনি? হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) এতদশ্রবণে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু উপলব্ধি করতে চাইলেন। কী তীক্ষ্ণ ছিল সেই দৃষ্টি! আর সেনা সদস্যগণ! তাঁরাও ছিলেন আদর্শ এক বাহিনীর সদস্য। তাঁদের অবয়ব ও মুখমণ্ডল থেকে নিষ্পাপতার আলো বিকিরিত হচ্ছিল। হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস তাঁর অন্তর্ভেদী সেই দৃষ্টি দ্বারা তাঁদের নিষ্পাপতা ও অনাবিলতাকে নিমিষেই অনুধাবন করে ফেললেন। বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ করতে কত রকম ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে, তারপরও অপরাধের সন্ধান মিলছে না। তিনি শুধু একটিবার তাকালেন এবং যা বুঝার বুঝে নিলেন। অতঃপর বললেন, ‘বিসমিল্লাহ! চল।’ ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সেনা দলের সদস্যগণ নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলেন। ঘোড়ার পিঠে বসে অত্যন্ত শান্ত চিন্তে, অবিচলিত চিন্তে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁরা নদী পার হতে লাগলেন। একজনের একটি আহ্বারের বাসন নদীতে পড়ে গেলে অপর একজন তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, তোমার বাসনটি পড়ে গেল খেয়াল রাখতে পারলে না? বাসনের মালিক বললেন, যাবে কোথায়, কোথায় যাওয়ার সাধ্য আছে তার? এরপরই একটি ঢেউ বাসনটিকে ভাসিয়ে মালিকের নিকট নিয়ে আসল। তিনি বাসনটিকে উঠিয়ে নিলেন। তাঁদের অবিচলতা ও শান্ত চিন্তা এত বেশি ছিল যে, ইতিহাসে লেখে যে, তারা এমনভাবে কথা বলতে বলতে নদী পার হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল *كانهم يمشون في البر* যেন তারা স্থলে, গুঁড় মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ইরানীরা এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বলতে থাকল—

ديوان آمدند، ديوان آمدند

দৈত্য আসছে; দৈত্য আসছে!

দ্বিতীয় ঘটনা হযরত উকবা ইবনে নাফে (রাযি.)-এর। তিনি যখন কায়রাওয়ানের একটি জায়গায় গেলেন জায়গাটা তাঁর পছন্দ হল। তিনি সেখানেই শিবির স্থাপন করতে চাইলেন এবং সেখানে থেকেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা জয় করবেন বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু সঙ্গীরা বলল, জায়গাটা উপযুক্ত নয়। জায়গাটা বাঘ, ভাল্লুক ও সিংহসহ নানা রকম হিংস্র ও ক্ষতিকর জীবজন্তুর বিচরণস্থল। সুতরাং আপনি এই জায়গা বাদ দিয়ে অন্যত্র শিবির স্থাপন করুন। যুক্তিযুক্ত কথা। অন্যত্র গমনে মুশকিলও কিছু নয়। নিরাপদ জায়গারও অভাব নাই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মানসিক দৃঢ়তা ও চিন্তা-চেতনার ধারাই ছিল অন্য রূপ। তাঁরা পরিস্থিতির সামনে কখনও নতজানু হননি, মাথা নত করেননি। পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূল করে নিয়েছেন। হযরত উকবাহ ইবনে নাফে (রাযি.) বললেন, আল্লাহর পয়গাম বাহক এই আমরা চলে যাব আর এইসব বাঘ-ভাল্লুক এখানে থাকবে? থাকবে তো তারাই যাদের উপস্থিতি ও থাকাটা প্রয়োজন। এটা সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার হবে যে, আমরা বলব- ‘চল এই জায়গা উপযুক্ত নয় অন্য কোথাও যাই। বরং চলে যাওয়া উচিত বাঘ-ভাল্লুক সহ সকল হিংস্র জানোয়ারের। কারণ তারা কোন কাজে এখানে থাকবে? তারা আল্লাহর কোন পয়গাম নিয়ে এসেছে যে, তারা থাকবে আর আমরা চলে যাব? আমরা যাব না, ওদেরই এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। এই কথা বলে তিনি সেনাবাহিনীর একজনকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি যাও এবং ঘোষণা করে বল, হে বাঘ! হে সিংহ! হে নেকড়ে! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও সহচর। আমরা এখানে সেনা ছাউনি তৈরি করতে চাই। আমরা এখানে অবস্থান করে আল্লাহর পয়গামের প্রচার করতে চাই, আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তোমরা যদি তোমাদের জীবন বাঁচাতে ইচ্ছা কর তাহলে এতটুকু সময় তোমাদের দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা চলে যাও। কেউ যেতে না চাইলে তার জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। এটা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। রূপকথা বা কল্পকাহিনী নয়। ইরানী ও হিন্দুস্তানীদের ন্যায় আরবরা ইতিহাসে কল্পকাহিনী বা রূপকাহিনী লিখতে অভ্যস্ত নয়। তারা সত্য ইতিহাস লেখে, তাদের ইতিহাসে বাস্তব ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছু স্থান পায় না। এইজন্যই বিশাল হাদীসের ভাণ্ডার যথাযথ সংরক্ষিত হতে পেরেছে।

যা হোক ঐ ঘোষণার পর লোকেরা বলে যে, তারা স্বচক্ষে দেখল- বাঘ-ভাল্লুককে দৌড়ে পালিয়ে যেতে, বাঘিনীকে দেখল তার বাচ্চাকে বগলদাবা করে ছুটে পালিয়ে যেতে। অনুরূপভাবে সকল প্রাণীকে তারা দেখল, নিজ নিজ

বাচ্চাকে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে। ফলে অল্প সময়ে পুরো এলাকা হিংস্র জানোয়ার থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

এই ছিল তাঁদের রীতি। তাঁরা আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী নিজেকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছেন। অতঃপর তাতে দৃঢ় থেকেছেন। পরিস্থিতি ও পরিবেশের দাস হয়ে যাননি। পরিস্থিতি এইরূপ সুতরাং এইরূপ হয়ে যাও, আবার পরিস্থিতি ও পরিবেশ পাল্টে নতুন রূপ ধারণ করেছে, সুতরাং তুমিও নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নিজেকে পরিবর্তন করে নাও। প্রয়োজনে দল বদল করে অমুক পার্টিতে যোগদান কর। এইরূপ মানসিকতা তাঁদের কখনই ছিল না। তাঁরা দল বদলও করতেন না, দিল (অন্তর) বদলও করতেন না। এক দল, এক দিল –এটাই ছিল তাঁদের চরিত্রের মহান বৈশিষ্ট্য।

হিন্দুস্তানে আমাদের কিভাবে থাকা উচিত?

আমি বলতে চাচ্ছি যে, যদি হিন্দুস্তানে থাকতে হয় তাহলে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে থাকতে হবে। সকলের প্রিয় হয়ে থাকতে হবে। মারামারি, কাটাকাটি করে কত দিন থাকবেন? এই যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা কত দিন চলবে? কত দিন আর এই অভিযোগ ও অনুযোগ যে, আমাদের প্রতি জুলুম করা হচ্ছে? কিছু কিছু শিশু হীনমন্যতায় ভোগে। সব সময় চিৎকার করে বলতে থাকে, আশু, অমুক আমাকে বিরক্ত করছে, অমুক জ্বালাতন করছে। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা মনোগত ব্যাধি বিশেষ। যে শিশু যে বিষয়ে বিরক্ত হয় অন্যরা সেই বিষয় দিয়েই তাকে বিরক্ত করে, জ্বালাতন করে।

তো আপনারা কত দিন আর শিশুর মত চিৎকার করতে থাকবেন যে, আমাদের প্রতিবেশী সমাজ আমাদেরকে জ্বালাতন করে, আমাদের প্রতি জুলুম করে? আমাদের সকলের এখন প্রয়োজন চারিত্রিক পরিবর্তন। দিলের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করুন, আমলে সালেহ ও সৎকর্ম সৃষ্টি করুন। চরিত্র ও আচার-আচরণে মাধুর্য সৃষ্টি করুন। আমাদের সুহৃদ নাসের আল-আব্দী যেমনটা বলেছেন এবং অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন যে, যদি আপনার আখলাক ও চরিত্র, আচার-আচরণ সুন্দর হয়, তাহলে আপনার সবকিছুতেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে, তখন লোকে আপনাকে দেখে বলবে- ‘লোকটার দ্বীন নিশ্চয়ই উত্তম দ্বীন।

তিনি আরও সুন্দর বলেছেন যে, অধিকাংশ লোকই বাহ্যিক দিক দেখে। গভীর তলিয়ে দেখে না। তারা মানুষটাকে দেখে। বই-পুস্তক ও কিতাবাদি ও গ্রন্থাদি পাঠ করার সুযোগ ও অবকাশ কার হয়? এই দেশে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান

হয়েছেন তারা মুসলমানদেরকে দেখে মুসলমান হয়েছেন। তাঁরা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)কে দেখেছেন। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী লেখক ছিলেন না মোটেও। চিশতিয়া তরীকার বুয়ুর্গগণ বলেন, খাজা মাহবুবে ইলাহী হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া বলেছেন, আমাদের বুয়ুর্গগণ কখনও কিতাব লেখেননি। যে কিতাব সম্পর্কে বলা হয় যে, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী কিতাবটি লিখেছেন তা সঠিক নয়। তদ্রূপ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) সম্পর্কে যা বলা হয় যে, তিনি অমুক কিতাব লিখেছেন তাও সত্য নয়। তদ্রূপ হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শাকার (রহ.) সম্পর্কে যা বলা হয় যে, তিনি অমুক কিতাব লিখেছেন তাও সঠিক নয়। খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়াও কোন কিতাব বা গ্রন্থ লেখেননি। এই সকল পীর ও বুয়ুর্গ লেখালেখি বা যাদু বয়ান ইত্যাদি দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করেননি। তাঁরা তাঁদের চরিত্র মাধুর্য দিয়ে মানুষের মন জয় করেছেন। জয় করেছেন ত্যাগ ও কুরবানী দ্বারা, অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাশীলতা দ্বারা। কারও প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। ক্রোধ সংবরণ করে ফেলেছেন। হার মেনে নিয়েছেন। গালি শুনেছেন। কেউ তাঁদের কিছু চুরি করেছে, জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে তাঁরা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অভাবী, দরিদ্র ও অসহায় কাউকে দেখে কেঁদেছেন, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। ক্ষুধার্তকে আগে খাইয়ে তারপর কিছু নিজে খেয়েছেন নতুবা অভুক্ত থেকেছেন। এই ছিল তাঁদের স্বভাব ও চরিত্র, যা মানুষের মন জয় করেছে, হৃদয়কে বিগলিত করেছে। এই উন্নত চরিত্রই ইন্দোনেশিয়া ও চীনে ইসলামের বিস্তার ঘটিয়েছে। সমগ্র ইন্দোনেশিয়া আরব বণিকদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং সুফীগণের আত্মিক উৎকর্ষ দেখে মুসলমান হয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউ এই দাবি করতে পারেনি যে, ইন্দোনেশিয়া বা চীনে কখনও কোন মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমন ঘটেছিল। মুসলিম সেনাবাহিনী এত দূরের দেশসমূহে কখনই যায়নি। শক্তি বা তরবারী দ্বারা ইসলামের প্রসার ঘটেনি। দেখুন, ভারত উপমহাদেশের যেসব অঞ্চলে সাড়ে সাতশত বৎসর পর্যন্ত মুসলিম শাসন কায়েম ছিল সেখানে মুসলমানেরা এখনও সংখ্যালঘু। এই যে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং বিহার— এই সকল জায়গায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল তবুও এসব জায়গায় মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। খোদ দিল্লীতেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোথায় আছে? আছে কাশ্মীরে। যেখানে আল্লাহর এক বান্দা সাইয়েদ আলী হামদানীর আগমন ঘটেছিল, আর তাঁর হাতে সমগ্র কাশ্মীর মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তদ্রূপ বাংলা, বিশেষত পূর্ব বাংলা। সমগ্র বাংলা সুফীগণের প্রভাবে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। অতএব চরিত্রের পরিবর্তন

ও উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। আপনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দাঁড়াবেন। আপনার অভ্যন্তরটাও হবে দাঁড়, আপনার চরিত্র মাধুর্যই মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। আপনি মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করুন। মুসলমানদের মধ্যে আপনার কথা যেন প্রভাব বিস্তারকারী হয়, তারা যেন আপনার কথার মূল্যায়ন করে। তারা যেন সংশোধিত হয়, আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যেন দৃঢ় হয়। তাদের চরিত্র যেন উন্নত হয়ে যায়। অপরের জন্য তারা যেন দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হয়ে যায়। অতঃপর তাদের জন্য জরুরী হবে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা। তবে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও ভাষণ দিয়ে তারা বলবে না যে, আস তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। বরং নিজ চরিত্র দ্বারা তাদেরকে আকৃষ্ট করবে, তাদের অন্তরে স্থান করে নিবে। আর নিজের মধ্যে দেশাত্মবোধ থাকতে হবে, দেশপ্রেম জাগরুক করতে হবে। সর্বদা এই চেতনা লালন করতে হবে যে, আমাদের দেশটা যেন ধ্বংস হয়ে না যায়।

শিশুসুলভ মানসিকতা

মুসলমানদের মানসিক অবস্থা বর্তমানে এইরূপ হয়ে গিয়েছে যে, যদি এ দেশের কোথাও বন্যা হয়, তবে তারা তাতে খুশি হয়, আনন্দবোধ করে, কোথাও আগুন লাগলে তাতেও তারা আনন্দিত হয়। মনে করে যে, এই দেশের উপর যত বিপদ আসে ততই ভাল। মানসিকতা এতটাই নীচ পর্যায়ে চলে গেছে যে, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধুলায় যদি দেশের দল হেরে যায় আর কোন মুসলিম দেশের দল জিতে যায় তবে আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়। এটা সম্পূর্ণ শিশুসুলভ মানসিকতা। এই মানসিকতা নিয়ে কাজ চলবে না। দেশের প্রতি সত্যিকারের প্রেম ও ভালবাসা থাকতে হবে। দেখুন, আমাদের আসলাফে কেরাম ও পূর্বসূরীগণ যদি এই দেশের জন্য কাজ না করে যেতেন, তাঁরা যদি এই দেশটাকে গঠন করে না যেতেন, এই দেশকে সমৃদ্ধ করে না যেতেন তাহলে এই দেশকে আমরা কিছুই দেখাতে পারতাম না। অনেক মহাপুরুষকে আমরা দেখিয়েছি। আপনি দারুল উলূমে যান, সেখানে যাদুঘর আছে। দেখুন, আমাদের পূর্বসূরীগণ এই দেশকে কী দিয়েছেন, তাঁরা এই দেশটাকে কতটুকু সমৃদ্ধ করেছেন। যদি তাদের দেশপ্রেম না থাকত বরং উল্টো দেশের বিপদে আনন্দিত হওয়ার মানসিকতা যদি তাঁদের থাকত, তাঁরা যদি মনে করতেন এ দেশ ধ্বংস হয়ে যাক, লানত হোক এই দেশের উপর, আমাদের প্রতি এই দেশ এই অবিচার করেছে ঐ অবিচার করেছে, তাহলে কিছুই হত না। তাঁরা এই দেশকে নিজের দেশ মনে করেছেন। এই দেশের জনসাধারণকে আল্লাহর মাখলুক বলে মনে করেছেন। মনে'করেছেন—

الخلق عيال الله

সকল মাখলুক আল্লাহর পরিবারভুক্ত।

তঁারা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহর পয়গাম এই দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানানোর চেষ্টা করেছেন। ফল এই হয়েছে যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিকট তঁারা প্রিয়পাত্রের পরিণত হয়েছেন, সকলের চোখের মনিতে পরিণত হয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় বানিয়ে নিন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের মধ্যেই মুসলমানদের

প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা নিহিত

[এটি ১৩ মহররম ১৪১৬ হিজরী মোতাবেক ১৩ জুন ১৯৯৫ ইসায়ী মাহাদ
আদ-দাওয়াহ-এর ছাত্র ও শিক্ষকদের সামনে প্রদত্ত ভাষণ।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ !
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এটা একটা যথার্থ ও ঐতিহাসিক সত্য যে, নবীগণের সকল প্রচেষ্টার বুনিয়াদ ছিল দাওয়াত। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাঁর সঙ্গে মানবজাতির ঘনিষ্ঠতা ও তাআলুক সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস বিগ্ধতা লাভ করেছে, তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, অন্যায় অবিচারের প্রতি তাদের ঘৃণার মনোভাব জাগ্রত হয়েছে, নবীগণের মাধ্যমেই অন্যায়-অবিচারের নিষ্কিয়তা শুরু হয়েছে, অন্যায়-অবিচার মূলোৎপাটিত হয়েছে, তাঁদের মাধ্যমেই গোটা মানবজাতির গতির পরিবর্তন ঘটেছে, মানুষের জীবন যাপন প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এইসব কিছুর মূলে ছিল নবীগণের দাওয়াত। হ্যাঁ একমাত্র দাওয়াতই ছিল নবীগণের সাফল্যের মূলভিত্তি। রাজশাসন কিংবা রাজক্ষমতা, ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও দাপট, স্বার্থের প্রলোভন, যুগ ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি কোনটাই নয়, তাদের কর্মপ্রচেষ্টার বুনিয়াদ ছিল একমাত্র

দাওয়াত। আখিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁদের এই দিকটাকেই, এই সত্যটাকেই, এই বিশেষত্বকেই বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। আপনি যদি নবীগণের ইতিহাস ও তাঁদের জীবন চরিত পাঠ করেন, তবে আপনার সামনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, তাঁদের কর্মকাণ্ডের সূচনা ও সমাপ্তি এবং বুনিয়াদ ছিল এই দাওয়াত। আখিয়া কেরামের এটাও এক বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল যে, তাঁদের প্রস্তুতকৃত ব্যক্তিরাজে যেন এই দাওয়াতের দায়িত্ব সুচারুরূপে আজ্ঞাম দেয় এবং এটাকে তারা ফরয ও আবশ্যিক বলে জ্ঞান করে। এজন্য কুরআনুল কারীমে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে—

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ الْخَيْرِ

তোমাদের মধ্য থেকে এক দলের এরূপ হওয়া উচিত যাদের কাজ হবে—

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

কল্যাণের দিকে আহ্বান করা। আর এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক আদর্শ, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য যে দাঈ (দাওয়াত দানকারী) এবং সর্বাপেক্ষা সফল যে দাঈ-র উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন তাঁরা ছিলেন আখিয়া আলাইহিমুস সালাম। যদি আপনি তাঁদেরকে পাঠ করেন, তবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, দাওয়াত তাঁদের প্রাণ নয় শুধু, বরং দাওয়াত ছিল তাঁদের প্রকৃতিজাত স্বভাব, আল্লাহ প্রদত্ত মেজাজ। এক হল কাজ, প্রয়োজন পূরণের তাগিদ আর সময়ের দাবি, আরেক হল মেজাজ। তো আখিয়া কেরামের মেজাজই ছিল দাওয়াত। বরং বলুন, সকল দ্বীনের মেজাজ ছিল দাওয়াত। আল্লাহ তাআলা নবীগণের জীবন-কাহিনীর যে খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন তা হতে এবং নবীগণের স্ব-স্ব জাতির সাথে তাঁদের কথোপকথন ও তাঁদের দাওয়াতের যে পদ্ধতির বিবরণ দান করেছেন তা হতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা মূলত ও প্রথমত ছিলেন দাঈ বা দাওয়াত দানকারী, তারপর অন্য কিছু। যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে চেতনাগত, বিশ্বাসগত ও দাওয়াত গত সম্পর্কে সম্পৃক্ত হবে তাদের মধ্য থেকে তারাই দাওয়াত ইলাল্লাহ, দাওয়াত ইলাল আখিরাহ (আখেরাতের দিকে আহ্বান) দাওয়াত ইলাদীন বা দ্বীনের প্রতি আহ্বান ইত্যাদির দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, যারা প্রকৃত অর্থেই তাঁর অনুগত ও তাঁর পথের পথিক। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

‘তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত আঁকড়ে ধর। তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম।’ (সূরা হাজ্জ ৭৮)

চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, যে উম্মতকে খায়রা উম্মাত বা শ্রেষ্ঠ উম্মত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই শেষ উম্মতের প্রকৃত উর্ধ্বতম পূর্বসূরী এবং প্রতিষ্ঠাতা ও মুরব্বী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।

কুরআন মাজীদে যেখানেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আলোচনা এসেছে সেখানেই দাঁঙ্গি সুলভ প্রাণের উচ্ছলতার সন্ধান মেলে এবং তাঁর আলোচনায় তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক উপস্থাপন করা হয়েছে দাঁঙ্গি হিসাবেই। কোন দাঁঙ্গিকে যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, তাকে যে সর্বাধিক ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করে নিতে হয় তার দৃষ্টান্ত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আলোচনাতেই বৃহৎ দুটি ত্যাগ ও কুরবানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যখন তাওহীদী বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন এবং সমকালীন বাদশাহ নমরুদের আনুগত্য ও দাসত্বকে অস্বীকার করলেন তখন আগুন জ্বালানো হল এবং বাদশাহ নির্দেশ দিল, তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করতে। অন্যান্য নবীগণের আলোচনায় এরূপ ভয়াবহ পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পরীক্ষাটির বিবরণ পাওয়া যায় সূরা সাফফাতে। তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বললেন—

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا تَرَى

হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি তোমাকে (আল্লাহর নির্দেশে) যবেহ করছি, তুমি চিন্তা করে দেখ তোমার কী অভিমত। (সূরা সাফফাত ২৩)

এই দুটি পরীক্ষাই এবং দুটো কুরবানী ও ত্যাগই এরূপ যার নজীর অন্যান্য দাঁঙ্গির জীবন ও ইতিহাস তো দূরের কথা অন্যান্য নবীগণের জীবন ও ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। এই দুটো পরীক্ষার কথা কুরআনুল কারীমে বিবৃত করে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, দাঁঙ্গির সামনে এরূপ পরীক্ষা ও বিপদ আগত হতে পারে। তো ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের, ইসলামের সফলতার, ইসলাম যে বিপ্লব সাধন করেছে এবং যে শূন্যতা মুসলিম উম্মাহ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে সে সবকিছুর মূল হচ্ছে দাঁওয়াত। এই উম্মত যত দিন দাঁওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে ততদিন পৃথিবীতে কল্যাণের আশা করা যেতে পারে, ততদিন পৃথিবীতে কল্যাণের

প্রসার ঘটবে। আল্লাহ না করুন! এই উম্মত যদি দাওয়াতের কাজকে নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে এবং দাওয়াতের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তবে গোটা পৃথিবী বিপন্ন হয়ে পড়বে। অতএব দাওয়াতের কাজকে জীবন্ত করে তোলা আবশ্যিক।

রিব্‌ঈ ইবনে আমের (রাযি.)-এর জওয়াব এক্ষেত্রে প্রাধান্যযোগ্য। রুস্তম যখন জিজ্ঞাসা করেছিল-

ما الذى جاء بكم

‘তোমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছ?’

রুস্তমের এই প্রশ্নের কমপক্ষে দশটি জবাব হতে পারত। কিন্তু রুস্তম অপেক্ষায় ছিল একটি মাত্র উত্তরের। সে প্রত্যাশায় ছিল যে, উত্তরে তাকে বলা হবে, তোমরা বহুকাল যাবৎ বিলাসী জীবন যাপন করছ আর আমরা অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছি। তাঁবুতে বাস করছি। আমাদের খাদ্য বলতে কিছু খেজুর, উটের গোশত আর উটের দুধ। সুতরাং আমরা এসেছি আমাদের হক ও অধিকার আদায় করে নিতে। সুখী জীবন যাপনের অধিকার কি শুধু তোমাদেরই থাকবে? তা কখনও হতে পারে না।’

রুস্তম এই উত্তরের অপেক্ষায় ছিল এবং এর জন্য প্রস্তুতও ছিল যে, যদি তারা এরূপ দাবি করে তবে সে তাদের প্রকৃতিগত ও জন্মগত অধিকার এবং হক দিয়ে দেবে, তারা তাদের কাক্ষিত হক বুঝে নিয়ে চলে যাবে। ফলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের খামেলায় জড়াতে হবে না এবং পরাজিত হয়ে নিঃশ্ব হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না।

সে ঠিক করে রেখেছিল, সে বলবে- ঠিক আছে, আমি তোমাদের ভাতার ব্যবস্থা করছি। প্রতিটি আরব এই পরিমাণ ভাতা পাবে। রুস্তম এই উত্তরের প্রত্যাশায়ই প্রশ্ন করেছিল এবং আমাদের ধারণা, সে নব্বই-পঁচানব্বই ভাগ নিশ্চিত ছিল যে, উত্তরে তাকে বলা হবে, ‘আমাদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যই আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। এটা কেমন অবিচার যে, তোমরা একেকজন লাখ টাকার টুপি পরিধান করবে আর আমরা মরব ক্ষুধায়-অনাহারে?’

বাস্তবতা এইরূপই ছিল। ইতিহাস বলে যে, রুস্তম পরাজিত হয়ে যখন পলায়ন করছিল তখনও তার সাথে ছিল এক হাজার বাবুর্চি, এক হাজার জোড়া গরু এবং এক হাজার জন বাজপালক।

সাসানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ আছে প্রফেসর ইকবাল অনূদিত। গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল। আমি আমার রচনায় গ্রন্থটির

বরাত দিয়েছি। আমরা ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করি ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে। গভীর দৃষ্টিতে, চিন্তা ও মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করি না।

যা হোক, রুস্তমের ঐ জাতীয় প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একজন দাঈ'র পক্ষ থেকে কী জবাব হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে রিব্ঈ ইবনে আমের (রাযি.)-এর জবাব। শুধু তাই নয় বরং তাঁর জবাব মুসলিম উম্মাহর চেতনাগত ও কর্মগত অবস্থানও সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। সে জিজ্ঞেস করেছিল-

ما الذى جاء بك

‘তোমরা কেন এসেছ?’

রিব্ঈ ইবনে আমের (রাযি.) একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। উত্তর প্রদানের জন্য সেনাপতি সাদ ইবনে আবী ওয়াহ্বাস (রাযি.) তাঁকে নির্বাচিত করতে কারও ভোট বা পরামর্শ নেননি। কিন্তু যে দীক্ষা তাঁরা পেয়েছিলেন, সেই দীক্ষাই একজন সাধারণ সৈনিককেও এরূপ অভাবিত উত্তর প্রদানে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি উত্তরে বললেন-

ما جاء بنا شىء الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة

الله وحده

‘কোন কিছুই আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসেনি। আমাদেরকে এখানে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তাআলা, যাতে আমরা আল্লাহ যাকে চান তাকে বান্দার পূজা ও উপাসনা থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যেতে পারি।’

উত্তরটি গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। উত্তরটিতে তিনি বলতে চাইলেন, আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা কোথায় যে, আমরা নিজের ইচ্ছায় বের হয়ে আসব? আমরা কবে নিজের ইচ্ছায় বের হয়েছি? আমাদের বের হওয়ার পিছনে নিজস্ব স্বার্থই বা আমরা কবে দেখেছি? আমাদেরকে তো বের করেছেন আল্লাহ এবং এজন্য বের করেছেন, যাতে আমরা মাখলুকের পূজারীকে এক খালেক ও সৃষ্টিকর্তার পূজায় ও ইবাদতে লিপ্ত করতে পারি।

উল্লেখ্য যে, সেখানে মূর্তিপূজা হত। মানুষ হয়ে গিয়েছিল বস্তু ও সম্পদের দাস, কামনা ও বাসনার পূজারী। তৎকালীন যুগের সকল বাদশাহই নিজেকে মাবুদ বানিয়ে বসেছিল। রিব্ঈ ইবনে আমের (রাযি.) যখন রুস্তমের দরবারের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন তাঁকে এই বলে বাধা দেওয়া হল যে, তুমি এভাবে

যেতে পারবে না। তোমার ঘোড়াটাকে এখানে রেখে যাও এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে দরবারে প্রবেশ কর। তিনি বললেন, দেখ- আমি নিজে আসিনি। আমি আমন্ত্রিত। আমাকে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সুতরাং আমাকে আমার মত যেতে দাও, নতুবা আমি ফিরে যাচ্ছি। রুস্তম দূর থেকে বিষয়টা লক্ষ্য করে প্রহরীদেরকে বলল, 'তাকে আসতে দাও। এরপর রুস্তমের প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তর। তিনি বললেন-

الله·بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن

ضيق الدنيا الى سعتها

‘আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তাআলা, যাতে তিনি যাকে চান তাকে আমরা মাখলুকের ইবাদত ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদতে লিপ্ত করতে পারি এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়ার প্রশস্তায় নিয়ে আসতে পারি।

শেষ কথাটি তো চমকে দেওয়ার মত কথা। রিব্বঈ ইবনে আমের (রাযি.)-এর পূর্ণ কথাটি বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যাসহ অনূদিত হওয়া উচিত। এর প্রতিটি শব্দ যেন কালামে নবুওয়াত এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এলহামকৃত। তিনি যদি বলতেন-

من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة

(‘আমরা প্রেরিত হয়েছি যেন তোমাদেরকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে বের করে নিতে পারি।’)

তাহলে বিশ্বয়ের কিছু থাকত না বরং ঐরূপ বলাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, প্রতিটি মুসলিম বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত সর্বদিক দিয়ে অধিকতর প্রশস্ত। কিন্তু না, তিনি সেরূপ বললেন না। তিনি বললেন, আমরা এসেছি যেন তোমাদেরকে সংকীর্ণ দুনিয়া থেকে বের করে প্রশস্ত দুনিয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারি। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, আমরা তোমাদের দূরাবস্থা দেখে তোমাদের প্রতি করুণা করতে এসেছি, তোমাদেরকে দুনিয়ার সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সত্ত্বায় পরিণত করতে এসেছি। তোমরা তো চড়ুই পাখির ন্যায়। পিঞ্জরাবদ্ধ চড়ুই পাখিকে যা দেওয়া হয় তাই সে খেতে পারে। এর বাইরে তার করার কিছুই নেই। তোমাদের অবস্থাও পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায়। তোমাদের

চাকর-নওকর যদি না থাকে, তোমরা ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। তারাই রান্না করে, তারাই তোমাদেরকে আহার করায়, পান করায়। তোমরা তোমাদের গোলামের গোলাম ও চাকর-নওকরের গোলাম। তাদের দাসত্ব নিগড়ে তোমরা বন্দী। তোমরা তোমাদের বাবুর্চির দাস ও গোলাম। প্রহরী ও রক্ষী সেনাদের দাস ও গোলাম। তারা ব্যতীত তোমরা অচল, অক্ষম। তোমরা বিলাসী সামগ্রীর দাস। আমরা তোমাদেরকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দুনিয়ার খোলা বাতাসে নিয়ে আসতে চাই। যা পেলে তা খেয়ে নিলে, যেভাবে পেলে সেভাবে খেয়ে নিলে। কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হল না।

ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, একবার ইরান সম্রাট রাস্তায় বের হওয়ার পর তাকে পানির পিপাসা পেয়ে বসে। অনুসন্ধানের পর পানি পাওয়া গেল এবং একটি পাত্রে তার সামনে পানি নিয়ে আসা হল। তিনি পাত্রটি দেখে বললেন, মরে যাব তবু এইরূপ পাত্রে পানি পান করবো না। একেই বলে মুখাপেক্ষীতা, একেই বলে দুনিয়ার দাসত্ব। তো হযরত রিব্বঈ ইবনে আমের (রাযি.) বললেন—

لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عباد الله وحده ومن صيق الدين

الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام

আমরা এসেছি তোমাদেরকে বান্দার ও মাখলুকের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যেতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়ার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে, অন্যান্য দীন ও ধর্মের অন্ধকার ও জুলুম থেকে মুক্ত করে ইসলামের আলো ও ইনসাফের ছায়াতলে নিয়ে যেতে।

মোটকথা এই দাওয়াতই মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান আনয়নকারী। এই দাওয়াতই তাদের অস্তিত্বের মূল নিয়ামক। আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াতকে জীবন্ত রেখেছেন এবং এর উৎস কুরআনুল কারীমকেও টিকিয়ে রেখেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-ইতিহাস দাওয়াতের ইতিহাস। আমাদের পূর্বসূরীদের ইতিহাসও দাওয়াতের ইতিহাসে সমৃদ্ধ। বরং বলা চলে ইসলামের সমগ্র ইতিহাসই দাওয়াতের ইতিহাস।

‘তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত’ গ্রন্থে আমি লিখেছি যে, কোন যুগ এরূপ অতিক্রান্ত হয়নি যে, সেই যুগে সময় ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী দাঁড় সৃষ্টি হয়নি। অন্য কোন ধর্মে এর নজীর পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থে আমি অন্যদের আপত্তির কথাও উল্লেখ করেছি।

শঙ্কর আচার্য-র পূর্বে কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। শঙ্কর আচার্য কতটুকু সংস্কারের কাজ করেছেন? বরং তিনি তো পৌত্তলিকতাকেই সহায়তা করেছেন। আর সেন্ট পল?

৭০ বৎসর পরে জন্ম নেওয়া সেন্টপল তো খ্রিস্টধর্মকে সম্পূর্ণ উল্টো প্রান্তে নিক্ষেপ করেছে। চূড়ান্ত ضلال ও পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করেছে। ضلال বা গোমরাহী বলা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলাকে। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব দিকে যার যাওয়া প্রয়োজন সে পশ্চিম দিকে রওয়ানা হল। প্রকৃত ضلال বা পথভ্রষ্টতা হল পথের দিক পরিবর্তন করে ফেলা। পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে চলা। এই উন্মত্ত যাতে ঐরূপ পথভ্রষ্ট না হয় সেজন্য এই দাওয়াতের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা হয়েছে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে চিরন্তন মুজিয়া আল-কুরআনুল কারীমকে। এতদ্ব্যতীত আরও আছে সীরাতে নববী। দাঈগণের জীবন-চরিত, তাঁদের ইতিহাস ও ঘটনাবলী। ইসলামের কোন যুগই একনিষ্ঠ দাঈ থেকে শূন্য ছিল না। যদি কেউ দাবি করে যে, এই উন্মত্তের কোন এক দশক দাঈ-শূন্য ছিল তবে সে দাবিও বাতিল ও মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা প্রতি যুগেই দাঈ সৃষ্টি করেছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ। নাদওয়াতুল উলামার ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছিল দাওয়াতকে সামনে রেখে। নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাকালে বহু মাদরাসা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই যুগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সামনে এই দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরার এবং আধুনিক ক্ষেতনাসমূহের মোকাবেলা করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরি করার প্রতিষ্ঠান প্রায় ছিল না বললেই চলে। নাদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তিই ছিল এর উপরে যে, প্রতিষ্ঠানটি যুগের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোতাবেক ব্যক্তি গড়ে তুলবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে এইরূপ দাঈ ব্যক্তিত্ব তৈরি হোক।

আমরা আল্লামা শিবলী নোমানী প্রণীত ‘সীরাতুন নবী’ ও মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী প্রণীত ‘সীরাতুন নবী’কে তাঁর খুববাতে মাদরাজকে এবং মাওলানা শিবলী মরহুম প্রণীত ‘আল-ফারুক’ গ্রন্থকে এবং দারুল মুসান্নিফীন-এর সকল কর্মকাণ্ডকে এমনকি নাদওয়াতুল উলামার পাঠ্যসূচিকে দাওয়াতের অংশ বলে মনে করি। গ্রন্থগুলোর কথা যখন উঠল তখন একটা কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তা হল, আমরা যখন আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট এই প্রশ্ন করে লিখে পাঠালাম যে, আপনাদের প্রতি কোন গ্রন্থগুলোর অবদান অধিক তার তালিকা প্রেরণ করুন, তখন মিঞা বশীর আহমদ লিখে পাঠাল, ‘যখন

আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতাম তখন আমার উপর কয়েক বার নাস্তিকতার আক্রমণ হয়েছিল। যখনই নাস্তিকতার আক্রমণ হত তখনই আমার সামনে ভেসে উঠত ‘আল-ফারুক’ গ্রন্থখানি। আমার অন্তরে উদিত হত যে, যার জীবন চরিত্র এত মহান তিনি নিশ্চয়ই বিপথগামী ছিলেন না, তাঁর দ্বীন নিশ্চয়ই সত্য ও মহান দ্বীন। গবেষণামূলক এইরূপ যত কাজ হয়েছে তার সবই দারুল মুসান্নিফীন, নাদওয়াতুল উলামা দ্বারা অথবা এতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দ্বারা হয়েছে। আর এইসব কিছু মূল বিষয় ছিল একটিই। আর তা হল দাওয়াত।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

মাদরাসা ও মক্তব জাতির জন্য নিঃস্বাস স্বরূপ

[হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) মুজাফফর
নগর জেলার ফালাত মহল্লায় অবস্থিত ফয়জুল উলূম মাদরাসায় একটি
শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই চেতনা জ্ঞাপ্তকারী ও চিন্তা
জাগানিয়া ভাষণটি প্রদান করেন।

ফালাত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর জন্মস্থান।
এই এলাকার বিপুল সংখ্যক লোক হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ
(রহ.)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত এই
এলাকার লোকজনই সর্বাধিক শাহাদত বরণ করেছিলেন।]

মাদরাসা ও মজুব জাতির জন্য নিঃস্বাস স্বরূপ

মাদরাসা ও মুক্তব জাতির জন্য নিঃস্বাস স্বরূপ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا
يَدْعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

হযরত উলামায়ে কেরাম ও প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ!

ফালাত ভূমিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিদ্বান ব্যক্তির বিশেষত যারা ইতিহাসের, বিশেষত তন্মধ্যে যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্র তাদের স্বরণে এসে যায় ঐ সকল বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম যাঁরা শুধু ফালাতের জন্য নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যই গর্ব ও অহংকার।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর চিন্তা ও কর্মধারা

এবং মেজাজ ও প্রকৃতি

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) ছিলেন সমকালীন যুগের সর্বাপেক্ষা বড় আলেমে দীন। আমি অত্যন্ত আস্থা ও দৃঢ়তার সাথেই বলছি যে, তিনি ছিলেন শরীয়তের বিধি-বিধানের হেকমত ও রহস্যের এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের যৌক্তিকতার সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাখ্যাদানকারী, মুসলমানদের জীবনকে শরীয়তের ছাঁচে গড়ে তোলার সর্বাপেক্ষা বড় কারিগর। ইতিহাস লিখতে যেয়ে, বিশেষত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর সমকালীন ব্যক্তিত্ব ও আন্দোলন সম্পর্কে কলম চালাতে যেয়ে আমাকে প্রচুর অধ্যয়ন করতে হয়েছে। আল্লামা ইকবাল মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) সম্পর্কে বলেছিলেন—

وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خیر دہ

‘তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে দীন-সম্পদের অতুল প্রহরী
আল্লাহ যাঁকে উপযুক্ত সময়ে করেছিলেন জ্ঞান দান।’

আমি ঐ অধ্যয়ন ও গবেষণার আলোকে বলতে পারি যে, এই উপমহাদেশে আজ অবধি শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) কর্তৃক সৃষ্ট যুগেরই প্রবাহ চলছে। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর, নাদওয়াতুল উলামা লাক্ষৌ সহ সকল দ্বীনী মাদরাসা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রলম্বিত রূপ। এ সকল দ্বীনী মাদরাসা তাঁরই চিন্তা-চেতনা ও মেজাযের ধারক। এই দিক লক্ষ্য করলে তাঁর জন্মভূমি ফালাত ভ্রমণকেন্দ্র নয় বরং যিয়ারতভূমি।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর সন্তানগণ ছিলেন যেমন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী তদ্রূপ তাঁর সন্তান নয় এরূপ বহু ব্যক্তিও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী রূপে গড়ে উঠেছিলেন। মোটকথা আল্লাহ তাআলা তাঁকে আখলাফ ও খুলাফা উভয়টিই দান করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আখলাফ তথা তাঁর পরিবারের মধ্যে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন ইমামুল হিন্দ শাহ আবদুল আযীয (রহ.), যুক্তিবিজ্ঞানের ইমাম শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী এবং শাহ আবদুল কাদের (রহ.)। শেষোক্ত জনের কুরআনের অনুবাদ বহুল প্রসিদ্ধ। কোন ভাষাতেই এ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে উত্তম অনুবাদ আর কেউ করেনি। চতুর্থ সন্তান শাহ আবদুল আযীয (রহ.) বেশি সময় পাননি। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম বিনিময় দান করেছেন। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ন্যায় মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন সন্তান তাঁকে দান করেছেন। আর খুলাফা বা অ-পারিবারিক উত্তরসূরীদের মধ্যে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.), (যিনি ছিলেন শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর খলীফা,) মাওলানা আবদুল হাই, শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ। শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.) ছিলেন যুগপৎ দরস ও তাদরীসের ইমাম এবং তাসাওউফের ইমাম। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর এই উভয় প্রকার উত্তরসূরী ছিল দিল্লীর প্রতি ফালাতের দান। ফালাত ভূমিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এইসব ইতিহাস সামনে মূর্ত হয়ে উঠে।

যখন রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন পদ লাভের কারণে বিলাসী জীবন যাপনকারীদের অভ্যন্তরীণ শক্তি দুর্বল হতে লাগল, রক্তবাহী শিরা-উপশিরার রক্ত হল শীতল, পরিণত হল জমাট রক্তে তখন মফস্বল এলাকাগুলো সরবরাহ করল নতুন রক্ত। মোঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা ও জিহাদী অনুপ্রেরণার প্রাণকেন্দ্র দিল্লীকে ফালাত উপহার দিল এক বিশাল উপহার। সে উপহার ছিল ওয়ালীউল্লাহী পরিবার। তাঁর ঔরসজাত পরিবার এবং চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক পরিবার। এতদপেক্ষা বড় উপহার আর

কী হতে পারে? যেমন সুহালীর একটি গ্রাম লাঞ্ছনকে উপহার দিয়েছিল ফিরঙ্গী মহলের উলামা পরিবারকে। তদ্রূপ বাগদাদে যখন সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দিল, শাসকদের অপশাসন যখন মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করে ফেলল এবং প্রশাসনের পদ লাভ ব্যতীত মুসলমানদের সামনে আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না তখন ইরানের ছোট একটা গ্রাম ‘জীলান’ উপহার দিল সাইয়েদুনা আবদুল কাদের জিলানীকে, যিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইশকে ইলাহী ও আল্লাহ প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন, যার ঢেউ আছড়ে পড়ল সুদূর আফ্রিকাতেও। তদ্রূপ ইরানের একটি সাধারণ ও অখ্যাত গ্রাম মুসলিম বিশ্বকে উপহার দিল ইমাম গায়যালীর ন্যায় এক মহান সুফী ও গবেষক ও দার্শনিককে।

মফস্বল এলাকাসমূহ প্রতি যুগেই রাজধানীকে সরবরাহ করেছে এরূপ উন্নত ও শাণিত নতুন রক্ত যা সমগ্র দেশকে ভরে দিয়েছে উষ্ণতায়। অনেক সময় লোকে ভুলে যায় এই উষ্ণ স্রোতের সূচনাস্থলকে, ভুলে যায় নতুন রক্তের উৎসকে। বড় বড় শহরের ইতিহাস সামনে এসে সব ছোট ছোট গ্রামের ও মহল্লার ইতিহাসকে আড়াল করে ফেলে। আড়ালে চলে যায় ছোট গ্রামের অনবদ্য ইতিহাস ও অবদান।

ছোট ছোট এইসব গ্রাম ও মহল্লায় যেয়ে যেখানে হৃদয় আন্দোলিত হয় একথা ভেবে যে, এখানে কিরূপ গুণধর মহান ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে, অন্তর পুলকিত হয় আল্লাহর দীন ও দানের অসীমত্ব দেখে, তাঁর কুদরতের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা উপলব্ধি করে, সেখানে একথাও অন্তরে উদ্ভূত হয় যে, বর্তমানে এরূপ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা যে মৃত থেকে জীবিত সৃষ্টি করার কুদরত রাখেন **يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ** (তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন) তা ভুলে যেয়ে মস্তিষ্কে এই কথা জাগরূক হয় যে, ব্যস, এখন শুধু ইতিহাস ও ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম পাঠ করা উচিত। আর নিজের জীবন-জীবিকার সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। ফলাতের যে ইতিহাস ও পরিচিতি তুলে ধরলাম তা আমাকে এই মুহূর্তে এই আয়াতটি পাঠ করে আপনাদেরকে স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ করছে। আয়াতটি হল—

كَلَّا نَمِدْ هَوْلًا ۖ وَهَوْلًا ۖ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

‘আমি প্রত্যেককে, এদেরকে ওদেরকে দান করতে থাকব তোমার প্রতিপালকের দান দ্বারা। তোমার প্রতিপালকের দান তো অব্যাহত।’ (সূরা বনী ইসরাঈল ২০)

অর্থাৎ আমি এদেরকেও দেই, ওদেরকেও দেই **هَوْلًا ۖ وَهَوْلًا** এবং দিতে থাকব। আপনারা জানেন **نَمِدْ** শব্দটি **مضارع** এর রূপ (Form)। আর আপনারা

একথাও জানেন যে, مضارع বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল উভয়টিই বোঝায়। অতএব আমি দেই বা দেব এই দুই অর্থের কোন একটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া শুদ্ধ নয়। এর শুদ্ধ অনুবাদ হল আমি দিতে থাকব। তোমার প্রতিপালকের দানে কোন রেশনিং (Rationing) নেই যে, একবার দান করলেন তো বহু বৎসর যাবৎ প্রতীক্ষায় রাখলেন। আমাদের প্রতিপালকের দান অব্যাহত। তাঁর দানের জন্য নির্দিষ্ট কাল বা নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। কেননা তাঁর দানভাণ্ডার অসীম, অনিঃশেষ। বললেন—

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

আকবর ইলাহাবাদী মরহুম বলেছিলেন,

اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی آثار و نشان بھی قائم ہیں

اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا

আল্লাহর পথ এখনও রয়েছে খোলা, আলামত ও নিদর্শনও রয়েছে বহাল। কিন্তু আল্লাহর বান্দারা সেই পথে চলা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আল্লাহর দান প্রাপ্তির জন্য কিছু শর্তাদি রয়েছে। আর তা হল পরিপূর্ণ সাহস থাকা, ইখলাস থাকা, সর্বোপরি সাধনা থাকা। আল্লাহ তাআলা একাধিক জায়গায় চেষ্টা করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তো কারও চেষ্টাকেই বৃথা যেতে দেন না। সকলের চেষ্টারই কিছু না কিছু ফল দান করেন। আর এটা তো তাঁর প্রিয় দীন, রহমাতুল লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীন। আর এই উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবতাও তাঁর প্রিয়, তাঁর সৃষ্ট এই পৃথিবীও তাঁর প্রিয়। যে পরিবেশ ও সমাজকে আমাদের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে বা আমাদেরকে যে পরিবেশ ও সমাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া আবশ্যিক। এই পরিবেশ ও সমাজের জন্য আমাদের উপকারিতা ও অপরিহার্যতা প্রমাণ করা প্রয়োজন। আমাদের আকাবিরগণ যুগের নাড়ি-নক্ষত্র চিনতে পেরেছিলেন। মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বলুন, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) বলুন অথবা শাহ আবদুল কাদের বলুন সকলেই স্ব-স্ব পরিবেশ ও সমাজকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, যুগের প্রয়োজন হল রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক উৎকর্ষের। প্রয়োজন বিশুদ্ধ ইলম ও জ্ঞানের, প্রয়োজন বিশুদ্ধ তাওহীদের। পদমর্যাদা ও আমিত্বের উর্ধ্বে উঠে আমলে প্রাণসঞ্চার করা প্রয়োজন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদগ্র বাসনা সৃষ্টির প্রয়োজন। অনুরূপ তাঁরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন যে, মানব সমাজে বর্তমানে কোন্ জিনিসের পিপাসা বিদ্যমান? মানুষ জীবিত থাকার অধিকার ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। মানুষ কর্তৃক যে জুলুম সংঘটিত হচ্ছে, একজন কর্তৃক অপরজনের যে হক ও অধিকার বিনষ্ট হচ্ছে, একজন মানুষের হাতে অপর মানুষের যে রক্ত অতি সস্তায় পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে তাতে আল্লাহ তাআলা না শেষ পর্যন্ত মানবজাতির ধ্বংসের ফায়সালা করে ফেলেন। কারণ

وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

‘যা আবর্জনা তা চলে যায় এবং যা মানুষের জন্য উপকারী তা জমিতে থেকে যায়।’ (সূরা রাদ ১৭)

বোঝা গেল, বেঁচে থাকা ও অস্তিত্ব বহাল থাকার বিষয়টি উপকারী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। যা অন্যের জন্য উপকারী হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তা অস্তিত্বশীল থাকার অধিকারও হারিয়ে ফেলে। যে দল ও গোষ্ঠী, যে কেন্দ্র, যে দাওয়াত ও আন্দোলন অপরের জন্য উপকারী হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তা টিকে থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে। এটাই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত চিরন্তন রীতি।

ঐ সকল বুয়ুর্গানে দ্বীন জাতিকে কী দিয়েছেন?

ঐ সকল বুয়ুর্গানে দ্বীন উভয়বিধ কাজ করেছেন। আমাদের মস্তিষ্ক তো শুধু একদিকে ধাবিত হয়। তা হল, তাঁরা এই দ্বীনকে কী দিয়েছেন, হাদীস ও তাফসীরে তাঁরা কী কী নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁরা কতটুকু গভীরে নিয়ে গেছেন, তাতে কী পরিমাণ বিস্তৃতি তাঁরা ঘটিয়েছেন। পরিবেশ ও সমাজে তাঁরা কতটুকু আধ্যাত্মিকতার ধারা সৃষ্টি করেছেন, পরিবেশ ও সমাজের আত্মিক উন্নতি কতটুকু সাধন করেছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে অপর একটি বিষয় অদৃশ্যই থেকে যায়, আমাদের মস্তিষ্ক সে বিষয়টির দিকে ধাবিত হয় না। আর তা হল, অমুসলিমদের নিকট ইসলামের মর্যাদা তাঁরা কতটুকু তুলে ধরেছেন, অমুসলিমদের অন্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কতটুকু প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কীভাবে তাঁরা তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত অধ্যয়ন, গভীর দৃষ্টি দ্বারা চিন্তা-ভাবনা ও তা আত্মস্থ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিকরাও এই দিকটাকে এড়িয়ে গেছেন, তাঁদের এই কর্মধারাকে পর্দার অন্তরালে রেখে দিয়েছেন। অথচ একদিকে যেমন তাঁরা মুসলমানদের মাঝে জ্ঞানের সাগর প্রবাহিত

করে দিয়েছেন, শিক্ষাদানের চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা তেমনই প্রতিবেশী অমুসলিমদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জগতের জন্য রহমত স্বরূপ, ইসলাম যে সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইসলাম যে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম, ইসলাম যে পৃথিবীর পিপাসা নিবারণের একক ক্ষমতার অধিকারী ধর্ম—এর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের অন্তরে এসব বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের লিখিত জীবন-ইতিহাসসমূহে তাঁদের কীর্তির এই দিকটি উপেক্ষিত থেকে গেছে, কমপক্ষে গৌণ থেকে গেছে।

আজ আমি বলছি যে, বর্তমানে মুসলিম জাতিকে এই উভয়বিধ কাজ করতে হবে। বিশুদ্ধ বিশ্বাস, গ্রহণযোগ্য ইবাদত এবং আল্লাহ তাআলার মারেফাত লাভের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মুসলমানদের বিশুদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, শক্তিশালীও করতে হবে। উভয়টিই জরুরী। সম্পর্কের বিশুদ্ধতা এবং শক্তিশালীতা। শুধু বিশুদ্ধ হলেই চলবে না, শক্তিশালীও হতে হবে। শুধু শক্তিশালী হলেও চলবে না, বিশুদ্ধও হতে হবে। ইবাদত তো মুশরিকরাও করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً

‘কাবা ঘরের নিকট তাদের সালাত শুধু শিস ও হাততালি ব্যতীত কিছুই ছিল না।’ (সূরা আনফাল ৩৫)

উপরিউক্ত বিষয় দুটোর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত এই যুগে আরও একটি বিষয় মুসলিম মিল্লাতের জন্য অপরিহার্য। আর তা হল নিজেদেরকে জাতি ও দেশের জন্য উপকারী বলে প্রমাণ করা। আমাদের কারণে বহু বিপদ থেকে দেশ রক্ষা পাচ্ছে; আমরা এই দেশের জন্য রহমত ও বরকত স্বরূপ—এটা আমরা তখনই প্রমাণ করতে পারব যখন আমরা অফিস-আদালতে, হাটে-বাজারে, ঘাটে-মাঠে খাঁটি মানুষ হয়ে যেতে পারব। খাঁটি মানুষ হতে পারলে অমুসলিমরা চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, কোন সে ধর্ম যা এদেরকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছে? আমাদের বলতে হবে যে, এই দেশের জন্য পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও সাগর এতটা প্রয়োজনীয় নয় যতটা আমরা এই দেশের জন্য প্রয়োজনীয়, আমাদের মানবতার পয়গাম, আমাদের খোদাভীতি যতটা প্রয়োজনীয়।

আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে, একটি রাস্তা চলে যাচ্ছে ইরতিদাদ ও ধর্মান্তরিত হওয়ার দিকে। এর চেয়ে লঘু কোন শব্দ ব্যবহার করতে আমি রাজী নই, যদি না আসমান থেকে কোন ইশারা পাওয়া যায়। আল্লাহ

তাআলার কুদরতের সরাসরি হস্তক্ষেপ না হলে পরবর্তী প্রজন্ম সম্ভবত ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে থাকবে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সম্পূর্ণ অজ্ঞই শুধু নয়, বরং তারা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ইসলাম বিরোধী বিশ্বাস ও ইসলাম বিরোধী চিন্তা-চেতনার ধারক হবে। শিরকপ্রসূত বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার প্রবক্তা হবে। এটা শুধু কল্পনা নয় বরং বাস্তবতা। এইরূপই হবে বলে আমাদের দিব্যদৃষ্টিতে যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগ অতিবাহিত হচ্ছে যে, মুসলমানদের যদি উপরিউক্ত আশঙ্কা দূরীভূত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করার তাওফীক না হয় তাহলে পঁচিশ বৎসর পর, না এতদিনও নয়- বরং পনের বৎসর পরই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে। এর আলামত ও পূর্বাভাস স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এখনই স্কুলের অনেক শিশু আল্লাহ শব্দটি বিশুদ্ধভাবে লিখতে পারে না। তারা জিজ্ঞেস করে আমরা "الله" কীভাবে লিখব? আর বিপুল সংখ্যক যুবক বর্তমানে এই ধারণা পোষণ করে যে, এই ধরিত্রী পরিচালনা করেছে রাম অথবা কৃষ্ণ। হিন্দুদের দেব-দেবী বিষয়ক বিদ্যা শিশুদের মন-মস্তিষ্কে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে টেলিভিশনে যে রামায়ন সিরিজ প্রচারিত হচ্ছে এবং কলেজে যেসব গ্রন্থের পাঠদান করা হচ্ছে তা দ্বারা যুবকদের মন-মানস প্রভাবিত হয়ে পড়ছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।’ (সূরা তাহরীম ৬)

সন্তানদের আলেম, ফায়েল, মুফাসসির এবং মুহাদ্দিস বানানোর বিষয় নয় বরং বিষয় হল তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার করার, দোষখের আগুন থেকে রক্ষার করার। মহিলাদের একটি মজলিসে এক বোনের চেহারায় চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছাপ দেখা যাচ্ছিল। চেহারা ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছিল। অন্যান্য মহিলারা তাকে জিজ্ঞেস করল, বোন ব্যাপার কী বল তো? তোমার কি মাথা ব্যথা করছে? নাকি তোমার পেটে কোন সমস্যা? সে বলল, কিছুই হয়নি। অনেক পীড়াপীড়ির পর সে বলল, আমি আমার শিশু সন্তানকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে এসেছি। তার অদূরে দিয়াশলাই রাখা আছে। যদি আমার বাচ্চাটি জেগে যায় এবং দিয়াশলাইর কাছে পৌঁছে যায় আর তা দ্বারা নিজের কাপড়ে আগুন জ্বালিয়ে

ফেলে তাহলে কী অবস্থা হবে— এই চিন্তাই আমাকে অস্থির করে তুলেছে। মহিলারা জিজ্ঞেস করল, বাচ্চার বয়স কত? সে বলল, আড়াই বছর। তখন মহিলারা বলল, কথা হুঁশ করে বল। এতটুকু বাচ্চা চৌকি থেকে কীভাবে নামবে আর দিয়াশলাইর কাছে যাবে? আর গেলেই যে সে এই কাজটিই করবে তা তুমি কি করে চিন্তা কর? উত্তরে সে বলল, বাচ্চাটি যদি তোমাদের হত তাহলে তোমরাও এরূপই আশঙ্কা করতে। বাচ্চাটি তো আমার। এজন্য আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে।

সুধীবৃন্দ!

আপনাদের নিকট আমি প্রশ্ন রাখছি যে, আজ আমাদের পিতা-মাতার অন্তরে এই চিন্তার উদয় কেন হয় না যে, আমরা যদি আজ আমাদের সন্তানদেরকে কালিমা ও নামাযের শিক্ষা না দেই, তাওহীদের শিক্ষা তাদেরকে স্মরণ না করিয়ে দেই, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মূর্তি ভাঙ্গার তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের ধারণা না দেই তাহলে কাল তারা মুশরিক হয়ে যাবে। এটা তো কল্পনাপ্রসূত আশঙ্কা শুধু নয় বরং বাস্তবতা। আর বাচ্চার ব্যাপারে ঐ মহিলার আশঙ্কা ছিল অনেক দূরের।

আমি একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি যে, ঢাল বেয়ে যাওয়া পথে একটি বালক সাইকেল চালাচ্ছে, সামনে আছে গভীর গর্ত। যে গর্ত হল হিন্দুদের দেবতাদের গর্ত, পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার গর্ত। মুসলমানদের অন্তরে শিরক ও মূর্তিপূজার ব্যাপারে এরূপ ঘৃণা বিদ্যমান থাকা উচিত যেরূপ ঘৃণা থাকে পায়খানা-পেশাবের ব্যাপারে বরং পায়খানা পেশাব অপেক্ষাও মূর্তিপূজা ও শিরকের প্রতি অধিক ঘৃণা বিদ্যমান থাকা জরুরী। মুসলমানদের অন্তর থেকে এই ঘৃণা, এই শিরক-ভীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এটা আশঙ্কাজনক। একজন মুসলমানের অন্তরে তো সব সময় এই আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা উচিত ছিল যে, সে মুশরিক হয়ে, শিরকী বিশ্বাস নিয়ে পুনরুত্থিত হয় কিনা। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম কর্তৃক একজন বালককে হত্যাকরণ শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতায় পড়ে না, সুতরাং তদনুরূপ আমল করতে যাওয়াও অপর কারও জন্য বৈধ নয়। কিন্তু ঘটনাটি কুরআনুল কারীমে বিবৃত করা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতে থাকবে। ঘটনাটি বিবৃত করার উদ্দেশ্য এই কথা বোঝানো যে, মুসলমানরা যেন বোঝে যে, বংশের জন্য ফেতনা ও বিপদ হতে পারে এরূপ বালক কত অশুভ ও অকল্যাণকর। কুরআনে ঘটনাটিকে স্থান দিয়ে একথা জানান দেওয়া হয়েছে যে, শিরক ও কুফরীর বিপদ কত বড় বিপদ ও কত ভয়াবহ বিপদ।

প্রথম কথা তো এই যে, ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্পষ্ট মূর্তিপূজা থেকে এবং শিরকী আকীদা-বিশ্বাস থেকে রক্ষা করতে মরণপণ চেষ্টা করুন, সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের জন্য অবসর সময়ে প্রাইভেট ক্লাসের ব্যবস্থা করুন অথবা তাদেরকে মাদরাসা ও মক্তবে ভর্তি করুন। মাদরাসা ও মক্তব আমাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ, আমাদের নিঃশ্বাস স্বরূপ। যদি নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস চলে তো আমরা জীবিত, নতুবা আমরা মৃত। পরিবেশকে গড়ে তুলুন। পরিবেশকে নিজের কাছাকাছি আনতে চেষ্টা করুন। সমাজ ও পরিবেশ যদি এইরূপ অগ্নিফুলিঙ্গ নিয়েই বহাল থাকে তাহলে যে কোন সময় আগুনে ভস্মীভূত হতে পারে। যদি সমাজের লোকজন আমাদেরকে দেখার পর তাদের মুখমণ্ডলে বিরক্তিতাব প্রকাশ পায়, যদি তারা দেখতে থাকে যে, আমাদের মধ্যে না চারিত্রিক গুণাবলী বিদ্যমান, না আমাদের মধ্যে অন্যের জন্য উপকারী গুণ বিদ্যমান, আমরাও ওয়াদার বরখেলাফ করি যেমন তারা, আমরাও মিথ্যা বলি যেমন তারা বলে, তাহলে আমরা শুধু নিজেদের জন্য নয় বরং ইসলামের অস্তিত্বের জন্যও এই দেশে আমরা হুমকি হয়ে দাঁড়াব। আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরীগণ আফ্রিকা, মরক্কো, স্পেন পর্যন্ত ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। ইসলামের কথা তাঁরা শুধু মুখে প্রচার করেননি, বরং তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলীর উৎকৃষ্টতা ইসলামের প্রসারে বড় ভূমিকা রেখেছে। তাঁদেরকে দেখে তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে এমনিতেই অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্যের কথা মুখে বেশি একটা প্রচার করতে হয়নি।

মুসলিম পার্সোনাল ‘ল’ বা মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন উদ্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হয়েছে শুধু এজন্য যে, পারিবারিক সম্পর্ক, উত্তরাধিকার, বিবাহ তালাক সব যেন ইসলামী আইন অনুযায়ী হয়। আর এই সংগ্রামে দেশের সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম কিতাব অধ্যয়ন ছেড়ে কামরা থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছেন, মাঠে-ময়দানে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। নিজেদের পারিবারিক আইনের হেফাযত করতে হবে, নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তাকে রক্ষা করতে হবে। এর সর্বোত্তম নিকটবর্তী উপকরণ হল এই সকল মাদরাসা ও মক্তব। দ্বিতীয় যে কাজটি করা প্রয়োজন তা হল, পরিবেশের ও সমাজের স্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ও তিক্ত আবহাওয়াকে দূরীভূত করতে হবে। ইসলামের পরিচিতি সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে, নতুবা কোন উপায় অবশিষ্ট থাকবে না।

সুধী!

‘মানবতার মুক্তি আন্দোলন’ একটা চার দেয়াল বিশিষ্ট সুরক্ষিত দুর্গ। এতে অবস্থান করে আপনি কুরআন পাঠ করুন, মসজিদ নির্মাণ করুন। আল্লাহ না

করুন! যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তবে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঐ দিন পর্যন্ত জীবিত না রাখুন যখন এই সমস্যা চার দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং মাদরাসা, মসজিদ হুমকির সম্মুখীন হবে।

এতটুকু কথা বলার মত শারীরিক অবস্থা আমার ছিল না। আপনাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ও সহায়তা আমাকে এত কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ আমল করার তাওফীক দান করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বীনী ইলমে ইখলাস ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের গুরুত্ব

[৩রা জিলকদ ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ৫ই মে ১৯৯২ ঈসাবী মুফাককিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপাল সফর করেন। নেপালে এটাই ছিল তাঁর প্রথম ও শেষ সফর। ঐ সময়ে নেপালের 'দারুল উলূম নুরুল ইসলাম' জলপাপুর, সানসারী-র পরিচালক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়ুব নদভী সাহেবের আমন্ত্রণে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) দারুল উলূমে গমন করেন এবং দারুল উলূমের মিলনায়তনে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে ইখলাস ও জ্ঞানশাস্ত্রীয় বিশেষত্ব সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। জলসায় জনসাধারণের উপস্থিতিও ছিল প্রচুর। তাদেরকে বিশেষত নেপালের মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবনাচারের বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন, ইসলামী জীবনাচারকে গ্রহণ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও এর প্রতি গুরুত্ব আরোপের আহ্বান জানান। জলসায় দারুল উলূমের শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও সারা দেশ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় তিনি দারুল উলূমের মসজিদ 'জামেউল কাসেম'-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মসজিদটি নেপালের প্রসিদ্ধ ও বৃহদাকারের মসজিদসমূহের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হয়। এই মোবারক জলসায় পাকিস্তানের আল্লামা বিন্দৌরী টাউনের জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হযরত মাওলানা কারী রশীদ হাসান নদভী বিশেষ অতিথি ছিলেন।]

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বীনী ইলমে
ইখলাস ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের গুরুত্ব

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বীনী ইলমে

ইখলাস ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের গুরুত্ব

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا
يَدْعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, উলামা হযরাত ও সুধী!

জ্ঞানগত, চিন্তাগত ও দ্বীনগত একই পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণ! এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে একটি কবিতা- যা এই পরিবেশের জন্য খুবই উপযুক্ত।

কবি বলেন-

قالوا خراسان اقصى ما يراد بنا

ثم القفول فقد جئنا خراسانا

কবি বলেছেন, যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল তারা বলেছিল তোমরা এখানে কবে, কীভাবে আগমন করতে পারবে? আমরা খোরাসানে থাকি আর খোরাসান তোমাদের থেকে বহু দূরে, দুনিয়ার শেষ প্রান্তে। তারপরে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটাও আছে। তো আমরা বললাম, নাও, আমরা এসে গেছি।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এবং আগমনের উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে নেপাল খুব বেশি দূরের দেশ নয়। কিন্তু আমার শারীরিক দুর্বলতা ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে এই সময়ে এখানে আসা আমার জন্য বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার আগমন ছিল মুকাদ্দার ও ভাগ্যলিপি-নির্ধারিত বিষয়। এর জন্য সময়ও তাকদীরে লিপিবদ্ধ ছিল, ফলে আমি এসেছি, আমাকে আসতে হয়েছে।

সুধী!

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত। কোন রকম কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে অন্তর থেকেই বলছি যে, আমার মনে হচ্ছে, আমি 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার' ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের সামনে কথা বলছি। মনে হচ্ছে আমরা একই

পরিবার। আর আপনাদের সাথে আমার এলাকার লোকজনের তুলনা করে আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি লাক্ষৌতে লাক্ষৌর অধিবাসীদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। আপনাদেরকে আমার অপরিচিত বা পর মনে হচ্ছে না।

আমার উদ্দেশ্যে লিখিত মানপত্রে এখানকার অবস্থা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। তা অত্যন্ত হৃদয়াকর্ষী ও মনোযোগ আকৃষ্টকারী। সুতরাং বিস্তারিতভাবে এর জবাব দান আমার নিকট মানপত্রটির দাবি ছিল। কিন্তু আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি জরুরী কথা আরজ করব।

প্রথম কথাটি আমাকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলতে হবে। দেখুন, পৃথিবীর যত ইতিহাস আমাদের সামনে সংরক্ষিত আছে তা দ্বারা আমরা অবগত হই যে, পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি সর্বদা প্রত্যেক যুগেই মানুষের পরিশ্রম ও মেহনত নিজের রঙ পরিস্ফুট করে তোলে। আর সফল ও চূড়ান্ত পরিশ্রম ও মেহনত নিজের মূল্য আদায় করে নেয়। এতে না যুগের কোন ভেদাভেদ আছে, না দেশের, না প্রজন্ম ও বংশের, না পারিবারিক কোন ভেদাভেদ আছে, না ভৌগোলিকতার কোন ভেদাভেদ। দেশ, যুগ, ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবার-অপরিবার, বংশ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বত্র একই চিত্র। মেহনত ও পরিশ্রম নিজের ফল দেখাবেই। সুগন্ধি যেমন তার সুবুত্তি ছড়ায়। সুবুত্তি ছড়ায় এবং নিজের অস্তিত্ব অপরকে মেনে নিতে বাধ্য করে। ফুলের আছে সৌন্দর্য ও সুগন্ধ। বাগানের আছে রূপ, মোহনীয় সৌন্দর্য। নক্ষত্রের আছে উজ্জ্বলতা। সূর্যের আছে দীপ্তি। চাঁদের আছে স্নিগ্ধতা ও রূপ-সৌন্দর্য। এইসব বস্তু আপন মহিমা দ্বারা নিজের মূল্য আদায় করে নেয়, নিজের অস্তিত্বশীলতাকে অপরকে মেনে নিতে বাধ্য করে। এর জন্য তাদের কোন প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে না। আমি তালিবুল ইলম (শিক্ষার্থী) ভাইদেরকে বলব যে, আপনারা মেহনত করুন। যোগ্য হোন। এমনিতে তো সব বিষয়েই আপনাদের জ্ঞান থাকা উচিত, আপনাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সব শাস্ত্রেই আপনাদের দখল থাকা উচিত। তবে কমপক্ষে বিশেষ কোন একটি বিষয় ও শাস্ত্রকে নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নিন এবং সেই বিষয় ও শাস্ত্রে নিজের পাণ্ডিত্য সৃষ্টি করুন। অন্যদের থেকে ঐ বিষয়ে নিজেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে গড়ে তুলুন। যদি আপনি কোন শাস্ত্রে নিজের পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেন, বিজ্ঞতম হতে পারেন, তবে আরব দেশসমূহ থেকে স্বীকৃতি আসতে থাকবে। আপনাদের সামনে এর দৃষ্টান্তও বিদ্যমান। আমি নাম নিতে চাচ্ছি না। যদি সরাসরি আপনার প্রশংসা করা নাও হয়, আপনার ইলমী পরিবারের এবং আপনার ইলম চর্চার কেন্দ্র ও উৎস

দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার প্রশংসা অবশ্যই হবে। আর তা হবে প্রকৃতপক্ষে আপনারই প্রশংসা। এটা আল্লাহ তাআলার চিরন্তন রীতি।

وَلَنَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنَجِدَ لِسَنَةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا

‘আল্লাহ তাআলার রীতিতে কোন পরিবর্তন কখনই পাবে না, আল্লাহ তাআলার রীতিতে কোন উল্টা-পাল্টা ও বিশৃঙ্খলা পাবে না।’

আল্লাহ তাআলা তাকীদ ও জোর দিয়ে বলেছেন এবং প্রথমে বলেছেন, تَبْدِيلًا পরে বলেছেন تَحْوِيلًا কোন রকম পরিবর্তন, কোন রকম উল্টা-পাল্টা পাবে না।

কোন এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য সৃষ্টি করুন

একটি কথা আমি তাই বলতে চাই যা আমি বড় বড় মাদরাসায় বলে থাকি। তা হল আপনি কোন এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করুন। এক্ষেত্রে একটি বাক্য আমার মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হয়, বাক্যটিকে আমি অযীফার ন্যায় স্মরণে রেখেছি। আর তা হল, আপনি ইখলাস ও ইখতেসাস পয়দা করুন। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইখলাস থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে যে, আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাক। আমরা ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষালাভ করছি, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান লাভ করছি, যেন আল্লাহ তাআলার মারেফাত ও পরিচয় লাভ করতে পারি, তাঁর সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে পারি, তাঁর রাসূলকে চিনতে পারি, তাঁর ও তাঁর রাসূলের কালাম বুঝতে পারি এবং অন্যকে বুঝাতে পারি, সর্বোপরি সেই অনুযায়ী যেন আমল করতে পারি।

ইখলাস ও ইখতেসাস-এর গুরুত্ব

তো প্রথম কথা হল ইখলাস থাকতে হবে। দ্বিতীয় কথা হল নিজের মধ্যে ইখতেসাস (اختصاص) সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ কোন এক শাস্ত্রে অন্যের তুলনায় আপনার মধ্যে বিশেষত্ব থাকতে হবে। যাঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়, যাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী, গুণধরের গুণ সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিফহাল তাঁরা যেন বলেন, ‘এই ব্যক্তি অমুক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, বিদগ্ধ ও পণ্ডিত। অনেকের তুলনায় শাস্ত্রটিতে তার দখল অনেক বেশি।’

শিক্ষার্থী ভাইদেরকে বলব যে, তারা ইখলাস ও ইখতেসাস-এর অধিকারী হোক, তাদের নিয়ত যেন বিশুদ্ধ হয়, শুধু এবং শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের

উদ্দেশ্যে যেন হয়। অন্যান্য বিষয় স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হয়ে যাবে। এটা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার চিরন্তন রীতি যে, নিয়ত বিশুদ্ধ হলে অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো এমনতিহেই অর্জিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত কোন কোন শাস্ত্র ও বিষয়ে কমপক্ষে একটি বিষয়ে (আর আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে একাধিক বিষয়ে) ইখতেসাস ও বিশেষত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এটা ঠিক যে, যুগ অনেক বদলে গেছে। কিন্তু এই ব্যাপারটির ক্ষেত্রে যুগের আচরণ পূর্বের ন্যায়ই আছে। এখনও যারা কোন বিষয়ে অন্যদের তুলনায় নিজেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তুলেছে তারা তার স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে মানুষ নতশির হচ্ছে, তাদের পদচুষন করছে। তাদেরকে অনুরোধ করে, কাকুতি-মিনতি করে মাথায় উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। তারা মানুষের চোখের মনিতে পরিণত হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে কোন স্থান বা দেশের বিশেষত্ব নেই। না নেপালের বিশেষত্ব আছে, না বার্মার। যে কোন স্থানের, যে কোন দেশের লোকই হোক না কেন ইখতেসাস সৃষ্টি করতে পারলে তার মর্যাদা নিজের দেশ পেরিয়ে বহির্দেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ অনেকেই জানে না, হেদায়া গ্রন্থ প্রণেতা মারগীনানী কোথাকার অধিবাসী। অথচ তাঁর মর্যাদা ও যোগ্যতা, তাঁর ইলমী পাণ্ডিত্য সারা বিশ্বে স্বীকৃত। তদনুরূপ কেউ তাবরীখী, কেউ যামাখশারী, কেউ সাক্বাকী। ভূগোল শাস্ত্রের বিশাল বিশাল গ্রন্থ বর্তমানে লিখিত হয়েছে। সেসব গ্রন্থ দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, ঐ সকল মনীষার কেউ নেপালের, কেউ হিন্দুস্তানের। এমনকি কোন প্রদেশের সীমাবদ্ধতাও এক্ষেত্রে বাধা নয়। আপনি নিজের যোগ্যতা সৃষ্টি করুন, সারা বিশ্ব বিশেষত মুসলিম বিশ্ব আপনার যোগ্যতার মর্যাদা দান করবে। আপনার পাণ্ডিত্য স্বীকার করে নেবে। আপনি নিভৃতচারী হয়ে থাকতে চাইলেও পারবেন না। লোকে আপনাকে তালাশ করে বের করে আনবে। আপনি সহস্র পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে চাইলেও পারবেন না। লোকেরা পর্দা অপসারিত করে আপনাকে মাথায় উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তারা খোশামদ করবে, আপনার পায়ে তাদের মাথার টুপি লুটিয়ে দেবে। বলবে, আপনি আমাদের মাদরাসায় চলুন। কেউ বলবে, আপনি আমাদের কলেজে চলুন, আমাদের ভার্টিসিটিতে চলুন, এই সাবজেক্টটি পড়িয়ে দিন।

শিক্ষার্থী ভাইদেরকে তো বলছি যে, ইখলাস ও ইখতেসাস সৃষ্টি করুন। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ইখলাস। সকল কাজের নিয়ত থাকবে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ। অন্য কোন নিয়ত থাকবে না। না অর্থ উপার্জনের, না উত্তম আহারের, না উচ্চ বেতনের। আর ইলমের ক্ষেত্রে কোন এক বিষয় ও শাস্ত্রে ইখতেসাস সৃষ্টি করুন। কারণ ইখতেসাস ও ইমতিয়াজ বা বিশেষত্ব ও অন্যের তুলনায় বৈশিষ্ট্য

পৃথকত্ব ব্যতীত কোন কিছুই দৃষ্ট হয় না, প্রকাশ লাভ করে না। হযরত আলী (রাযি.)-এর বাণী রয়েছে-

قيمة كل امرئ ما يحسنه

প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্য তা-ই যা সে অন্যের তুলনায় উত্তমরূপে সমাধা করে।

আমি শিক্ষার্থী ভাইদেরকে বলব যে, তোমরা মেহনত কর। তোমাদের মেহনত তোমাদেরকে উজ্জ্বল করবে, তোমাদেরকে অনেক দূর অবধি নিয়ে যাবে। কোথাকার নাদওয়াতুল উলামা? কোথাকার দারুল উলূম দেওবন্দ? কোথাকার জামে আযহার ...? তোমরা উজ্জ্বল হবে, তোমাদের আলো বিকীরিত হবে। এক্ষেত্রে নেপালে শিক্ষালাভ, এত দূরে শিক্ষালাভ, এত কঠিন ও দূরের রাস্তা কোন কিছুই অন্তরায় হতে পারে না। যারা গুণী, উচ্চ গুণের অধিকারী তাদেরকে লোকেরা কত দূর-দূরান্ত থেকে নিয়ে এসেছে,কিরূপ মর্যাদা দিয়েছে তোমরা তালাশ করে দেখ। বিস্মিত হবে।

শিক্ষার্থী ভাইদেরকে বলছি যে, আল্লাহ তাআলার গুণকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে নেপালের মত একটি দেশে দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে বলছি, এক কালে নেপালের পরিচিতি ছিল শুধু পাহারাদার ও সিপাহী সরবরাহকারী দেশ হিসাবে। আমি অনেক লেখাপড়া করি। পৃথিবীর বহু দেশ আমি ভ্রমণ করেছি। আমি নেপালকে চিনতাম ও জানতাম শুধু গোর্খা সৈন্যদের কারণে। আমি জানতাম, নেপাল এমন একটি দেশ যা সাহসী সৈনিক এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী পাহারাদার সরবরাহ করে থাকে। বিভিন্ন দেশের নওয়াব ও জমিদাররা যাদেরকে নিজেদের বাড়ী ও দুর্গ পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত করত। আলেম-উলামার দেশ হিসাবে নেপালের পরিচিতি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার শোকর, এখানে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমের হাতে। আল্লাহ এটাকে কবুল করুন এবং প্রতিষ্ঠাতা-বৃন্দকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এই প্রতিষ্ঠানটির উসিলায় ইনশাআল্লাহ নেপালের পরিচিতি শুধু গোর্খা সৈন্য ও পাহারাদার সরবরাহকারী দেশের পরিচিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এখন থেকে দেশটি আলেম-উলামার দেশ হিসেবেও পরিচিতি লাভ করবে।

এক্ষেত্রে দেশের সাথে দেশের, শহরের সাথে শহরের কোন পার্থক্য থাকে না। লাক্ষৌ, দিল্লী, জৈনপুর, ভূপাল, টুংক প্রভৃতি শহর কোন এক সময়ে বড় বড়

মনীষা সৃষ্টির কেন্দ্র ছিল। রামপুর এলাকায় বড় বড় দার্শনিক ও যুক্তিশাস্ত্রবিদ সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব সানসারীর এই অঞ্চল আপনাদের এই জালাপাপুরও তার ব্যতিক্রম হবে না। আল্লাহ তাআলার চিরন্তন রীতি এটাই। স্বীকৃতি পায় মানুষের দক্ষতা, তার উচ্চ গুণ ও তার কর্ম। সে কোথাকার, কোন দেশের বা কোন এলাকার তা বিবেচ্য হয় না।

শিক্ষার্থী ভাইদেরকে বলছি যে, আপনি আপনার স্তরে স্বকীয়তা অর্জন করুন, নিজের মধ্যে অন্যের তুলনায় বিশেষত্ব সৃষ্টি করুন। আপনার দিকে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক, অঙ্গুলি নির্দেশিত হোক যে, দেখ, ছেলেটি নেপালের তালিবুল ইলম। সে নাহব ও সরফে আমাদের তালিবুল ইলম অপেক্ষা উত্তম। সে পরবর্তী পাঠ দেখে আসে এবং দরসের পরেও দরসের পাঠ বোঝার চেষ্টা করে, মুখস্থ করে। ছেলেটির যোগ্যতা বেশ ভাল। ছেলেটি মাশাআল্লাহ আরও উন্নতি করবে। এক্ষেত্রে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বিশেষত ভৌগোলিক কোন বৈশিষ্ট্য বিবেচ্য হয় না। ইমাম গায়যালীর কথাই ভাবুন। তিনি ছিলেন ইরানের। অথচ কেউ জানতই না যে, তিনি ইরানের অধিবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ বড় আলেম-বুয়ুর্গ ছিলেন বলে কারও জানা নাই। তাঁর পিতাই তো আলেম ছিলেন না। গায়যালী শব্দটিই ব্যক্ত করে যে, তাঁর পরিবারের লোকজন সুতা প্রস্তুতের কাজ করত। আরেকজন বুয়ুর্গ খাজা নকশবন্দ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁদের পরিবার চিত্রাঙ্কণের কাজ করত। এই জাতীয় উপাধি আরও অনেক বুয়ুর্গের ছিল। যেমন খাসসাফ (জুতা মেরামতকারী), যাইয়াত (তৈল বিক্রেতা), খাইয়াত (দর্জি) ইত্যাদি। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ মসজিদে হারামের একজন ইমাম ছিলেন খাইয়াত (خياط)। তাঁর পিছনে আমরা বহু নামায আদায় করেছি। ভেবে দেখুন তো, যে মসজিদ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী, যে মসজিদের ইমামতি মর্যাদা ও গর্বের বিষয়, যে মসজিদকে বলা হয়, বাইতুল্লাহ; সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন একজন খাইয়াত! বিশ্বয়ের এখানেই শেষ নয়। তিনি ছিলেন হিন্দুস্তানের অধিবাসী। সম্ভবত ভূপালের। নাম ছিল তাঁর শায়খ আবদুল্লাহ আল খাইয়াত। হিন্দুস্তানের হলেও তাঁর ইলমের কারণে তাঁকে মসজিদে হারামের ইমাম বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি। বড় বড় গ্রন্থ প্রণেতাদের নামের সাথে এরূপ উপাধির উদাহরণও কম নয়। কেউ তো হাজ্জার (পাথর ভাঙ্গার কাজ করে যে)। তাঁর সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাত হয়েছে। কুদুরী (রহ.) ছিলেন উচ্চ আইন শাস্ত্রবিদ। তাঁর লিখিত ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের গ্রন্থ মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে জরুরী কিতাবরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। তিনি মাটি দ্বারা হাঁড়ি পাতিল

বানাতেন বলে তাঁর উপাধি হয়েছে কুদুরী (قدوری) তথা হাঁড়ি-পাতিল প্রস্তুতকারী। তিনি আইন শাস্ত্রের কিতাব লিখলেন। কিতাবটি বোদ্ধাদের নিকট শুধু সমাদৃতই নয়, অপরিহার্য কিতাবরূপে বিবেচিত হল। হাঁড়ি-পাতিল প্রস্তুতকারীর লিখিত কিতাব পাঠকদের নিকট থেকে নিজের মর্যাদা আদায় করে নিল, সঙ্গে সঙ্গে লেখকের মর্যাদাও।

শিক্ষার্থী ভাইদেরকে আমি সংক্ষেপে বলছি, অতএব আপনারা মেহনত ও পরিশ্রম করুন। ইখলাস এবং ইখতেসাস সৃষ্টি করুন। নিজেও উজ্জ্বল হবেন, দেশের মুখকেও উজ্জ্বল করবেন। আপনাদের আলোর বিচ্ছুরণ ও বিকিরণ বিস্তৃতি লাভ করবে বহু দূর পর্যন্ত।

আমি এখন ঐ সকল সুধীর উদ্দেশ্যে বলছি, যাঁরা তালিবুল ইলম বা শিক্ষার্থী নয়; শুধু দ্বীনী প্রেরণা ও দ্বীনী সংশ্লিষ্টতার আশ্রয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা যে দেশের অধিবাসী সেই দেশটির অধিবাসীদের হৃদয় যদি আপনারা জয় করতে পারেন, তাদেরকে যদি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন এবং তাদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপণ করে দিতে পারেন তাহলে আপনারা শুধু ইসলামের নয় বরং মানবতার সেবক বলে বিবেচিত হবেন। কেননা দেশটি ইসলাম সম্পর্কে কখনও কিছু জানতে পারেনি। কিছুক্ষণ পূর্বে আমাদের প্রিয় এক ভাই এই দেশের যে ইতিহাস-চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে এই দেশে কাদের আবির্ভাব ঘটেছিল সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। তাতে রামজীর নাম এসেছে, বুদ্ধের নাম এসেছে, লক্ষণজীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাইয়্যেদুনা জীলানীর ন্যায় কারও আবির্ভাব ঘটেছিল বলে তাতে বলা হয়নি। এটা সহজ কোন বিষয় নয়। যাহোক কোন বুয়ুর্গের, কোন পীর-মুর্শিদের, কোন ফকীহের বা কোন মুফাসসিরের নাম না আসলে কী আসে যায়? আপনারা মেহনত করুন। আপনারা আপনাদের চরিত্র ও ক্যারেক্টার দ্বারা জীবনের এরূপ এক দৃষ্টান্ত ও আদর্শ উপস্থাপন করুন, যাতে এখানকার অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলামকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে এবং মাদরাসায় এসে ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলী ও ইসলামের শিক্ষা জানতে আগ্রহী হয়।

আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার বয়ান করেছিলাম। হলের উপস্থিত লোকজনের সামনে আমি ভারতের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। যখন ভারতের মুজাহিদ দল পেশাওয়ার জয় করল এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ কি কয়েক মাস অবস্থান করল, তখনকার ঘটনা এটি। সেই সময়ে এক পাঠান মুজাহিদ বাহিনীর এক সদস্যের হাত ধরল এবং বলল, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব,

তুমি জিজ্ঞাসাটির সঠিক জবাব দেবে। জিজ্ঞাসাটি হল, তোমাদের ভারতীয়দের দৃষ্টিশক্তি কি দুর্বল, তোমরা কি দূরে দেখতে পাও না? মুজাহিদ সদস্যটি বিস্মিত হয়ে বলল, না, আমাদের দৃষ্টিশক্তি তো দুর্বল নয়, আমরা তো দূরে খুব ভালভাবেই দেখতে পাই, যেমনটা তোমরা দেখতে পাও। পাঠানটি বলল, তোমাদের চোখে নিশ্চয়ই কোন সমস্যা আছে, নিশ্চয়ই তোমরা দূরে দেখতে পাও না। মুজাহিদ সদস্যটি অপেক্ষাকৃত আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, জনাবের এই ধারণার কারণ কী? এই জিজ্ঞাসারই বা কী কারণ? এরূপ জিজ্ঞাসা তো কেউ করে না, এটা জিজ্ঞাসার বিষয়ও নয়! পাঠান বলল, জিজ্ঞাসার কারণ হল, আমরা জানি তোমরা কয়েক মাস যাবৎ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন। এদিকে তোমরা বেশ নিরোগ ও সুঠাম দেহের অধিকারী। অথচ আমরা তোমাদের কাউকে কোন নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখি না। অথচ এখানকার নারীরা অত্যন্ত সুশ্রী, সুন্দরী, কমনীয় চেহারা ও আকর্ষণীয় দেহের অধিকারী। এদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি তো দূরের কথা চোখ তুলে তাকাতেও তোমাদেরকে দেখি না। আমরা তোমাদেরকে সব সময় নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে দেখি। মাসাধিক কাল যাবৎ স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন পুরুষের অন্তরে কামনা-বাসনা জাগ্রত হবে, তারা লোলুপ দৃষ্টিতে একজন নারীর দিকে তাকাতে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাদের কাউকে আমরা এরূপ তাকাতে দেখি না বরং নিচের দিকে তাকিয়ে সব সময় হাঁটতে দেখি। একজন দুইজন হলে না হয় কথা ছিল। মনে করতাম লোকটি নারী-বিবাগী। কিন্তু একজন দুইজন নয়, তোমাদের দলের সকলকে যখন একই রূপে দেখলাম তখন আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগল যে, এদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল কিনা। তাই তোমাকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলাম। ভারতীয় মুজাহিদ সদস্য জবাব দিল, আমাদের দৃষ্টিশক্তি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভাল আছে। আমরা দূরে খুব ভালরূপেই দেখতে পাই, স্পষ্ট দেখতে পাই। আমরা যে চোখ তুলে তাকাইনা তা আমাদের ধর্মীয় রীতি। আমরা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضًا مِّنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ঈমানওয়ালাদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। শূচিতা ও পবিত্রতার সাথে যেন তারা জীবন যাপন করে। (সূরা মুমিনুন)

ঘটনাটি শোনানোর পর উপস্থিত ছাত্রবৃন্দ ও সমাবেশের সুধীমহল যারপরনাই বিস্মিত হল। আমি সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললাম, আপনারাও এরূপ

দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হোক, এই চরিত্রের অধিকারী তারা কিভাবে হল। জিজ্ঞাসা জাগ্রত হোক, এরা ঘরবাড়ী ছেড়ে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করছে, কেউ বি. এ ক্লাসে, কেউ বি. এস. সি.-তে, কেউ এম. এস. সি.-তে লেখাপড়া করছে; ভারতে যাতায়াত ব্যয় অনেক বেশি, ফলে তারা একটানা চার বৎসর ছয় বৎসর অবস্থান করছে, এদের অনেকে আবার অবিবাহিত, এখানকার মেয়েরা অত্যন্ত সুন্দরী, বহির্বিশ্বের সকলেই এদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, অথচ এই শিক্ষার্থীরা এদের দিকে ফিরেও তাকায় না, কারণ কী? এই জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হোক। অতঃপর তারা জানুক যে, ইসলামের কল্যাণেই, ইসলামের ফয়েজ ও বরকতেই এ সকল ছাত্র এরূপ আদর্শবান, এরূপ উচ্চ চরিত্রের অধিকারী। তারা বুঝুক যে, এটা ইসলামের শিক্ষার ফসল।

আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনারা এই শহরে চলুন ফিরুন, জীবন যাপন করুন, দোকান খুলুন, চাকুরী করুন, অমুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশা করুন। তাদের থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনারা নিজের স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা প্রমাণ করুন। নেপালের এই ভূখণ্ডে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হোক, ‘এরা কারা? এরা কোনরূপ অসতর্ক, অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে না। এরা চাকুরী করে অত্যন্ত আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এরা অসহায় লোকদেরকে সাহায্য করে। সম্পদহীন ও দুর্বলদের প্রতি এরা কখনও কোনরূপ জুলুম করে না। এরা কারা? আপনাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা এই ভূখণ্ডে এরূপ জিজ্ঞাসা আপনাদের জাগ্রত করতে হবে।

এরপরে আপনাদের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাত হবে এবং কথা বলা ও শোনার সুযোগ হবে বলে আমার আশা নেই। হলেও কবে হবে তা আমার জানা নেই। তাই এই দুই তিনটি কথা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি। প্রথম কথা তো এই যে, আপনারা নিজেদের জীবনের এরূপ চিত্র অঙ্কণ করুন, নিজেদের জীবন যাপন প্রণালীকে এমনভাবে গড়ুন, যাতে মানুষের মাঝে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় যে, এই সকল লোকের মধ্যে এরূপ আদর্শ কোথা থেকে এল, তারা এই জীবন পদ্ধতি কোথায় পেল? এই বিষয়টিই তো ইন্দোনেশিয়ার সকল অধিবাসীকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে। দেশের সকল অধিবাসী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইন্দোনেশিয়ায় কখনও মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমন ঘটেনি। এটা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু আরব বণিকদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সে দেশের অধিবাসীরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সারা দেশ একশ

ভাগ মুসলমানের দেশে পরিণত হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে কিছু কিছু এলাকায় খ্রিস্টান ধর্ম কিছুটা প্রসার লাভ করছে। এর জন্য দায়ী কিছুটা মুসলমানদের চারিত্রিক ও ধর্মীয় অবনতি ও অবক্ষয়, কিছুটা প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি আর কিছুটা আমেরিকা ও ব্রিটেনের ষড়যন্ত্র। যা হোক, বলছিলাম যে- আপনারা আপনাদের চরিত্র, ঈমান, সততা ও আচার-আচরণ মাধুর্য দ্বারা প্রমাণ করুন যে, আপনারা অন্যদের তুলনায় ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন মডেল, ভিন্ন দৃষ্টান্ত, ভিন্ন কিছু।

মক্তব ও মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় কথা হল, মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করুন। কোন গ্রাম, কোন মহল্লা যেন এরূপ না থাকে যেখানে কোন মাদরাসা বা মক্তব নেই, যেখানে দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

স্ত্রী, কন্যা, জায়াদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দিন এবং নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজ সন্তানদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দান করে, তাদেরকে পয়গম্বরদের কাহিনী শোনায়। বাচ্চাদের অন্তরে যেন তারা তাওহীদের বীজ বপণ করে, তাদের অন্তরে তাওহীদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে। শিরকের প্রতি তাদের অন্তরে যেন তারা ঘৃণার সৃষ্টি করে। বদ চরিত্রের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে, তাদের অন্তরে রাসুলের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার শিক্ষা দান করে। তবেই এখানে নতুন প্রজন্মের ঈমান ও ইসলাম হেফাযতে থাকবে, সুরক্ষিত থাকবে। অন্যথায় কী হবে তা কল্পনা করাও কষ্টের ও বেদনার।

তৃতীয় কথা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি এই যে, বিয়ে-শাদীতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান, ধুমধাম ও অপব্যয় করবেন না। আমাদের দেশ ভারতে সম্প্রতি এই বিপদ দৃষ্ট হচ্ছে। গতকালই ভাগলপুরে হাজার হাজার মানুষের এক সমাবেশে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি। সেই সমাবেশে বড় বড় আলেমগণও বক্তৃতা করেছেন। এর পূর্বে মুংগেরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল। কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশ সহ বিভিন্ন স্থানের উলামা হযরাত সেখানে তাকরীফ এনেছিলেন। তো ভারতে বর্তমানে এক বড় বিপদ এই দেখা যাচ্ছে যে, সেখানকার বিয়ে-শাদীতে প্রচুর অপব্যয় করা হয়। বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে বর যাত্রা করে, কনের বাড়িতে মহা ধুমধাম হয়, প্রচুর অপব্যয় করা হয়। আরেকটি বড় বিপদ বরং বলা চলে বড় আযাব ও গযব হল বরপক্ষের দাবি-দাওয়া। বরপক্ষ কনে পক্ষের নিকট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া করে থাকে। যেমন কনেকে এই পরিমাণ স্বর্ণালংকার দিতে হবে, এই এই আসবাবপত্র ও

তৈজসপত্র দিতে হবে, মোটর গাড়ী দিতে হবে ইত্যাদি। এগুলো দিতে রাজী হলে বরপক্ষ বিয়েতে রাজী হয়, নতুবা বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমি আশা করব, আপনাদের এখানে এমনটি হবে না। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

নিজের দ্বীনের মূল্যায়ন করুন

সবশেষ কথা হল, আপনারা নিজ দ্বীনের মূল্যায়ন করবেন। দ্বীনকে সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত বলে গণ্য করবেন। নামাযের পাবন্দী করবেন। কালিমার অর্থ শিখবেন, বুঝবেন। কিছু সূরা মুখস্থ করে নিবেন। সূরাগুলোর অর্থ বুঝে নিবেন এবং সম্ভব হলে তা মুখস্থ করে নিবেন। দ্বীনের জরুরী বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের আশ্রয় আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। আপনারা মাদরাসাগুলোতে যাবেন। গ্রামে গ্রামে মাদরাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করবেন।

সারকথা, আপনারা অধিকাংশ সময় দ্বীন ও ঈমানের ফিকির করবেন। ইসলামের উপর অটল থাকতে এবং মৃত্যু যেন ঈমানের সাথে হয় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, সঙ্গে তার জন্য দুআও করবেন।

কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

ولا تموتن الا وانتم مسلمون

‘তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’

তোমাদের মৃত্যু যেন হয় ইসলামের উপর অটল থাকা অবস্থায়। ইসলামের সম্পদ হস্তগত হওয়াই সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত, সর্বাপেক্ষা বড় সৌভাগ্য। ইসলামই সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ। ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা, আল্লাহর রাসুলের শাফাআত লাভ করা, তাঁর হাতে কাউছারের পেয়ালা পান করা এবং জান্নাতের উপযোগী বলে বিবেচিত হওয়াই সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত, বড় সম্পদ, সর্বাপেক্ষা বড় সফলতা। সুতরাং নিজ ঈমান ও ইসলামের হেফাজত করুন, এতে অবিচল থাকুন।

আমি এই কথা বলেই আমার কথা শেষ করছি এবং আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আপনারা মাদরাসাগুলোর মূল্যায়ন করবেন। মাদরাসায় লেখাপড়া করে ছাত্ররা আলেম হয় এবং অন্যত্র চলে যায়। সেখানে তারা মর্যাদা লাভ করে। এটা আপনাদের গর্বের বিষয়। মাশাআল্লাহ মাদরাসাগুলোতে শিক্ষাসমাপনকারী আলেমগণ আপনাদের জন্য দেশের নাম উজ্জ্বল করে, দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। বিষয়টির মূল্যায়ন করবেন এবং এই সমস্ত মাদরাসার প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করবেন। এই মাদরাসায় এখনো অনেক নির্মাণ কাজের

প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আপনারা সহায়তা করবেন। যে মাদরাসায় যে প্রয়োজন দেখা দেয় সেই প্রয়োজন মেটানোর পিছনে অর্থ ব্যয় করবেন। ছাত্রদেরকে ভাতা দানের ব্যবস্থা করবেন, তাদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করবেন। এটা আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এর মূল্য কতটুকু, কিয়ামতের দিন আপনারা তা বুঝবেন। আপনার সহায়তায় একজন তালেবে ইলম আল্লাহ ও তাঁর নাম শিখতে পারল, শুধু তাই নয় অন্যকে শেখানোর যোগ্যতা সে অর্জন করতে পারল— এর চেয়ে বড় সদকায়ে জারিয়া আর কী হতে পারে?

এই কয়েকটি কথা বলেই আমি শেষ করছি। কথাগুলোর উপর আমল করবেন।

অবশেষে আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং আমার আনন্দ প্রকাশ করছি যে, মাদরাসাটিকে আমি যতটুকু কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেখতে পেলাম। আমি আরও বেশি আনন্দিত হতাম যদি আমি এখানে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারতাম। কিন্তু বিশেষ কারণ বশত এখানে বেশি সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে আল্লাহর শোকর যে, আমি নিজেই ব্যয়ন করতে চেয়েছি এবং করেও ফেলেছি। অথচ আমার শারীরিক অবস্থার দাবি অনুযায়ী আমার বলার কথা ছিল, ভাই! আমি কোন কথা বলতে পারব না। আমাকে বিশ্রাম করতে দাও, আমি কাল সকালে যাব। কিন্তু আপনাদের নিখাদ ভালবাসা আপনাদের ইখলাস এবং নেপালে আমন্ত্রণকারীদের ইখলাসের বরকত ছিল এটা। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বললাম যে, কোন মজলিস করা যদি সম্ভব হয়, করে ফেল। আবার কবে আসা হয় না হয়, কবে সাক্ষাত লাভের সুযোগ হয় বা না হয় তার তো ঠিক নেই। কেননা নিজের দ্বীনী ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাত, তাঁদেরকে নিজ চোখে দেখা, তাদের সামনে কিছু কথা বলা ও শোনা— এই সবকিছু আল্লাহর নেয়ামত। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, সে কাজটি হয়ে গেল। এর চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই, চাওয়ার নেই। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন।

وما التوفيق الا من عند الله

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

উলামায়ে রব্বানী

তাদের মর্যাদা ও কর্মধারা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - أَمَّا بَعْدُ!
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী, তাদের জানশীন

হক্কানী আলেমগণ আখিয়া আলাহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের উত্তরাধিকারী এবং জানশীন। আলেমগণের জন্য নবীগণের উত্তরাধিকারিত্ব ও স্থলাভিষিক্ততা শুদ্ধতা ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে তখনই যখন তাদের জীবনের মাকসাদ ও লক্ষ্য, তাদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হবে তা-ই যা আখিয়া কেরামের ছিল। জীবনের সেই মাকসাদ ও লক্ষ্য-প্রচেষ্টা ও সাধনার সেই কেন্দ্রবিন্দুটি কী ছিল? দুই শব্দে তা বলা যায় যে, তা হল ইকামতে দ্বীন। এক শব্দে বলা যায় ‘তাওহীদ’। অর্থাৎ মানুষ যেমন কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তাআলার দাস তদ্রূপ তাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তাঁর দাস বানিয়ে দেওয়া। মানুষের হৃদয় ও শরীরে এবং তৎসংশ্লিষ্ট ভূমিতে আল্লাহ তাআলার শাসন ও বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা করা, যেমনটা তা প্রতিষ্ঠিত আছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে। ইরশাদ হচ্ছে—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

‘তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।’ (সূরা সাফ ৬১ : ৯)

প্রতি যুগেই এই হক দ্বীনের কিছু প্রতিপক্ষ ও প্রতিবন্ধক থাকে। সেগুলোর অধিকাংশই চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

এক. শিরক।

দুই. কুফর।

তিন. জাহেলিয়াত।

চার. বিদআত।

শিরক কী?

এক. শিরক। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে ইলাহ বানিয়ে নেওয়া। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত গুণের উর্ধ্বে অন্য কোন উপকারিত্ব গুণ আরোপ করা, তার প্রকৃতিজাত গুণের উর্ধ্বে তাকে উপকারী মনে করা, বিশ্বজগতে তার কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতা, কোনরূপ প্রভাব বিস্তারী ক্ষমতা মেনে নেওয়া। অতঃপর ঐ বস্তুর প্রতি নিজের অভাব প্রকাশ করা, তার মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করা, তাকে ভয় করণ কিংবা তার নিকট প্রত্যাশা রাখা—এসব ঐ বিশ্বাসেরই অনিবার্য ও স্বাভাবিক ফল। আর তার নিকট প্রার্থনা করা, তার সহায়তা কামনা করা, তার প্রতি বিনীত ও নতশির হওয়া, তার উপাসনা করা ইত্যাদি এই বিশ্বাসের অনিবার্য প্রকাশ।

শিরক একটি স্বতন্ত্র দীন, একটি পরিপূর্ণ ভিন্ন শাসন। অতএব একই শরীরে, একই মন ও মস্তিষ্কে, একই বিচরণ ভূমিতে একই সাথে দ্বীনে হক ও শিরকের অবস্থান ও বিচরণ অসম্ভব। এই শিরক ও গায়রে ইলাহী দ্বীন শরীর ও মনের এবং শরীর ও মনের বাইরের ততটুকু স্থানই দখল করে নেয় দ্বীনে হকের জন্য কমপক্ষে যতটুকু জায়গার প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

কোন কোন মানুষ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। (সূরা বাকারা ১৬৫)

আরও বলেন—

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। (সূরা শুআরা ৯৬-৯৭)

এই কারণে পৃথিবীর বুক থেকে শিরকের সকল শেকড় এবং তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা পর্যন্ত যতদিন না উপড়ে ফেলা হবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার দ্বীনের চারা রোপণ করা যেতে পারে না। কারণ তাঁর দ্বীনের চারা এরূপ কোন মাটিতে শেকড় গাড়াতে পারে না যে মাটিতে অন্য কোন বিষ বৃক্ষের শেকড় প্রোথিত থাকে বা অন্য কোন বীজ বপিত থাকে। এই দ্বীনের ডালপালা তখনই আকাশ স্পর্শ করে, তখনই এই দ্বীন-বৃক্ষ ফল ও ফুলে সুশোভিত ও সুপল্লবিত হয় যখন তার শেকড় মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়।

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت
وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها

‘তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? পবিত্র বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যা সব সময় ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।’ (সূরা ইবরাহীম ২৪-২৫)

এই দ্বীন-বৃক্ষ অন্য কোন বৃক্ষের বর্তমানে বৃদ্ধি পেতে পারে না। যেখানে সে থাকবে একাই থাকবে। তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টতার জন্য প্রয়োজন সীমাহীন উন্মুক্ত জায়গার।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

‘জেনে রাখ অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।’ (সূরা যুমার ৩)

দুই. জাহেলিয়াত

অতএব আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মেজায় ও প্রকৃতি সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল তারা এই দ্বীনকে কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রথমে তাঁরা সেই জায়গাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দ্বীন-বৃক্ষ রোপনের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে নেন। তাঁরা শিরক ও জাহেলিয়াতের শেকড় তুলে তুলে করে তাল্লাশ করে উপড়ে ফেলেন, শিরক ও জাহেলিয়াতের প্রতিটি শিরা-উপশিরা খুঁজে খুঁজে বের করেন এবং গোছা বানিয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেন এবং মাটিকে সম্পূর্ণ উল্টে পাণ্টে দেন তাতে তাঁদের সময় যতই লাগুক এবং এই কাজ করতে তাঁদের যত কষ্টই হোক এবং তাদের আজীবনের কঠোর মেহনত ও পরিশ্রমের ফসল হযরত নুহ (আ.)-এর ন্যায় কয়েকজন মাত্র ব্যক্তি হোক না কেন বা কিছু কিছু পয়গম্বরের ন্যায় তাঁদের সারা জীবনের পুঁজি একজন ব্যক্তিই হোক না কেন। তাঁরা মেহনত ও কঠোর পরিশ্রম

চালিয়ে যেতেন। তাতে ফল যাই হোক তাঁতেই তারা সন্তুষ্ট থাকতেন, মেহনত ও পরিশ্রমকেই সফলতা মনে করতেন, ধৈর্যহারা কখনও হতেন না।

কুফর হল, আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর শরীয়তকে অস্বীকার করা, তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিমুখ হওয়া। এসব যে কোন ভাবেই, যে কোন নিদর্শন দ্বারাই প্রকাশ পাক তাতে ব্যক্তি কাফের বলে গণ্য হবে।

যারা কোন বিধানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান জানা সত্ত্বেও মানে না, অথবা মুখে অস্বীকার না করলেও কার্যত তার বিরোধিতা করে তারা শরীয়তের অন্যান্য বিধানাবলী মান্যকারী হলেও কাফের বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেন-

اَفْتَوٰمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে লাঞ্ছনা, আর কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিষ্কিণ্ড হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সন্ধ্যাে অনবহিত নন।’ (সূরা বাকারা ৮৫)

আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব, তাঁর শাসন ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারাই শাসন ও কর্তৃত্বের দাবিদার অন্য সকলের শাসন ও কর্তৃত্বের, তাদের প্রভুত্বের অস্বীকার অনিবার্যরূপেই হয়ে যায়। কিন্তু যারা বাতিল খোদার প্রভুত্ব ও শাসনকে সরাসরি অস্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, অন্য কথায়- যারা এই কিবলার দিকে তো মুখ করেছে কিন্তু অন্য কিবলার দিকে পিঠ দিতে রাজী নয়, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াতে আর যেসব জীবনব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং আল্লাহ তাআলার শরীয়তের বিধি-বিধানের মোকাবেলায় অন্য যেসব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন প্রচলিত আছে তার প্রতিও যার সমর্থন অবশিষ্ট আছে, যে এসব আইন-কানুনকে আল্লাহর দ্বীনের আইন-কানুনের মোকাবেলায় গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত নয়।

ঈমান বিল্লাহ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের যথার্থতার জন্য কুফর বিত তাগূত তথা গায়রুল্লাহকে অস্বীকার করা জরুরী। আল্লাহ তাআলা ঈমান বিল্লাহর পূর্বে কুফর বিত তাগূতের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন-

فَمَنْ يَكْفُرِ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

‘যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহে ঈমান আনে সে মজবুত হাতল ধরে ফেলে।’ (সূরা বাকারা ২৫৬)

এই কারণে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানাবলী ও আইন-কানুন ব্যতীত অন্য কোন আইন-কানুনের দিকে, অন্য কোন মতবাদের দিকে ধাবিত হয়, কুরআন তার ঈমানের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:-

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায় যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উহাকে প্রত্যাখ্যান করতে এবং শয়তান চায় তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে?’ (সূরা নিসা ৪ : ৬০)

কুফরের গন্ধ থেকে তারাও বের হয়ে আসতে পারে না, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস ও জাহেলী রীতি-নীতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করতে না পারে। জাহেলিয়াত যেগুলোকে মন্দ বলে, জাহেলিয়াত যে বিষয়গুলোকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে সেগুলোর প্রতি যাদের অন্তরে এখনো ঘৃণা ও তাজিল্য বিদ্যমান, যদিও তা আল্লাহ তাআলার দ্বীনে ভাল ও কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয় এবং যদিও তা হয় রাসুলের প্রিয় সুনাত। তদ্রূপ, যাদের অন্তর থেকে জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতি প্রীতি এখনও বিদূরিত হয়নি যদিও সেসব আল্লাহ তাআলার নিকট অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত। তদ্রূপ যাদের অন্তর থেকে জাহেলী গোত্র-প্রীতি, সম্প্রদায়-প্রীতি বিদূরিত হয়নি, যারা সর্বাবস্থায় নিজ গোত্রের, নিজ বংশের ও আত্মীয়ের পক্ষাবলম্বন করে, যদিও তা অন্যায় পক্ষাবলম্বন হোক না কেন। এর চেয়ে দুঃখজনক ও ভয়াবহ বিষয় হল, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যারা কল্যাণ ও অকল্যাণের, সুন্দর ও অসুন্দরের জাহেলী মাপকাঠিকেই এসবের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করে। জীবনোপকরণের মূল্যায়ন তারা ঐভাবেই করে যেভাবে তা মূল্যায়িত হত জাহেলিয়াতে। জীবন মানের ঐ স্তর যাদের নিকট মর্যাদাপূর্ণ যে স্তর মর্যাদাপূর্ণ ছিল জাহেলিয়াতে।

ব্যক্তির ইসলাম বিশ্বুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে তখনই, যখন কুফর ও কুফরের চতুর্পাশ্বস্থ বিষয়াদি, কুফর সংশ্লিষ্ট বিষয়সকল এবং কুফরের সকল রীতি-নীতি ও আচারের প্রতি তার অন্তরে সৃষ্টি হবে তীব্র ঘৃণার এবং কুফরে প্রত্যাবর্তনের কল্পনাও হবে তার জন্য কষ্টকর। তার ঈমানের দৃঢ়তা প্রমাণিত হবে তখন, যখন সে সাধারণ কোন কুফরী কর্মের মোকাবেলায়ও নিজের মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করবে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে—

ثَلَاثٌ مَنْ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَكُفِّرَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّارِ

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের মিষ্টতার স্বাদ লাভ করতে পারবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত যা কিছু আছে সবকিছু অপেক্ষা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অধিক প্রিয় হওয়া, অপরকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং কুফরে প্রত্যাবর্তন তার নিকট অপছন্দনীয় হওয়া, যে রূপ আগুনে নিষ্কণ্ট হওয়াকে সে অপছন্দ করে।

সাহাবায়ে কেরাম এইরূপই ছিলেন। তাঁরা জাহেলী যুগ অপেক্ষা আর কোন কিছুকেই এত ঘৃণিত মনে করতেন না। তাঁরা তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব যুগকে যখন স্মরণ করতেন তখন অত্যন্ত ঘৃণা এবং লজ্জার সাথে স্মরণ করতেন। প্রাক-ইসলামী যুগীয় চরিত্র ও কর্ম, কুফর ও ফিসক এবং আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি তাদের অন্তরে শুধু বুদ্ধিজাত ঘৃণা নয় বরং হৃদয়-উৎসারিত আন্তরিক ঘৃণা বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এই গুণকে এইভাবে বর্ণনা করেন—

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الْيَكْمِ الْإِيمَانِ وَزِينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

‘কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে করেছেন প্রিয় এবং উহাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়।’ (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৭)

জাহেলিয়াতের একটি নিদর্শন হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান শুনানো হলে প্রাচীন রীতি-নীতি এবং পূর্ব পুরুষের আচার উল্লেখ করা হয় আর আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলের মোকাবেলায় প্রাচীন রীতি-নীতির দলিল পেশ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفِينَا عَلَيْهِ
إِبَاءًا أُولُو كَأَن أَبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

‘যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর’, তারা বলে, ‘না, বরং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব।’ এমনকি তাদের পিতৃপুরুষেরা যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপি?’ (সূরা বাকারা ২ : ১৭০)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

‘বরং তারা বলে, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।’

(সূরা যুখরুফ ৪৩ : ২২)

আল্লাহ তাআলার ওহী ও নির্দেশের বিপরীতে নিজের পূর্বপুরুষদের কর্মধারার অনুসরণ এবং নিজের চাহিদা ও প্রবৃত্তি, নিজের মর্জি মোতাবেক চলা বিশেষ এক জাহেলী চিন্তা, জাহেলী দ্বীন।

قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُكَ تَامِرُكَ إِن نَّتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاءُنَا وَإِن نَّفْعَلْ فِى
أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

‘তারা বলল, হে শুআইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার ইবাদত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা ইচ্ছা তাই করি তাও?’

(সূরা হুদ ১১ : ৮৭)

তো যারা আল্লাহর বিপরীতে অন্যসব কিছুকে পরিত্যাগ করে না, সবকিছুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ন্যস্ত করে না, তারা জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করেছে বলে বলা যায় না। এই পরিপূর্ণ পরিত্যাগ এবং পরিপূর্ণ সমর্পণই ইসলাম। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যার নির্দেশ দান করেছিলেন।

اِذْ قَالَ لَهُ اسْلِمْ قَالَ اسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

‘তাঁর প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন আত্মসমর্পণ কর সে বলেছিল, ‘আমি আত্মসমর্পণ করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট।’ (সূরা বাকারা ২ : ১৩১)

فَالِهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ اسْلِمُوا

‘তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর।’

(সূরা হাজ্জ ২২ : ৩৪)

এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও পরিপূর্ণ আনুগত্য যদি না হয়, তবে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। এই কারণেই পরিপূর্ণ ইসলাম ও আনুগত্যকে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর সঙ্গে সিলম বা সন্ধি বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাঙ্গিকভাবে ইসলাম ও সন্ধিতে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’

(সূরা বাকারা ২ : ২০৮)

স্মর্তব্য যে, জাহেলিয়াত বলে শুধু আরবের প্রাক-ইসলামী যুগের জীবনকেই বোঝানো হচ্ছে না বরং জাহেলিয়াত হল ঐ সকল জীবন ও জীবনব্যবস্থা, যার উৎস ওহী, নবুওয়াত, আল্লাহর কিতাব ও নববী আদর্শ ব্যতীত অন্য কিছু হয় এবং যা ইসলামের বিধি-বিধান ও আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়— চাই তা আরবের জাহেলিয়াত হোক কিংবা ইরানের মজুসিয়াত হোক কিংবা হোক ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদ অথবা মিসরের ফেরাউনী মতবাদ অথবা তুরস্কের মতাদর্শ কিংবা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও জীবনাচার এবং চাই তা প্রাচীন হোক অথবা আধুনিক।

কুফর শুধু এক নেতিবাচক বিষয়ই নয়; বরং তা ইতিবাচক এক মতাদর্শের নাম। কুফর শুধু আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে অস্বীকার করার নাম নয় বরং তা একটি স্বতন্ত্র ধর্মাদর্শ, স্বতন্ত্র জীবনাচারের নাম। যে আদর্শ ও জীবনাচারে অবশ্য পালনীয়, অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ও বিদ্যমান। এ কারণে কুফর ও ইসলামের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। কোন ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে এতদুভয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও অনুগত থাকা অসম্ভব।

নবীগণ কুফরকে সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত করেন। কুফরের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতাকে বা পার্শ্ব অবস্থানকে কোনভাবেই তাঁরা বরদাশত করেননি। কুফরকে চেনার ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতা প্রশংসিত। তাঁরা অত্যন্ত দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী হন। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও দৃঢ়তা দান করেছেন। ফলে তাঁদের আল্লাহ প্রদত্ত দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করা ব্যতীত মানুষের জন্য অন্য কোন উপায় নেই।

দ্বীন ইসলাম মানুষের জন্য ইসলাম ও কুফরের যে বিভেদ রেখা ব্যক্ত করেছে তার সুরক্ষা ব্যতীত দ্বীনের হেফাযত ও সুরক্ষা সম্ভব নয়। এতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য কি সামান্যতম অবহেলা দ্বীনকে এতটাই বিকৃত করে ফেলতে পারে যতটা বিকৃত হয়ে গেছে ইয়াহুদী ধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম এবং ভারতীয় বৈদিক ধর্ম।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সার্বক উত্তরসূরী যারা, তাঁরাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অধিকারী হন। তাঁরা কুফরের প্রত্যেকটি নিদর্শনকে চিহ্নিত করত তা নিশ্চিহ্ন করেন, জাহেলিয়াতের একেকটি দাগ তাঁরা চিহ্নিত করেন এবং তাকে ধুয়ে-মুছে ফেলেন। কুফর চেনার ক্ষেত্রে সাধারণ লোক অপেক্ষা তাদের মস্তিষ্ক ও উপলব্ধি শক্তি অধিক জাগ্রত ও শক্তিশালী হয়। কুফর যে পোশাকেই, যে রূপ ধারণ করেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন তারা ঠিক তাকে চিনে ফেলেন এবং তার বিরোধিতায় তাঁরা কোমর বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হন।

কখনও দেখা যায় যে, ভারতের ন্যায় কোন রাষ্ট্রে বিধবা বিবাহকে অবৈধ জ্ঞান করা এবং বিধবা বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখার মধ্যে তাঁরা কুফরীর গন্ধ পান আর বিধবা বিবাহের প্রচলন দান এবং এই সুন্যাতকে যিন্দাকরণের জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লাগেন, কখনও কখনও তাঁরা এর জন্য জীবনবাজী রেখেও কাজ করেন।

কখনও দেখা যায় যে, শরীয়তের বিধি-বিধানের উপর প্রথা ও সংস্কারকে প্রাধান্য দান করাকে এবং বোনকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করাকে তাঁরা কুফরী বলে গণ্য করেন আর এইসব লোকের বিরোধিতা করাকে এবং তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে তাঁরা ফরয বলে গণ্য করেন।

কখনও দেখা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা স্পষ্টভাবে শোনার পরও তা অমান্য করা এবং মানবসৃষ্ট আদালত ও মানব রচিত আইন-কানুনের আশ্রয় নেওয়া এবং অনৈসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করাকে তাঁরা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হওয়ার সমার্থক বলে মনে করেন। ফলে তাঁরা নেহায়েত অপারগতাবশত দেশত্যাগ করেন, অন্য দেশে হিজরত করে চলে যান।

কখনও দেখা যায় যে, কোন নও-মুসলিম কিংবা হিন্দুদের সঙ্গলাভকারী মুসলমানের গরুর গোশত পরিহার করে চলাকে, গরুর গোশতে তাদের ঘৃণার উদ্বেক হওয়াকে তাঁরা ঈমানের দুর্বলতা বা পূর্বধর্ম বা অমুসলিমদের সাথে মেলামেশার প্রতিফল বলে মনে করেন এবং সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা একটি সুন্নত অথবা মুবাহ বা মুস্তাহাব কর্মকেও ওয়াজিব বলে ফতোয়া দেন, ইসলামের নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করেন। তাঁদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণে উচ্চারিত হয়—

“ذبح بقرد وهندوستان از اعظم شعائر اسلام است”

‘অর্থাৎ ভারতে গরু যবেহ করা ইসলামের একটি বড় শিআর ও নিদর্শন।’

তাঁরা অমুসলিম রীতি-নীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বনে প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন এবং অমুসলিমদের ঘরোয়া অনুষ্ঠানাদিতেও অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

মোটকথা কুফর কি কুফর-প্রীতি কি কুফর সহায়ক কোন কিছু যে রূপ ও যে পোশাকেই প্রকাশিত হোক না কেন তাঁরা অতি দ্রুত ও যথাসময়ে তা চিনে ফেলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের কোন সন্দেহ ও সংশয় থাকে না এবং তা প্রতিরোধে কোন অজুহাতই, কোন বিশেষ কারণই তাদের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কুফরের উদ্দেশে তাঁরা বলেন—

بهر رنگ خوانی که جامدی پوش - من اندازد رت را می شام

তাঁদের যুগের যে সকল নির্বোধ ও অর্বাচীনরা কাবা, গীর্জা আর মন্দিরের মাঝে পার্থক্য করে না, পার্থক্য করাকে কূপমণ্ডকতা বলে মনে করে, তারা তাঁদেরকে পণ্ডিত, পরহেজগার, আল্লাহর সৈনিক ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ করে থাকে। কিন্তু তাঁরা এসব ব্যঙ্গ ও উপহাসকে উপেক্ষা করে আপন কাজে নিমগ্ন থাকেন, ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে নিরলস মেহনত করে যান।

সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক যুগে এই জাতীয় ব্যক্তিগণই আল্লাহর দ্বীনের হেফাযতের কাজ করে গেছেন। তাঁদের সাহসী পদক্ষেপ, দৃঢ় অবস্থান ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনতের কারণেই ইসলাম আজও ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ও হিন্দুধর্মসহ যাবতীয় ধর্মের সাথে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রেখে স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত আছে তাঁদেরই দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ফলে।

جزاهم الله عن الاسلام ووليه ونبيه خير الجزاء

আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ইসলাম ও মুসলমান ও ইসলামের নবীর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বিদআত কী?

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে বিষয়ের নির্দেশ দান করেননি, যে বিষয়কে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে সাব্যস্ত করেননি এরূপ বিষয়কে দ্বীনের অংশ বানিয়ে নেওয়া, দ্বীনী বিষয় বলে সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং তা সওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পালন করার নাম বিদআত। তদ্রূপ কোন ইবাদতে নিজেদের মনগড়া নিয়ম ও রীতি-প্রথাকে শরয়ী নির্দেশের ন্যায় মান্য করাও বিদআত।

শিরক ও কুফর যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে, যদি স্বতন্ত্র ও পৃথক এক ধর্ম হয়ে থাকে তবে বিদআত হল স্বতন্ত্র এক শরীয়ত, যার রচয়িতা ও প্রণেতা মানুষ। শিরক ও কুফরের সাথে ইসলামের পার্থক্য থাকে সুস্পষ্ট। কারণ তা ইসলাম বহির্ভূত বিষয়। আর বিদআত ইসলামের অভ্যন্তরীণ শত্রু। ইলাহী দ্বীনের অভ্যন্তরে মানব রচিত শরীয়তী রূপ, যা ভিতরে ভিতরে জন্ম ও বৃদ্ধি লাভ করে। এমনকি তাকে যদি স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয়, তাহলে তা কখনো কখনো মূল শরীয়ত অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে শরীয়তে ইলাহীর সমস্ত স্থান ও মানুষের জীবনের সমস্ত সময়টা দখল করে নেয়।

এই শরীয়তের আইনশাস্ত্র স্বতন্ত্র। এর সুন্নাহ, মুস্তাহাব, ফরয, ওয়াজিব সবকিছু হয় স্বতন্ত্র, শরীয়তে ইলাহী হতে ভিন্ন। বিদআত সর্বপ্রথম আঘাত হানে এই মূলনীতিতে যে, আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। কোন কিছুকে আইনের মর্যাদা দান এবং তা পালন ও মান্য করাকে জরুরী সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। মানব কর্তৃক আইন রচনা, কোন কিছুকে আইনের মর্যাদা দান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার এই অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। এই কারণেই আইন প্রণয়নকারী মানুষকে কুরআনুল কারীম তাগূত নামে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন বলেছে—

يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

‘তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করতে।’

এটা তো সাধারণ আইন রচনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু এতদপেক্ষা আরও গর্হিত হল বিদআত তথা কোন কিছুকে দ্বীন ও শরীয়ত বলে সাব্যস্ত করা এবং

নির্দিষ্ট রূপ ও নিয়ম-নীতিতে তা পালন করাকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সওয়াব লাভের উপায় বলে মনে করা। কারণ এটা তো শরীয়ত রচনার নামান্তর। আর কুরআন বলে দ্বীন ও শরীয়ত রচনা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

‘তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন ঐ দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি তোমাকে ওহী করেছি।’ (সূরা শূরা ৪২ : ১৩)

মক্কার কাফেররা যখন নিজেদের পক্ষ থেকে হালাল-হারাম সাব্যস্ত করণের পথ অবলম্বন করল তখন কুরআন তাদের প্রতি এই নিন্দাবাদই ব্যক্ত করেছে।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

‘তাদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই?’ (সূরা শূরা ৪২ : ২১)

আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত এই আইন প্রণয়নটি কী ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ শুনুন।

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزَعِمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حَرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ - وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

‘তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এইসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত আর কেউ এসব আহার করতে পারবে না এবং কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ এবং কতক পশু যবেহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে; এই মিথ্যা রচনার শাস্তি আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই দিবেন।’ (সূরা আনআম ৬ : ১৩৮)

তারা আরও বলে এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ। আর যদি তা মৃত হয় তবে সকলেই তাতে অংশীদার। তিনি তাদের এইরূপ বলার শাস্তি অচিরেই তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা আনআম ৬ : ১৩৯)

আরবের এই আইন প্রণেতাদের অপরাধ কী ছিল, যে অপরাধকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা ও মিথ্যা আরোপ বলে অভিহিত করা হয়েছে? তা তো ছিল এটাই যে, তারা কোন আসমানী কিতাবের দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকে শুধু নিজেদের মত অনুযায়ী একটা জিনিসকে একজনের জন্য হালাল আর অপরের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছে। আর এক্ষেত্রে তারা এমন কিছু বিধি-বিধান ও আইন-কানুন ও মূলনীতি নির্দিষ্ট করেছে, যার পক্ষে কোন আসমানী কিতাবের দলিল ও সমর্থন ছিল না। অতঃপর ঐসব আইন-কানুন ও মূলনীতি মান্য করাকে তারা নিজেদের জন্য এবং অপরের জন্যও এমনভাবে অপরিহার্য করে দিয়েছে যে রূপ নবীগণের শরীয়ত ও আইন-কানুন মান্য করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। আল্লাহর শরীয়ত অমান্যকারীদেরকে যে রূপ অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য বলে মনে করা হয়, তাদের প্রণীত আইন-কানুন অমান্যকারীদেরকেও তারা ঐরূপ অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য বলে মনে করত।

ইমাম মালেক (রহ.) চমৎকার বলেছেন—

من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله

عليه وسلم خان الرسالة فان الله سبحانه يقول

"الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون

اليوم دينا

‘যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদআতের প্রচলন ঘটায় এবং সেটাকে ভাল বলে জ্ঞান করে প্রকারান্তরে সে যেন দাবি করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন, ত্রুটি করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন— আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। অতএব রাসূলের জীবদ্দশায় যা দ্বীনের অংশ ছিল না তা আজও দ্বীনের অংশ হতে পারে না।’

শরীয়তে ইসলামীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, তার সর্বকালীনতা, সর্বকালেই তার আমলযোগ্য হওয়া। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাবান। তিনি মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা, তাদের কল্যাণ, অকল্যাণ তাদের নানাবিধ পরিবেশ ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দয়ালু, অনুগ্রহশীল। তাঁর সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান ও অসীম দয়ার ভিত্তিতে তিনি তাঁর নবীগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে শরীয়ত ও

বিধি-বিধান দান করেছেন তা অত্যন্ত সহজ ও সরল, সর্বাবস্থায় মানুষের জন্য যা আমলযোগ্য। শরীয়তের বিধি-বিধান বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের মানবীয় দুর্বলতা, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন। তাদের শক্তি ও সামর্থ্য, কাল ও পরিবেশের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে তিনি তাদের জন্য এক সর্বজনীন ও সর্বকালীন, চিরন্তন ও শাস্ত বিধান দান করেছেন। তিনি বলেন-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করেন না।’

(সূরা বাকারা ২ : ২৮৬)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخْفِفَ عَنْكُمْ وَخْلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

‘আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান; মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।’ (সূরা নিসা ৪ : ২৮)

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের এই অপরাধের কথাই কুরআন বলেছে এভাবে-

اتَّخَذُوا أَحِبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

‘তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে।’ (সূরা তাওবা ৯ : ৩১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদী ইবনে হাতেম (রাযি.)-এর সামনে আয়াতটির এই ব্যাখ্যাই করেছিলেন। খ্রিস্টান পাদ্রী, পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা যে জিনিসকে জনগণের জন্য হালাল বা হারামরূপে সাব্যস্ত করে দিত, তারা বিনা আপত্তিতে তা মেনে নিত এবং পাদ্রী, পুরোহিত ও পণ্ডিতদেরকে তারা বিধান প্রণেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিত।

বস্তুত কোন কিছুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্তকরণ এবং কোন কিছুকে শরয়ী দলিল ব্যতীত ফরয বা ওয়াজিব সাব্যস্ত করণ আর কোন ইবাদতকে বিশেষ রূপদান ও তার জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট শর্তাদি আরোপ করে তাকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়টিই হালাল (আল্লাহ যার অনুমতি দেননি)-এর আওতাভুক্ত।

বিদআত যে দ্বিতীয় সত্যের মূলে আঘাত হানে তা হল, শরীয়ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, যা নির্ধারিত হওয়ার তা নির্ধারিত হয়ে গেছে। একজন মানুষের মুক্তির জন্য

যা যা জরুরী, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য যে উপায়াদির প্রয়োজন, শরীয়ত তার সবকিছুই স্পষ্ট ব্যক্ত করে দিয়েছে, দ্বীনের টাকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন যে মুদ্রাই দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করা হোক না কেন তা নকল ও জাল বলে সাব্যস্ত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাক্ষ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম।’ (সূরা মায়দা ৫ : ৩)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

‘তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই।’ (সূরা হাজ্জ ২২ : ৭৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

‘অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি সে দয়ালু ও পরম দয়ালু।’ (সূরা তাওবা ৯ : ১২৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আনীত দ্বীন সম্পর্কে বলেছেন-

يَعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَةِ السَّمْحَةَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يَسِرُّ

‘আমাকে নিতান্ত সাদাসিদা, সরল দ্বীন দিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই দ্বীন সহজ।’

উম্মতের তাকলীফ ও কষ্টের প্রতি তাঁর এত বেশি দৃষ্টি ছিল যে, তিনি বলেছেন-

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

‘যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে বলে আমার ধারণা না হত, তাহলে তাদেরকে আমি নির্দেশ দিতাম প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে।’

তবে দ্বীনের এই সহজতা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এর জামানত ততক্ষণই বহাল থাকে যতক্ষণ আল্লাহ তাআলাই হন বিধানদাতা এবং শরীয়ত হয় তাঁরই। কিন্তু মানুষ যখন আইন প্রণেতা হয়, আর তারা ইলাহী শরীয়তে হস্তক্ষেপ করতে থাকে, অন্য কিছু সংযোজন করতে থাকে তখন আর এই দ্বীনের সহজতা অবশিষ্ট থাকতে পারে না। না মানুষের জ্ঞান সর্বব্যাপ্ত, না মানুষ মানুষের প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। না সে কালের ব্যবধান ও পরিবেশের ব্যবধানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারে, না সে স্ব-জাত মানুষের প্রতি ঐ দরদ রাখতে পারে যে দরদ আছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের।

ফল দাঁড়ায় এই যে, বিশুদ্ধরূপে থাকা অবস্থায় যে দ্বীন প্রত্যেকের জন্য সহজে আমলযোগ্য হয় সেই দ্বীন ঐসব বিদআতের মিশ্রণে এবং বারবার দ্বীনে সংযোজনের ফলে তা এত দীর্ঘ, জটিল ও সুকঠিন হয়ে যায় যে, দ্বীনের উপর আমল করা ধীরে ধীরে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষ দ্বীন থেকে পলায়নপর হয়ে পড়ে, দ্বীন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করার ফাঁক-ফোকর অন্বেষণ করতে থাকে। অনেকে ঐ দ্বীনের লাগাম নিজের গলা থেকে সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলে।

বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, ধর্ম পরিহার করে চলার ও কোন কোন ক্ষেত্রে নাস্তিক হয়ে যাওয়ার বড় কারণ ঐ অসংখ্য নবসৃষ্ট বিদআত, যা পালন করা মধ্য পর্যায়ের ধার্মিকদের জন্য হয়ে পড়েছিল প্রায় অসম্ভব। মধ্যযুগে গীর্জার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তার কারণও ছিল এই নবসৃষ্ট বিদআতভিত্তিক ধর্মীয় আচারের, যার সাথে মূল খ্রিস্টধর্মের কোন সম্পর্কই ছিল না।

এটাও লক্ষ্যণীয় যে, ইলাহী দ্বীন ও শরীয়তের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সর্বকালীন ও সর্বজনীন অভিন্নতা। এই অভিন্নতা যেমন কালগত দিক থেকে তেমনই স্থানগত দিক থেকেও। আল্লাহ তাআলা যেহেতু رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (তিনিই দুই উদয়চল ও দুই অস্তাচলের প্রভু) তিনি যেহেতু কাল ও স্থানের বন্ধন ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে সেহেতু তাঁর প্রদত্ত শরীয়তে পূর্ণাঙ্গ অভিন্নতা বিদ্যমান। তাঁর শেষ শরীয়ত যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তা সকলের জন্য অভিন্ন। যেমন অভিন্ন সূর্য। পৃথিবী ও আকাশ যেমন সকলের জন্য এক ও অভিন্ন।

প্রাথমিক যুগে এই দ্বীনের যে রূপ ও আকৃতি ছিল, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেও তার ঐ একই রূপ ও আকৃতি বিদ্যমান। যতটুকু তা প্রাচ্যের জন্য ততটুকুই তা প্রতীচ্যের জন্য। যে নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, ইবাদতের যে রূপ, আল্লাহর তাআলার নৈকট্য লাভের যে নির্দিষ্ট ধারা আরবদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা সমভাবে নির্ধারিত ভারতবাসীদের জন্যও।

এই কারণে পৃথিবীর কোন প্রান্তের মানুষ যদি অপর প্রান্তে গমন করে তবে ইসলামের ফরয-ওয়াজিব আদায় করতে এবং মসজিদে যেয়ে ইবাদত করতে তার কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না এবং তার জন্য স্থানীয় কোন নির্দেশনা ও পথ প্রদর্শকেরও প্রয়োজন হবে না। সে যেখানেই যাক স্থানটিকে ধর্মীয় দিক থেকে অপরিচিত ও নিজে থেকে ভিনদেশী বলে মনে হবে না। সে যদি আলেম হয়ে থাকে তাহলে মুজাদ্দী নয় বরং ইমামও হয়ে যেতে পারে এবং সর্বত্র সে ফতোয়া দানের কাজও করতে পারে।

কিন্তু বিদআতের এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বিভিন্ন স্থানের বিদআতের মধ্যে একতা ও অভিন্নতা পাওয়া যায় না। বিদআতে স্থান ও কালের প্রভাব বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন স্থানের বিদআত স্থানীয় ছাঁচে গড়ে উঠে। বিদআতের টাকশাল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হয়। বিদআতকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সমভাবে চালু করা সম্ভব হয় না। মুসলিম বিশ্বের সকল মুসলমান নির্দিষ্ট কোন বিদআত সম্পর্কে জানবে তা নিশ্চিত নয়। জানলেও সকলেই তা গ্রহণ করে নেবে তা জরুরী নয়।

এ কারণেই ভারতের বিদআত এক রকম, মিসরের বিদআত আরেক রকম। তদ্রূপ ইরান ও সিরিয়ার বিদআতের মাঝে কোন সাদৃশ্য নেই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিদআতের মধ্যকার পার্থক্য তো অনেক পরের কথা, অনেক সময় একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন শহরের বিদআত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। এক শহরের বিদআত সম্পর্কে অন্য শহরের অধিবাসীদের কোন পরিচিতিই থাকে না। এই সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে পেতে মহল্লায় মহল্লায় পার্থক্য, ঘরে ঘরে পর্যন্ত পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। একেক মহল্লার বিদআত একেক রকম আর একেক ঘরের বিদআত একেক রকম হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ছিল অপরাপর শরীয়ত ও ধর্মের শিক্ষণীয় পরিণতি। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপও ছিল তাঁর সামনে। এইজন্য তিনি ইসলামী শরীয়তকে তার প্রকৃত রূপ ও আসল আকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যাবতীয় সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

তিনি তাঁর সাহাবীগণকে সুনাত আঁকড়ে ধরতে ও বিদআত পরিহার করে চলতে জোর নির্দেশ দান করেছেন এবং সেইমত তাদেরকে শিক্ষাদান করেছেন।

তাঁর সরাসরি শিষ্য সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশ যথাযথ পালন করেছেন এবং বিদআতের ব্যাপারে তাঁরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। বিদআতের ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য কি দুর্বলতা তাঁদের থেকে প্রকাশ পায়নি।

সাহাবীগণের পর ইসলামের ইমাম ও ফকীহগণ এত উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিদীপ্ততা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, যা নবীগণের উত্তরসূরীদের জন্যই যথোপযুক্ত। তাঁরা সর্বকালে বিদআতের কঠোর বিরোধিতা করেছেন। জ্ঞানগত ও কার্যগত উভয় দিক থেকে তাঁরা বিদআতপন্থীদের মোকাবেলা করেছেন। ইসলামী সমাজে বিদআত যাতে সুদৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য হতে না পারে এবং বিদআতপন্থীরা যেন সমাজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে না পারে সে ব্যাপারে তাঁরা সর্বাঙ্গক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

বিশেষত হানাফী ফকীহগণ এ ব্যাপারে যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সাথে স্ব-যুগের বাহ্যত মামুলী বিদআত ও রসম-রেওয়াজের বিরোধিতা করেছেন এবং শরীয়তের হেফাযত আর সুন্নাহ ও বিদআতের পার্থক্য চিহ্নিতকরণে যে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে দ্বীনের মৌলিকত্ব সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা, পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে।

দ্বীনের প্রতি আগ্রহী ও আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন ব্যক্তিদেরকে আকৃষ্ট করতে বিদআত যে কীরূপ চৌক্যকার্যসম ক্ষমতা রাখে এবং কীভাবে যে তা দ্রুত প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এ সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল তারা নিশ্চয়ই ঐসব উলামায়ে ইসলামের সাহসী ও সফল ভূমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন, যাদের প্রচেষ্টা ও মেহনতে কোন কোন বিদআত চিরতরে মূলোৎপাটিত হয়ে গেছে এবং কোন কোন বিদআত কমপক্ষে বিদআত হিসাবে নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে। সেগুলো নিশ্চিহ্ন না হলেও একদল হকপন্থী সব সময় তার বিরোধিতায় লিপ্ত আছে।

তবে বিদআত বিরোধী ও সুন্নাহের পতাকাবাহী উলামায়ে ইসলাম সব সময়ই বিদআতপন্থীদের পক্ষ থেকে গোঁড়া, রক্ষণশীল ইত্যাদি উপাধি লাভ করেছেন। এটা নতুন কিছু নয়, প্রত্যেক যুগেই প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধীরা এইরূপ উপাধি লাভ করে থাকেন। তাতে তাদের কিছু যায় আসে না।

مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ

‘তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী নবীগণ সম্বন্ধে।’ (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৪১ : ৪৩)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ইলমের মর্যাদা ও আলেমগণের দায়িত্ব

[কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাওলানাকে ডক্টরেট অব লিটারেচার ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ এটি]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
يَدْعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا
لَمْ يَعْلَمْ -

মাননীয় চ্যাসেলর, প্রো-চ্যাসেলর, ভাইস-চ্যাসেলর, শিক্ষকবৃন্দ, প্রিয় ছাত্র ও
সুধীবৃন্দ!

আমি বিশ্বাস করি যে, ইলম ও জ্ঞান একক ও অবিমিশ্র সত্ত্বা, যা অবিভাজ্য।
ইলম ও জ্ঞানকে নতুন ও পুরাতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কিংবা দর্শনগত ও কার্যগত
ইত্যাদি প্রকারে বিভক্ত করা শুদ্ধ নয়, সিদ্ধ নয়।

আল্লামা ইকবাল যেমনটা বলেছেন—

دليل كم نظري قصة جديد وتديم

নতুন ও পুরানত্বের স্লোগান দৃষ্টি-দুর্বলতার প্রমাণ।

ইলম ও জ্ঞানকে আমি এক মহাসত্য বলে মনে করি। যা মূলত খোদার ঐ দ্বীন
যার মালিকানা কোন নির্দিষ্ট জাতি বা দেশের জন্য নির্দিষ্ট নয়, নির্দিষ্ট হওয়া উচিতও
নয়। ইলম ও জ্ঞানের আধিক্যের মধ্যেও আমি একত্ব দেখতে পাই। সেই একত্ব
হচ্ছে সত্যতা, সত্যের অন্বেষণ, সত্য-পিপাসা, সত্য প্রাপ্তির আনন্দ। এতদসত্ত্বেও
আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাসেলর, ভাইস চ্যাসেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির

দায়িত্বশীলগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, তাঁরা এমন এক ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে সম্মানিত করতে নির্বাচিত করেছেন, যার সম্পর্ক প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে।

আমি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রবক্তা নই যে, এসবের ইউনিফর্ম যার গায়ে আছে সে-ই আলেম ও বিদ্বান, জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসাবে বিবেচিত হবে অন্য কেউ নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সাহিত্য ও কবিতার ক্ষেত্রে এই নীতিটিই অঘোষিতভাবে কার্যকর হয়ে আছে। যার নিকট সাহিত্যের কোন দোকান নাই, যে ব্যক্তি সাহিত্যের সাইনবোর্ড টানায়নি, সাহিত্যের ইউনিফর্ম পরিধান করে সাহিত্য সভায় উপস্থিত হয়নি সে ব্যক্তি অ-সাহিত্যিক। লোকেরা এসব স্বভাবজাত সাহিত্যিক ও কবিদের অপরাধ কখনও ক্ষমা করেনি, যার গায়ে ঐ ইউনিফর্ম দেখা না যায় বা বলা যায়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে ব্যক্তির ঐ রকম কোন ইউনিফর্ম লাভের সৌভাগ্য হয়নি। আমি জ্ঞানের বৈশ্বিকতা ও সজীবতার প্রবক্তা, যার মধ্যে প্রতি যুগেই খোদায়ী দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান থাকে। যদি একনিষ্ঠতা ও সত্যিকারের অন্বেষণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কোন ঘাটতি কোন সময়ই পরিলক্ষিত হয় না।

জ্ঞানের সম্পর্ক কলমের সাথে

সুধী!

আকাশশর্পশী হিমালয় পর্বতের এক চিরসবুজ ও সৌন্দর্যমহিম উপত্যকার এই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানপীঠের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে আজ আমার বার বার মনে পড়ছে অতীতের একটি ঘটনা। আরবের বিশুদ্ধ এক এলাকার একটি অনুচ্চ ও সবুজ শ্যামলিমাহীন পাহাড়ে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে যে ঘটনাটি ঘটেছিল। মানব ইতিহাসে শুধু নয় বরং যে ঘটনাটি মানবতার ভাগ্যাকাশেও এরূপ গভীর ও চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। যে কাগজ ও কলমের উপর নির্ভরশীল সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্মাণ, যে কাগজ ও কলম গবেষণা ও লেখনীর অপরিহার্য অনুষঙ্গ, যা ব্যতীত এই বিশাল বিদ্যাপীঠ ও বিপুল আকারের সব গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হত না সেই কাগজ ও কলম, লাওহ ও কলমের সাথে রয়েছে ঘটনাটির গভীর সম্পর্ক। আমি বুঝতে চাচ্ছি প্রথম ওহী অবতরণের ঘটনা, যা ঘটেছিল ৬১১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। যে দিন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কার অদূরে গারে হেরায় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। সে ওহীর বাণী ছিল এরূপ-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ -
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

‘পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন, শিক্ষা দান করেছেন মানুষকে যা সে জানত না।’

বিশ্ব জগতের স্রষ্টা তাঁর ওহীর প্রথম কিস্তিতে, রহমতের বৃষ্টির প্রথম ছিটাতেও এই সত্যের ঘোষণাকে বিলম্ব কি মূলতবি করেননি যে, ইলম ও জ্ঞানের সম্পর্ক কলমের সাথে। ঘোষণাটি দিলেম গারে হেরার ঐ নির্জন পরিবেশে যেখানে নিরক্ষর ও উম্মী নবী দুনিয়াবাসীর হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে বার্তা আনয়নের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। যে নবীর অবস্থা ছিল এই যে, তিনি কলম কীভাবে নাড়াতে হয় তাও কোনদিন শিক্ষা করেননি, কলম চালনা সম্পর্কে যাঁর বিদ্যা ছিল সম্পূর্ণ শূন্যের কোঠায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কী কোন দৃষ্টান্ত মেলে? এও কি কল্পনা করা যায় যে, নিরক্ষর এক দেশে, নিরক্ষর এক জাতির নিরক্ষর নবীর উপর প্রথমবার ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, আর কয়েক শত বছর পর আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে আর সেই ওহীর, সেই সম্পর্কের সূচনা হচ্ছে অফ্রা দ্বারা? যিনি নিজে ছিলেন নিরক্ষর, পাঠঅনভিজ্ঞ তার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে আর তাঁকে বলা হচ্ছে ‘তুমি পাঠ কর’।

এটা মূলত ইঙ্গিত ছিল এই দিকে যে, আপনাকে যে উম্মত দেওয়া হবে তারা শুধু তালিবুল ইলম বা জ্ঞান-অন্বেষণকারীই নয় বরং জ্ঞান বিতরণকারী, জ্ঞান দানকারী শিক্ষক হবে। তারা পৃথিবীতে জ্ঞান বিস্তারকারী হবে। যে যুগে আপনি প্রেরিত হয়েছেন সেই যুগ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতার যুগ হবে না, বন্যতার যুগ হবে না, জাহালাত ও মূর্খতার যুগ হবে না। সেই যুগ জ্ঞান-বিরোধী ও জ্ঞানবিদ্বেষী যুগ হবে না বরং সেই যুগ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ, বুদ্ধিচর্চার যুগ। সেই যুগ হবে দর্শন ও যুক্তির যুগ, নির্মাণ ও সংস্কারের যুগ। সেই যুগ হবে মানবপ্রীতির যুগ, হবে উন্নতি ও সফলতার যুগ।

জ্ঞানের সূচনা হওয়া উচিত প্রতিপালকের নামে

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

‘পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।’

সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ ছিল এই যে, রব ও প্রতিপালকের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পৃক্ততা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে জ্ঞান তার সঠিক ও বিশুদ্ধ পথ হারিয়ে ফেলেছিল। এই ভাঙ্গা সম্পর্ককে এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যখন ইলম ও জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হল, ইলম ও জ্ঞানকে যথাযথ মর্যাদা দান করা হল তখন সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, এই জ্ঞানের সূচনা হওয়া উচিত রব ও প্রতিপালকের নামে। কারণ ইলম ও জ্ঞান তাঁরই দান। তাঁরই সৃষ্টি। তাঁরই নির্দেশনায় তা যথোপযুক্ত উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করতে পারে। এটা ছিল এক বিপ্লবী আওয়াজ, যা এই পৃথিবীবাসী প্রথম শুনেছিল, যার কল্লনাও কেউ কোনদিন করতে পারে না। যদি পৃথিবীর সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে আহ্বান জানানো হত যে, আপনারা বলুন তো, যে ওহী নাযিল হবে তার সূচনা কোন্ কথা দ্বারা হতে পারে? কোন্ বিষয়কে সূচনার মর্যাদা দেওয়া হবে? আমি নিশ্চিত যে, তাদের কেউই— যারা ঐ নিরক্ষর জাতি ও তাদের মেজাজ ও প্রকৃতি, তাদের মস্তিষ্ক-শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল— একথা বলতে পারত না যে, ওহীর সূচনা হবে اقرا (পাঠ কর) দ্বারা।

اقرا (পাঠ কর)। এ ছিল এক বিপ্লবী দাওয়াত ও বিপ্লবী আহ্বান যে, ইলমের ও জ্ঞানের যাত্রার সূচনা হওয়া উচিত মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের নির্দেশনায়। কারণ, এই যাত্রা বড় দীর্ঘ ও জটিল যাত্রা। এই যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কষ্টকাকীর্ণ। এই যাত্রায় দিন-দুপুরে ডাকাত দল সর্বস্ব লুটে নেয়। এই যাত্রার পদে পদে রয়েছে ভয়াবহ গভীর খাদ। প্রতি পদে রয়েছে সাপ ও বিছু। তাই মনযিলে মকসুদে পৌছাতে এই যাত্রায় একজন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শকের সঙ্গ প্রয়োজন। আর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শক আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নয়; হতে পারে না। এই ইলম ও জ্ঞান নিছক জ্ঞান ও সাহিত্যের নাম নয়। ঐ জ্ঞান জ্ঞান নয়, যা চিত্রকর্ম ও চিত্রশিল্প শিক্ষাদান করে, যা খেলনা খেলতে শেখায়। শুধুই চিত্ত আকর্ষণের নাম ইলম বা জ্ঞান নয়। যে বিদ্যা এককে অপরের বিরুদ্ধে শত্রু করে তোলে, জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করে, শত্রুতা সৃষ্টি করে তার নাম ইলম ও জ্ঞান নয়। যে বিদ্যা শুধু উদরপূর্তির পদ্ধতি শিক্ষাদান করে তার নাম ইলম ও জ্ঞান নয়। যে বিদ্যা শুধু ভাষা ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষাদান করে তার নাম ইলম ও জ্ঞান নয়; বরং

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা অনুগ্রহশীল, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দান করেছেন, শিক্ষা দান করেছেন মানুষকে, যা সে জানত না।

বলা হল, পাঠ কর- তোমার প্রতিপালক বড় কারীম, বড় অনুগ্রহশীল। তিনি তোমাদের প্রয়োজন, তোমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

‘পাঠ কর, আর প্রতিপালক বড় কারীম, যিনি শিক্ষাদান করেছেন কলম দ্বারা।’

লক্ষ্য করুন, কলমের মর্যাদাকে এতদপেক্ষা উচ্চতা আর কে দান করেছে? গারে হেরায় অবতীর্ণ প্রথম ওহীতেও যে কলমের কথা অনুচ্চারিত থাকেনি, যার উল্লেখ আল্লাহ তাআলা করতে ভোলেননি? অথচ তখন কলম এরূপ একটি বস্তু ছিল, যা তন্ন তন্ন করে তালাশ করেও মক্কার কোন ঘরে পাওয়া অসম্ভব ছিল। যদি আপনি তালাশ করতে বের হতেন তাহলে হয়তো তা পেতে পারতেন ওরাকা ইবনে নাওফল অথবা আরবের বাইরে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির ঘরে।

অতঃপর আয়াতটিতে এক বিপ্রবাক্যক, অবিনশ্বর ও স্বাশত মহাসত্য উচ্চারিত হয়েছে যে, ইলম ও জ্ঞানের কোন শেষ নেই। বলা হয়েছে-

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

শিখিয়েছেন মানুষকে, যা সে আগে জানত না।

সাইন্স ও টেকনোলজী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বরূপ কী? মানুষ চাঁদে গমন করছে। মহাশূন্য ভ্রমণ করছে। পৃথিবীর দূরত্ব কমিয়েছে- এসব-

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

-এর কারিশমা নয় তো আর কী?

সুধী!

আমাকে আপনারা অনুমতি দিলে জ্ঞানের পথের একজন অভিযাত্রী হিসাবে আমি আপনাদের সামনে আমার কিছু পরামর্শ, কিছু অভিজ্ঞতা পেশ করতে চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রথম কাজ, জীবন ও চরিত্র গঠন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এরূপ ব্যক্তি গঠন করবে, যে একমুঠো অন্নের বিনিময়ে নিজের বিবেককে বিক্রিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে না। আধুনিক চিন্তা ও দর্শন মনে করে, বর্তমান বাজারে

সকলেরই মূল্য নির্ধারিত। কাউকে যদি স্বল্প মূল্যে ক্রয় করা না যায় তবে অধিক মূল্যে তাকে ক্রয় করা যাবে। কোন না কোন মূল্যে তা বিক্রিত হবেই। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সফলতা হল ব্যক্তি-চরিত্র গঠন, মানসিকতা নির্মাণ। বিশ্ববিদ্যালয় জাতিকে এরূপ ব্যক্তিত্ব উপহার দেবে, যারা নিজের বিবেক বিক্রয় করতে কখনও প্রস্তুত হবে না। পৃথিবীর কোন শক্তি, কোন ভ্রান্ত দর্শন, কোন ভ্রান্ত দাওয়াত ও আন্দোলন যাদেরকে কোন মূল্যেই খরিদ করতে পারবে না। যারা ইকবালের ভাষায় অত্যন্ত আস্থা ও গর্বের সাথে উচ্চারণ করবে—

کرم تیرا کم ہے جو ہر نہیں میں - غلام طغرل و سب نہیں میں
جہاں بنی مری فطرت ہے لیکن - کسی جمشید کا سا غر نہیں میں

তোমার দয়া যে, আমি মূল্যহীন নই, খেয়াল-খুশির দাস নই আমি।
পৃথিবী-দর্শন আমার স্বভাব তবে, কোন জামশেদের সূরা পান-পেয়ালা নই আমি।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্বিতীয় দায়িত্ব হল এরূপ ব্যক্তিত্ব গঠন, যারা নিজেদের জীবনকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান ও হেদায়েতের জন্য কুরবান ও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। যারা অপরের জন্য ক্ষুধার্ত থাকার মধ্যে ঐ তৃপ্তি অনুভব করবে যে তৃপ্তি লাভ হয় উদরপূর্তি করে খানা-পিনার মধ্যে।

যারা অপ্রাপ্তি ও হারানোর মধ্যেও লাভ করবে ঐ অনাবিল আনন্দ, প্রাপ্তির মধ্যেও অনেক সময় যে আনন্দ লাভ হয় না। যে তার যৌবনের পূর্ণ শক্তি, মস্তিষ্কের পূর্ণ যোগ্যতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাকে যে জ্ঞানের উত্তম উপহার দিয়ে তার ঝুলি পূর্ণ করে দিয়েছে তা ব্যয় করবে মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কাজে।

বিদ্যাপীঠগুলোর দেখা উচিত, তারা সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে কত সংখ্যক। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগত আধিক্য দ্বারা কোন দেশের প্রশংসা করা হয় না। এই হীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রশ্ন হল, ইলম ও জ্ঞান অর্জনের আগ্রহে, গবেষণার পথে, জ্ঞান ও চরিত্রের প্রসার কর্মে, সকল পাপাচার, অনাচার, পাশবিকতা ও হিংস্রতা বিদূরিত করণে এবং সম্পদ ও শক্তির পূজা প্রতিরোধ করণে কতজন নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছে? নিজের জাতিকে সচেতন করতে, সভ্য ও বিবেকসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে কত সংখ্যক যুবক এরূপ আছে যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে গিয়ে, অর্থ ও সম্মানের মোহ ত্যাগ করে, চোখ বন্ধ করে শুধু জাতির উদ্দেশ্যে কাজ করে

যাচ্ছে? আসল মাপকাঠি ও আসল দেখার বিষয় হল- কতজন যুবক এরূপ তৈরি হয়েছে যারা সকল আরাম-আয়েশ ভুলে গিয়ে, ব্যক্তিগত উন্নতির চিন্তা পরিহার করে নিরিবিলি শুধু গঠনমূলক ও নির্মাণমূলক কাজে মগ্ন আছে?

এটা তো বাস্তব সত্য যে, কবিতা ও সাহিত্য, দর্শন ও গবেষণা, লিখন ও সংকলন- এই সবকিছুর মূল লক্ষ্য দেশ ও জাতির মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করা, দেশ ও জাতিকে ধ্বংস ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা।

সুধী!

আমি এখন ডক্টর মুহাম্মাদ ইকবালের একটি কবিতা আবৃত্তি করছি। যদিও তিনি কবিতাটি লিখেছিলেন কোন সাহিত্যিক অথবা কবিকে লক্ষ্য করে, কিন্তু কবিতাটির মর্মব্যাপকতা জ্ঞান ও সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن
جوشی کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
مقصود ہر روز حیات ابدی ہے
یہ ایک نفس دو نفس مثل شر کیا
شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کی نفس ہو
جس سے چمن افسودہ ہو وہ بادِ حر کیا

হে চিন্তাশীলগণ, আপনাদের চিন্তার রুচি তো বেশ চমৎকার- কিন্তু যে চিন্তা দৃষ্টি বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় তা আবার দৃষ্টি কিসের?

জ্ঞান-গরিমার উদ্দেশ্য তো পরকালীন অনন্ত জীবনের সফলতা লাভের ব্যাকুলতা। (দপ করে জ্বলে ওঠা ও দপ করে নিভে যাওয়া) ফুলিপের ন্যায় এই এক শ্বাস ও দুই শ্বাসের এই পার্থিব জীবনের কী মূল্য আছে?

কবির কবিতার ঝংকার হোক অথবা সুরশিল্পীর সুর-দ্যোতনা হোক যা দ্বারা সুশোভিত পুষ্পোদ্যান বিমিয়ে পড়ে তাকে প্রভাত-সমীরণ বলা যায় কী করে?

সুধী! অবশেষে ঐসব ধন্যবাদার্থী ভাইদের উদ্দেশ্যে- যারা এখান থেকে সনদ নিয়ে চলে যাচ্ছেন এবং ঐসব সৌভাগ্যের অধিকারী প্রিয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে- যারা এখনও এই জ্ঞানের বাগানে ফল আহরণে ব্যাপ্ত রয়েছেন- কিছু বলার অনুমতি

দিন। কথাটি বলতে আমি একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আশ্রয় নেব, যা আপনাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে একঘেয়েমী থেকে বের করে একটু ভিন্ন স্বাদ দান করবে আশা করি।

কাহিনীর বর্ণনাকারী বেশ নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন- একবার কিছু ছাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে নৌকা ভ্রমণে বের হল। সকলের চিত্ত ছিল উৎফুল্ল। সময় ছিল খুবই উপযুক্ত। ফুরফুরে হাওয়ায় মেজায় ছিল সকলের ফুরফুরে। কিন্তু কোন কাজ ছিল না। নবীণ এই যুবকেরা চুপচাপ বসে থাকে কী করে? মাঝি ছিল মূর্খ। ব্যস, বিনোদনের একটা উপলক্ষ্য ছেলেরা পেয়ে গেল। একটি ছেলে মাঝিকে বলল, চাচা মিঞা! আপনি কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন? মাঝি জবাব দিল, মিঞা! আমি তো কোন লেখাপড়া করিনি।

শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে ছেলেরা বলল, আপনি সায়েন্স পড়েননি?

মাঝি বলল, আমি তো এর নামও কোনদিন শুনিনি।

অপর একটি ছেলে বলল, তাহলে জিওমেট্রি এবং এ্যালজাবরা নিশ্চয়ই পড়েছেন?

মাঝি বলল, জনাব! এই নাম তো আমার জন্য একেবারেই নতুন।

তৃতীয় অপর একটি ছেলে বলল, তবে আপনি নিশ্চয়ই জিওগ্রাফী এবং হিস্টরী পাঠ করেছেন?

মাঝি জবাব দিল, জনাব এটা কি মানুষের নাম, না কোন শহরের?

মাঝির এই কথায় ছেলেরা সব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল, চাচা মিঞা! আপনার বয়স কত? মাঝি বলল, এই চল্লিশ বছরের মত হবে। ছেলেরা বলল, আপনি তো আপনার জীবনের অর্ধেক ধ্বংস করে ফেলেছেন। কোন লেখাপড়া করেননি। মাঝি বেচারা বেদনাহত হয়ে চুপ করে রইল। কুদরতের তামাশা দেখুন। এর কিছুক্ষণ পরেই নদীতে তুফান উঠল। নদী হয়ে উঠল উত্তাল। বিশালাকারের ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল নৌকায়। নৌকা দুলতে থাকল কলার মোচার মত। মনে হল, এখনই বুঝি নৌকা ডুবে যাবে। নদী ভ্রমণের এটাই ছিল ছেলেদের প্রথম অভিজ্ঞতা। ছেলেদের চেহারা হয়ে গেল ফ্যাকাসে। এবার মাঝিল পালা। সে অত্যন্ত গাণ্ডীর্থের সঙ্গে বলল, 'ভায়া, তোমরা কোন কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ?' ছেলেরা সাদাসিদা মাঝির উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না। তারা কলেজে পড়া বিভিন্ন শাস্ত্রের এক লম্বা-চওড়া তালিকা তুলে ধরল। এক এক করে বিভিন্ন শাস্ত্রের নাম বলল। তারা যখন বিভিন্ন শাস্ত্রের ভারী ভারী নাম উল্লেখ করে বর্ণনা শেষ করল তখন মাঝি মুচকি হেসে বলল, ঠিক আছে এইসব

তো তোমরা পড়েছ। কিন্তু সাঁতার বিদ্যাও কি শিক্ষা করেছে? আল্লাহ না করুন, নৌকা যদি উল্টে যায়, তাহলে তীরে কিভাবে পৌঁছবে তোমরা? ছেলেদের মধ্যে কেউই সাঁতার জানত না। তারা অত্যন্ত হতাশার সুরে জবাব দিল, চাচাজান! এই একটা বিদ্যাই আমাদের অজানা রয়ে গেছে। আমরা তা শিখিনি। ছেলেদের উত্তর শুনে মাঝি এবার জোরে হেসে উঠল এবং বলল, আমি তো জীবনের অর্ধেক খুইয়েছি, কিন্তু তোমরা তো তোমাদের পুরোটাই ডুবিয়ে দিয়েছ। কারণ, এই ভয়াবহ তুফানে তোমাদের লেখাপড়া কোন কাজেই আসবে না। আজ তোমাদের জীবন বাঁচাতে পারে শুধু সাঁতার। আর তোমরা তা জান না।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থাও এইরূপই। বড় বড় উন্নত যে দেশগুলো দুনিয়ার ক্ষমতা ও বিস্তার মালিক হয়ে বসে আছে সেসব দেশের চিত্রও এইরূপ। জীবন-তরী অতল সাগরে। সাগরের উত্তাল ঢেউ হিংস্র জানোয়ারের ন্যায় মুখ হা করে ধেয়ে আসছে। তীর অনেক দূরে, বিপদ সন্নিহিত। জাহাজের আরোহীরা সর্ব বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ কিন্তু দুর্ভাগ্য! জীবন বাঁচানোর উপায় সাঁতার বিদ্যায় তারা মূর্খ ও অজ্ঞ। অন্য শব্দে, তাঁরা সবকিছুই শিখেছে, শেখেনি শুধু কীভাবে ভাল মানুষ হওয়া যায়, কীভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়, মানব-বন্ধু মানবরূপে কীভাবে জীবন যাপন করা যায়। মরহুম ইকবাল তাঁর কবিতায় এই দূরাবস্থার চিত্র, এই বিশ্বয়কর স্ব-বিরোধিতার নিপুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। যে দূরাবস্থা ও স্ব-বিরোধিতার শিকার এই বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত প্রতিটি মানুষ বরং প্রতিটি সমাজ।

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرکا ہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے کا

اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا لیا

آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے کا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سحر کرنے کا

নক্ষত্রের বিচরণ-স্থল-সন্ধানীরা নিজেদের চিন্তাজগতে ভ্রমণ করতে অক্ষম
নিজেদের দর্শন ও মতবাদের জটিলতায় তারা ঘূর্ণায়মান।

আজ পর্যন্ত লাভ ও লোকসান কী তার ফায়সালাও করতে পারেনি তারা ।

সূর্য-রশ্মিকে যে করেছে তালুবন্দী

জীবনের অন্ধকার রাতকে সে করতে পারেনি আলোকজ্জ্বল প্রভাত ।

সভ্য মানুষ রূপে জীবন যাপনের মূল ভিত্তি হল খোদাভীতি, মানবপ্রীতি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করণের সাহস ও যোগ্যতা, ব্যক্তি স্বার্থের উপর সমাজ স্বার্থকে প্রাধান্য দানের অভ্যাস, মানবতাকে সম্মান প্রদান, মানুষের অর্থ-সম্পদ, জীবন ও মান-সম্বন্ধের হেফাজতের প্রেরণা, নিজের অধিকার আদায়ের চিন্তা অপেক্ষা অন্যের অধিকার আদায়ের চিন্তাকে প্রাধান্য দান, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, অত্যাচারী ও ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস, যাদের নিকট অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতা ব্যতীত আর কিছু নেই তাদের প্রতি অনগ্রহ ও নিভীকতা, সর্বাবস্থায় সত্য কথনের সাহস তা যদি নিজের সমাজ ও দলের বিরুদ্ধে হয় তবুও, আপন-পর সকলের জন্যই ন্যায়পরায়ণতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, অপার ক্ষমতাধর সত্ত্বা মহান রাব্বুল আলামীনের সতত নজরদারীর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর নিকট জবাবদিহীতার ভয়— এইসবই নির্মল ও সফল জীবন যাপনের মূলভিত্তি ও শর্ত । একটি সুন্দর সমাজ, একটি শক্তিশালী ও মর্যাদাশীল ও সুরক্ষিত দেশের জন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ । এই সবার শিক্ষাদান ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রথম দায়িত্ব । আর এইসব গুণের অধিকারী হওয়া শিক্ষিত প্রজন্মের এবং দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রথম দায়িত্ব ।

আমাদের দেখা উচিত, এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতটুকু সফল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্তরা কতটুকু অভিনন্দনযোগ্য ।

আরও দেখা উচিত— এইসব লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সদিচ্ছা কতটুকু এবং এর জন্য কী ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি ।

অবশেষে আমাকে সম্মান দান ও আমার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

وما علينا الا البلاغ المبين

ইলমে দীন শিক্ষাগ্রহণরত ও শিক্ষা সমাপনকারীদের সফলতার জন্য অনিবার্য তিনটি শর্ত

[১৯৭৮ ঈসায়ী সনের ১২ জুলাই তারিখে করাচীর জামিয়া দারুল উলুমে শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদত্ত ভাষণ এটি। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দা. বা.) হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর পরিচিতি তুলে ধরেন।]

ইলমে দ্বীন শিক্ষাগ্রহণরত ও শিক্ষা সমাপনকারীদের
সফলতার জন্য অনিবার্য তিনটি শর্ত

ইলমে দ্বীন শিক্ষাগ্রহণরত ও শিক্ষা সমাপনকারীদের

সফলতার জন্য অনিবার্য তিনটি শর্ত

হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব এবং

পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমগণের স্মরণ

সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

বর্তমান যুগে যে সকল আলেম দ্বিনী ইলমে পাণ্ডিত্য ও সাগর-সম গভীরতার অধিকারী বলে আমি বিশ্বাস করি ও জানি তাঁদের মধ্যে দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব অন্যতম। জ্ঞানের গভীরতা, ফিকহ ও ফাতওয়া শাস্ত্রে গভীর ও বিস্তৃত দৃষ্টি, শিক্ষাদানের যোগ্যতা ইত্যাদি গুণগুলো অবশ্যই প্রশংসনীয় ও মূল্যায়নযোগ্য। কিন্তু অপর একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে একজন ফকীহ ও মুফতীকে ফকীহন নাফস (স্বভাবজাত ফকীহ) বলা যায়। স্ব-যুগের আলেমগণের মধ্যে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব ছিলেন সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন আমার উস্তাদগণের সম-বয়সী এবং তাঁদের অনুরূপ চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি সরাসরি তাঁর ছাত্রত্ব ও শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতে পারিনি। আমি যখন দেওবন্দে যাই তখন মুফতী সাহেব দারুল উলূমে শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু যেহেতু আমি দাওরায়ে হাদীসে অধ্যয়ন করতাম তাই তাঁর দরসে বসার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি দীর্ঘ বাইশ বছর পর এখানে আসলাম। ১৯৫৬ সনে বিদেশের সফর শেষে ফিরতি পথে দুই-তিন দিনের জন্য করাচীতে অবস্থান করেছিলাম। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, আজ তিনি আমাকে মুফতী সাহেবের সর্বোত্তম স্মারক দারুল উলূমে নিয়ে এসেছেন। আজ এই সময়ে পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন ছিল মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী, মাওলানা ইউসুফ বিনৌরী সাহেবগণের ন্যায় দ্বীন ও ইলমে সুগভীর দৃষ্টির অধিকারী উলামায়ে কেরামের। বাস্তবতা তো এই যে, অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্কট এইরূপ যে, এই মুহূর্তে এই দেশের ও এই কালের জন্য প্রয়োজন ছিল হুজ্জাতুল ইসলাম গাযযালীর, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার এবং হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহর। কিন্তু ঐ পর্যায়ের আলেম ও দ্বিনী পথপ্রদর্শক না হোক অন্তত যাদের নাম উল্লেখ করলাম তাদের ন্যায় কিছু আলেম থাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হয়! সেই পর্যায়ের আলেমও এখন আর আমাদের মাঝে নেই।

যুগ পরিবর্তনের অভিযোগ

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আমি যেহেতু কথা বলছি দারুল উলূমে সেহেতু আমি ইলম সম্পর্কে কথা বলব এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের ভবিষ্যত, তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং যুগের সঙ্কট ও ফেতনা সম্পর্কে আলোকপাত করব।

আপনারা নিশ্চয়ই এইরূপ কথা খুব বেশি শুনে থাকেন যে, যুগের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, দুনিয়া বদলে গেছে, আকাশ ও পৃথিবী বদলে গেছে, চিন্তার ধারা পাণ্টে গেছে। এই যুগে দ্বীনী ইলম অর্জনে সময় ব্যয় করা, দ্বীনী ইলমে ব্যুৎপত্তি অর্জন, ইলমের সূক্ষ্মতম ও খুঁটিনাটি বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ অসময়ের তবলা বাদন এবং পাহাড় খনন করে শুকনো ঘাস আহরণের ন্যায় নিষ্ফল নয় তো কী?

এই যুগেই শুধু নয় বরং প্রত্যেক যুগেই যুগ পরিবর্তনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, এটাকে অভ্যুত্থান হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। আপনি সাহিত্য ও কবিতা অধ্যয়ন করুন। দেখবেন, প্রত্যেক যুগেই এই কান্নারই আওয়াজ যে, যুগ বড় খারাপ হয়ে গেছে, যোগ্য ও যোগ্যতার কোন মর্যাদা নেই, কোন মূল্য নেই। সর্বত্র অযোগ্যতা ও অদক্ষতারই দৌরাণ্ড। আরবী সাহিত্য ও আরবী কবিতা যদি দেখেন তাহলে আবুল আলা মাআরুরীকে বলতে শুনবেন—

تطاولت الارضُ السماءَ مفاهمةً
 وفاخرت الشهب الحصار الجنادل
 وقال السُّهال للشمس انتِ ضئيلةٌ
 وقال الدُّجى للصِّم لوانك حائل
 اذا نسب الطَّائى بالبخل ماذرٌ
 وخَيْرُ قُسا بالفهامة باقل

আসমানের মুকাবিলায় ভূমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করে,
 আর কঙ্কর-পাথর গর্ব করে উল্কাপিণ্ডের মুকাবিলায়।
 ক্ষীণ আলো বিশিষ্ট ক্ষুদ্র তারকা সূর্যকে বলে তুমি তুচ্ছ
 আর অন্ধকার বলে প্রভাতকে তোমার রঙ তমসান্ন।

হাতেম তাঈ সম্পর্কে কার্পণ্যের অভিযোগ তোলে মাদির
(জৈনিক প্রসিদ্ধ কৃপণ ব্যক্তি)

আর বাকিল (মনের ভাব প্রকাশে অক্ষম জৈনিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি)
কুসুস্ ইব্ন সায়েদা (জাহেলী যুগের জৈনিক বাগ্মী পুরুষ)কে
বক্তব্য উপস্থাপনের বিষয়ে বিব্রত করে তোলে।

কবি তাঁর কবিতার শেষে বলেন—

فِيَا مَوْتُ زُرْ إِنَّ الْحَيَاةَ ذَمِيمَةٌ
وَيَانَفْسُ جَدَىٰ اِنْ دَهْرَكَ هَازِلٌ

অতএব, হে মৃত্যু! তুমি এসে আমার সাথে সাক্ষাত কর
(অর্থাৎ আমাকে আলিঙ্গন কর।)

কেননা, এ জীবন অতি মন্দ। (এর আর কোন উপভোগ্যতা নেই)

আর হে আত্মা, তুমি গাষ্টীরের পথ অবলম্বন কর—

কেননা, তোমার সমকালীন যুগ তোমাকে নিয়ে রসিকতা করছে।

অন্য দিকে হাফেয শীরাজী অভিযোগ করেন

اِيں چہ شورِ يَسْتِ کہ در دورِ قمریٰ يَنَم
ہمہ آفاقِ پراز فتنہ و شرّیٰ يَنَم

এই হৈ চৈ কিসের, যা আমি জ্যোৎস্নাময় সময়ে দেখছি?

সমগ্র জগৎ অনর্থ ও অমঙ্গলে পরিপূর্ণ দেখছি।

তিনি আরও বলেন,

اسپ تازی شدہ مجروح بزیرِ پلاں
طوقِ زریں ہمہ در گردنِ خرنم

‘আরব্য অশ্ব পালান বা হাওদার চাপে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে আছে।

আর সোনার কণ্ঠহার সব গাধার গলায় দেখতে পাচ্ছি।

উর্দু কবিতা ও কাব্যে আপনি যুগের পরিবর্তনের এই অভিযোগ দেখবেন।

যেমন কবি বলেন—

پھرتے ہیں اہل کمال آشفۃ حال افسوس - اے کمال افسوس ہے تجھ پر کمال افسوس

‘আক্ষেপ! গুণ গরিমার অধিকারীরা বেহালদশা হয়ে ঘুরছে
হে গুণ গরিমা! আক্ষেপ তোমার প্রতি, পরিপূর্ণ আক্ষেপ।

কবিতা কয়টি হঠাৎই এখন মনে পড়ে গেল। এ রকম কবিতা ও যুগের বিরুদ্ধে অভিযোগ বহু কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে কিতাবই দেখবেন যুগ সম্পর্কে মাতম দেখতে পাবেন, অভিযোগের স্তূপ দেখতে পাবেন। নিজের সুষ্ঠু যোগ্যতা কার সামনে প্রকাশ করা যাবে? যোগ্যতার মূল্যায়নকারী কোথায়? বিচক্ষণ ও দৃষ্টির অধিকারী লোক কোথায়? এটা অযোগ্যতা, অদক্ষতার যুগ। মানুষ কার জন্য পরিশ্রম করবে? কার জন্য শরীরের ঘাম পানি করবে? কার জন্য হৃদয়ের রক্ত ঝরাবে? আপনি যদি এইসব প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে না মাদরাসায় আপনার মন বসবে, না মেহনত করতে মন চাইবে।

আল্লাহর রীতি অপরিবর্তনীয়

আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে, যুগের পরিবর্তন একটি চিরন্তন রীতি। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। শত বৎসর পূর্বের সময় ও যুগ দেখুন। কী খায়র ও বরকতের যুগ ছিল তা! বিশিষ্টজনেরা তো বটেই সেই যুগের সাধারণ লোকও এই যুগের বিশিষ্টজনদের চেয়ে গুণে-মানে শ্রেয় ছিল। ঈমানের কী তেজ ছিল তাদের! কী দ্বীনী মর্যাদাবোধ ছিল তাদের! দ্বীনী ইলম এবং হিফযে কুরআনের ক্ষেত্রে পুরুষ তো পুরুষ, নারীরাও ছিল ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। বর্তমান যুগ বস্তুপূজা ও উদাসীনতার যুগ। দ্বীন, দ্বীনের ইলম ও দ্বীন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি হয়ে পড়েছে কোণঠাসা। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলছি যে, শত পরিবর্তন সত্ত্বেও—যে পরিবর্তন পূর্বে হয়েছে এবং যা বর্তমানে হয়েছে বা পরবর্তীতে হবে—আল্লাহর রীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তাঁর রীতি তো অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর চিরন্তন রীতিতে যুগের পরিবর্তনের কোন প্রভাব পড়তে পারে না। এই সত্যটি যখন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তখন কুরআনের সাধারণ রীতির বাইরে গিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا - وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

‘আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না, আল্লাহর বিধানের কখনও কোন ব্যতিক্রম পাবে না।’

আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম কুদরত ও অপার জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বজগত ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে যে আইন ও বিধান, যে নিয়ম ও রীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার ব্যতিক্রম কখনও ঘটবে না। কিয়ামত পর্যন্ত সেসব বিধান ও রীতির কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। কুরআন মাজীদে অনুসন্ধান করে এবং হাদীস ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে এখন আমরা জানতে পারি যে, সেই নিয়ম ও রীতি, আইন ও বিধান কী? এর তালিকা অনেক দীর্ঘ। আমার ন্যায় শিক্ষানবীসের পক্ষে তার তালিকা প্রস্তুত করা সাধ্যের বাইরে। তবে আমার স্বল্প জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্টিগত ঐ বিধানাবলী ও নিয়ম-রীতির মধ্য থেকে তিনটি রীতির উল্লেখ করব। আমাদের জীবন এবং আমাদের মাদরাসা ও মাদরাসার লক্ষ্যের সঙ্গে যে রীতি তিনটির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

তন্মধ্যে একটি রীতি হল উপকারী বস্তুর নিকট মানুষের আত্মসমর্পণ, তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবনত হওয়া। উপকারী বস্তুকে স্বীকার করে নেওয়া ও তার মর্যাদা দান। উপকারীত্ব ও তার কেন্দ্রের সাথে মানুষের ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া। উপকারী বস্তুকে তালাশ করা। যদি তা লাভ হয় তাহলে তার মূল্যায়ন করা মানুষের স্বভাবধর্ম। উপকারী বস্তুর স্থায়িত্ব ও তার সজীবতা বহাল রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। যে বস্তুতে উপকার করার ক্ষমতা নাই তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে স্থায়িত্ব দানের কোন নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন—

فَإِذَا زُلْزِلَتْ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

‘যা আবর্জনা তা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়, এইভাবেই আল্লাহ তাআলা (ভ্রান্ত ও অভ্রান্তের) উদাহরণ দিয়ে থাকেন (যাতে তোমরা বোঝ)। (সূরা রাদ ১৩ : ১৭)

‘অধিক উপযোগীর স্থায়িত্ব’ নয় বরং কুরআনের ভাষা ও বর্ণনামূলক অনুযায়ী ‘উপকারীর স্থায়ীত্বের এই নীতি হাজার ও লাখ লাখ বছর যাবৎ কার্যকর হয়ে আছে। যুগের শত পরিবর্তন সত্ত্বেও এই নীতির কোন পরিবর্তন নেই। কিয়ামত পর্যন্ত এই নীতি অপরিবর্তিত রূপে বহাল থাকবে। উপকারী সত্ত্বার ক্রমশ উন্নতি

লাভ, ফলে ফুলে সমৃদ্ধি লাভ এবং নিজের মর্যাদা ও গুরুত্বের স্বীকৃতি লাভ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত চিরন্তন রীতি। উপকারী সত্ত্বায় পরিণত হওয়া হাজার বিরোধিতা ও শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার বড় অবলম্বন। এ ক্ষেত্রে পাবলিসিটি ও প্রচারেরও প্রয়োজন হয় না। উপকারী সত্ত্বার মধ্যে সৃষ্টি হয় অপরের ভালবাসা আকর্ষণের চৌম্বক ক্ষমতা। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে তার প্রতি সকলে আকৃষ্ট হয়। ভৌগোলিক সীমারেখাও সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। উপকারীজন যদি পাহাড়ের চূড়ায় যেয়েও আত্মগোপন করে তবে দুনিয়া সেখানে গিয়েও তাকে তালাশ করে বের করে নেবে। মানুষ তাকে মাথায় করে বরং চোখের মণিরূপে গ্রহণ করে নিয়ে আসবে। এটাই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত রীতি, যা হাজার হাজার বছর যাবৎ অপরিবর্তিতরূপে চলছে।

উপকারী সত্ত্বার অনুসন্ধান

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আপনারা নিজেদের মধ্যে উপকারীত্ব গুণ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করুন। তমসাস্থন্ন জীবনপথে আপনাদের দ্বারা যেন একজন পথিক আলোর সন্ধান পায়। আপনারা এরূপ গুণের অধিকারী হয়ে যান, যেন আপনার দ্বারা জ্ঞানবিষয়ক সমস্যার সমাধান লাভ হয়। আপনার সংসর্গে এলে ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি হয়, ঈমান সজীবতা লাভ করে। আপনার নিকট এসে মানুষ সুস্পষ্ট ধারণা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে যেতে পারে। আপনার মধ্যে এরূপ গুণ সৃষ্টি হওয়ার পর আপনি যদি আপনার ও জনগণের মাঝে প্রাচীরও নির্মাণ করেন, আপনি যদি দরওয়াজা বন্ধ করে বসে থাকেন আর লোকেরা যদি জানে যে, এখানে একজন উপকারী ব্যক্তি থাকেন, তার দ্বারা এই এই উপকার লাভ হয়, তাহলে লোকে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, দরজা ভেঙ্গে হলেও আপনার নিকট পৌঁছে যাবে।

এই পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাদ্দেরী ভূপালির একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক জটিল বিষয়কে সহজ ও সাধারণ উদাহরণ দ্বারা বোঝানোর দক্ষতা দান করেছিলেন। একবার জনৈক নবাব সাহেব তাঁর নিকট অনুযোগ করে বলল, হযরত! আমি বড় আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বহু টাকা ব্যয় করে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। কিন্তু মসজিদটিতে কেউ নামায পড়তে আসে না। হযরত মুজাদ্দেরী সাহেবের বোঝানোর পদ্ধতি ছিল বড় চমৎকার। অনেক সময় তা হেঁয়ালী বলে মনে হত।

তিনি বললেন, মসজিদের দরওয়াজা ইট দিয়ে বন্ধ করে দিন। নবাব সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। কারণ এতো সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থাপত্র! নবাব সাহেব

বললেন, হযরত! আমি তো মসজিদ নির্মাণ করেছি নামাযের জন্য। মানুষ আসবে, নামায আদায় করবে, মসজিদ আবাদ হবে আমার উদ্দেশ্য তো এটাই। আর আপনি বলছেন মসজিদে কোন দরজা না রেখে দরজার জায়গাটুকু ইট দিয়ে বন্ধ করে দিতে। এ কেমন পরামর্শ?

হযরত বললেন, আমার কথা তো এখনও শেষ হয়নি। দরজা বন্ধ করে দিন এবং ভিতরে একজন লোককে বসিয়ে দিন এবং তার হাতে কিছু পঞ্চাশ টাকার অথবা দশ টাকার কিংবা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে দিন। আর বাইরে ঘোষণা করিয়ে দিন যে, এই মসজিদে নোট বিতরণ করা হচ্ছে। আপনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু লোকে জানে না, নামাযের কী সওয়াব, নামায আদায় করলে কী লাভ। সুতরাং তারা মসজিদে কেন আসবে? তারা টাকার কী ফায়দা তা জানে। তারা জানে যে, পাঁচ টাকা ব্যয় করে কী কী ক্রয় করা যায়, পাঁচ টাকায় কী কী কাজ হয়। কিন্তু তারা জানে না যে, নামায দ্বারা কী কী ক্রয় করা যায়, তা দ্বারা কী কী ফায়দা হাসিল হয়। অথচ আপনি আশা করছেন যে, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট সহ্য করে তারা আসবে। তা হবে কী করে? দেখুন টাকা হাতে দিয়ে আপনি লোক বসিয়ে দিন, ঢোল পেটানোরও প্রয়োজন হবে না। দেখবেন, অল্প সময়ে এই কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে যে, আল্লাহ জানেন, নবাব সাহেব এই কাজ কেন করছেন, দরজার জায়গা ইট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন আর হাজার হাজার টাকা দিয়ে একজন লোককে ভিতরে বসিয়ে দিয়েছেন। লোকটি ঐ টাকা বিতরণ করছে। ফল এই হবে যে, তারা প্রাচীর ভেঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করবে। কেউ হাজার বাধা দিলেও তারা সে বাধা মানবে না।

তো আসল বিষয় হল উপকারিত্ব গুণ। যে গুণ থাকলে মানুষ পতঙ্গের ন্যায় ঐ গুণধারীর নিকট ভিড় করে। পতঙ্গকে বলতে হয় না যে, প্রদীপ জ্বলছে। কেউ কি কখনও ঘোষণা করে যে, হে পতঙ্গ! তোমরা প্রদীপের নিকটে আস? পানির ঝরনা যেখানে থাকে সেখানেই ভিড় করে পাখ-পাখালী, জীব-জানোয়ার ও মানুষজন। যুগ পরিবর্তনের অজুহাত তোলা দৃষ্টির দুর্বলতা ও অজ্ঞতা ও ভীকৃতার পরিচায়ক।

উপকারিত্ব গুণের সম্মোহনী শক্তি

আপনাদেরকে একটি মজার ঘটনা শোনাচ্ছি। ঘটনাটি শুনিয়েছেন লক্ষ্ণৌ শহরের একজন শীর্ষস্থানীয় ও নামজাদা ডাক্তার আবদুল হামিদ সাহেব মরহুম। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও পর্যাণ্ড অভিজ্ঞতার কথা হিন্দু-মুসলমান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করত। ভারত বিভক্তির পর বারাহবানকীর একজন বিতণ্ডালী, নামকরা

ব্যবসায়ী হিন্দু তাঁকে বিদ্রোপের সুরে বলল, কী ব্যাপার ডাক্তার সাহেব! আপনি পাকিস্তানে গেলেন না? তিনি বললেন, না, আমি হিন্দুস্তানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহ তাআলার কারিশমা! একবার ঐ হিন্দু ভদ্রলোক কঠিন রোগে আক্রান্ত হল। নানা রকম চিকিৎসা, বড় বড় ডাক্তারের পরামর্শ কোন কিছুতেই সে সুস্থতা লাভ করল না। অবশেষে হার স্বীকার করে সে ডাক্তার আবদুল হামিদ সাহেবের শরণাপন্ন হল। ডাক্তার সাহেব যখন তাকে দেখতে গেলেন এবং চিকিৎসা শুরু করলেন তখন বললেন, দেখুন, আমি যদি পাকিস্তান চলে যেতাম তাহলে কি আপনি আমাকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাতে পারতেন? আল্লাহর কী কারিশমা! হিন্দু ভদ্রলোকটি এই ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসাতেই আরোগ্য লাভ করে এবং তাকে চরম লজ্জা পেতে হয়।

আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আমি আপনাদের হাজারো সমস্যার সমাধান একটাই মনে করি। তা হল আপনারা আপনাদের উপকারীত্ব ও যোগ্যতার স্বীকৃতি আদায় করে নিন। আপনারা প্রমাণ করুন যে, আপনাদের নিকট যে জ্ঞান ও আদর্শ রয়েছে তা দুনিয়ার কারও কাছে নেই। দুনিয়ার নিয়ম হল, যে পণ্য যে দোকানে পাওয়া যায় মানুষ তা ক্রয়ের জন্য সেই দোকানেই উপস্থিত হয়। একজন গুণী অপর গুণীর নিকট উপস্থিত হয়, যার নিকট লাভ করা যায় হৃদয়ের পরিতৃপ্তি, আত্মিক রোগের ঔষধ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ছিলেন হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম। বাগদাদে তৎকালীন যুগের সকল মানুষের আকর্ষণের মধ্যমণি। কিন্তু তিনিও আত্মার খোরাক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, রুহকে শক্তিশালী করতে ছুটে যেতেন বাগদাদের একজন হৃদয়-সম্পন্ন ছাহেবে দিল বুয়ুর্গের দরবারে। ইলম ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাঁর সাথে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কোন সম্পর্ক ছিল না। একবার ইমাম সাহেবের এক ছেলে তাঁকে বলল, আব্বাজান! আপনি সেখানে গেলে আমাদের সকলের মাথা নীচু হয়ে যায়। লোকে নানা রকম কথা বলে। তিনি বললেন, বৎস! মানুষ যেখানে ফায়দা দেখে, লাভ দেখে সেখানেই যায়। আমি ঐ বুয়ুর্গের কাছে আমার কলবের ফায়দা পাই।

এই যে দরসে নিযামী, যা আজ কাগজের নোটের ন্যায় ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশে চলছে তা মোল্লা নিযামুদ্দীন ফিরিস্তি মহল্লী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বিন্যাসকৃত, যিনি ছিলেন উস্তাযুল উলামা, উস্তাযুল হিন্দ, আলেকুল শিরোমনি। জ্ঞান গরিমায়, ইলম ও পূর্ণতায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তিনি সাইয়েদ আবদুর রাজ্জাক বাঁসবী কাদেরীর মুরীদ ছিলেন— যাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল প্রাথমিক স্তরের। প্রাথমিক

স্তরের কিছু কিতাবাদি তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। কথা বলতেন উদ্‌ অঞ্চলের পূর্বী ভাষায়। মোল্লা নিযামুদ্দীন (রহ.) ঐ বুয়ুর্গের বাণীসমূহের একটি সংকলনও প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর নাম নিতেন তখন শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁর নাম নিতেন। এর কারণ আর কিছুই নয়। মোল্লা নিযামুদ্দীন নিজের জ্ঞান-গরিমার শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও নিজের মধ্যে একটা কিছুর অভাববোধ করতেন, যে অভাব তিনি পূরণ করতে পারতেন ঐ বুয়ুর্গের কাছে যেয়ে। মোল্লা নিযামুদ্দীন সকলের উস্তাদ ও গুরু ছিলেন। কিন্তু তাঁরও অস্বেষা ছিল এমন এক ব্যক্তিত্বের যেখানে যেয়ে তাঁর অনুভব হবে যে, তিনি কিছুই নন এবং এখনও তার অনেক কিছু জানার ও শেখার আছে।

হযরত মাওলানা আবদুল হাই বাড়হানাবী এবং হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর নাম কে না জানে। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ (রহ.) প্রথম জনকে ‘শায়খুল ইসলাম’ এবং দ্বিতীয় জনকে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ অভিধায় অভিহিত করতেন। তাঁরা দুইজন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর হাতে বায়আত ছিলেন। অথচ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সব স্তর অতিক্রম করতে পারেননি। দেওবন্দের প্রবীণ ব্যক্তিগণ বর্ণনা করেন, যখন সাইয়েদ সাহেব এখানে আগমন করতেন তখন উক্ত বুয়ুর্গদ্বয়ের অবস্থা এরূপ হত যে, সাইয়েদ সাহেব খাটে ঘুমিয়ে পড়তেন আর তাঁরা খাটের ডান পাশে ও বাম পাশে বসে থাকতেন। সাইয়েদ জগ্ৰত হয়ে কিছু বললে তাঁরা সেই কথা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীর স্বাদ উপভোগ করতেন।

নির্লোভ ও নির্মোহতার শক্তি ও সুফল

দ্বিতীয় গুণ হল নির্লোভ ও নির্মোহ গুণ। আল্লাহ-নির্ধারিত চিরন্তন রীতি হল, যে যাচনা করে লোকে তাকে ভয় করে। তার থেকে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের হাত বন্ধ করে রাখে, প্রত্যাশা ও যাচনার হাত গুটিয়ে রাখে মানুষ তার পদাবনত হয়। তাকে কিছু গ্রহণ করার জন্য খোশামোদ করে। লোভহীনতা ও স্বার্থ পরিত্যাগের মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রেম ও ভালবাসা আকর্ষণের ক্ষমতা। পক্ষান্তরে যাচনা ও কামনার মধ্যে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান। এও এমন এক চিরন্তন রীতি যুগের শত পরিবর্তন সত্ত্বেও যার কোন পরিবর্তন নেই। চতুর্থ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করুন কিংবা অষ্টম শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করুন এই একই চিত্র দৃষ্টিগোচর হবে। সর্বত্র একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন। এই চতুর্দশ শতাব্দীতেও আমরা ঐ একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। বুয়ুর্গানে দ্বীনের জীবন ইতিহাস

এবং তাসাওউফের ইতিহাসে এই জাতীয় ঘটনাবলীতে পূর্ণ। আমি সেসব ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণে যেতে চাচ্ছি না। এ ব্যাপারে আপনাদের নিজেদেরও অভিজ্ঞতা আছে। না থাকলেও আপনারা আপনাদের উস্তাদমণ্ডলী ও বুয়ুর্গদের নিকট তাঁদের উস্তাদ ও বুয়ুর্গগণের ঘটনাবলী নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন।

চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করুন পৃথিবীর প্রীতিভাজন হোন

তৃতীয় ও শেষ বৈশিষ্ট্য হল, চূড়ান্ত গুণের অধিকারী হওয়া, স্বকীয়তা সৃষ্টি এবং কোন বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন। উলুমে আলিয়াহ তথা কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান তো অনেক বড় বিষয়। علوم آليه তথা প্রাথমিক ও সহায়ক কোন শাস্ত্রেও যদি দক্ষতা ও পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় এমনকি এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন লিপিকারিতা ও নকলনবিসিতেও কেউ যদি পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে তাহলে তার পিছনেও ভাল ভাল আলেম ঘুরতে থাকে। বড় বড় লেখকগণ পর্যন্ত লিপিকার ও নকলনবিসদেরকে তোয়াজ করে, তাদেরকে খোশামোদ করে যেন তারা তাদের লিখিত কিতাবের নকল তৈরি করে ছাপার উপযুক্ত করে দেয়। কমপক্ষে ব্লক তৈরির জন্য মলাটের উপরে কিতাবের নামটা যেন লিখে দেয়। আপনি ইলম ও জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে যদি দেখেন যে, তিনি দরিদ্র ও বেকার জীবন কাটাচ্ছেন তাহলে বুঝবেন যে, তাঁর এমন কোন দুর্বল দিক রয়েছে বা এমন কোন দোষ ও সমস্যা রয়েছে, যার কারণে তাঁর শত যোগ্যতা ও দক্ষতা সত্ত্বেও তিনি বেকার জীবন কাটাচ্ছেন। উদাহরণত বদমেয়াজ, রাগীস্বভাব, মেয়াজের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, অলসতা, কাজের প্রতি অনাগ্রহ, শিক্ষকতায় নিস্পৃহা, অনিয়মানুবর্তিতা, কারও কথা সহ্য না হওয়া, অল্পতেই চটে উঠা, চঞ্চলমতিত্ব, কোন কর্মক্ষেত্রে টিকতে না পারা এই জাতীয় কোন না কোন দোষ অবশ্যই পাবেন। যে দোষের কারণে শত যোগ্যতা ও দক্ষতা সত্ত্বেও তিনি সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন, কর্মহীন থাকেন। যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কোন কাজে লাগাতে পারেন না। এই হচ্ছে অপরিহার্য চিরন্তন তিনটি শর্ত ও গুণ যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার চিরন্তন রীতি হল, যুগ যতই পরিবর্তিত হোক, যুগের সমাজ ও মানুষের মাঝে যতই মন্দ পরিবর্তন ঘটুক এই গুণ তিনটির মাঝে বহাল থাকবে মানুষের প্রেম ও ভালবাসা, তাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণে যাদুকরী ক্ষমতা। আজ মাদরাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষাসমাপনকারীদের প্রয়োজন শুধু এই তিনটি গুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা, এই শর্ত তিনটি পূরণ করা। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সহায় হোন।

যে ইলম বা জ্ঞান আল্লাহর নাম ব্যতীত হয়

তা মানবতা ধ্বংসের কারণ হবে

[সোহবাতিয়াবাগ হেদায়েতুল উলূম মাদরাসার নতুন একটি ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হযরত মাওলানা (রহ.) এই ভাষণটি দান করেন।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا
لَمْ يَعْلَمَ -

রাসূলের প্রতি প্রথম ইলমী বার্তা

শ্রদ্ধেয় মুরব্বী ভাই ও বন্ধুগণ!

আপনাদের সামনে যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তা সূরা ইকরার প্রথম পাঁচটি আয়াত। শিশুর লেখাপড়ায় হাতে খড়িকালে আয়াত পাঁচটিকে আবৃত্তি করানোর নিয়ম প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এই কিছুক্ষণ পূর্বে এই মাদরাসার ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে একজন শিশুকে উপরিউক্ত আয়াতগুলো পড়িয়ে এসেছি। এরই রেশ ধরে কিছু তত্ত্ব ও তথ্যের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রাক্কালে মক্কা মুকাররমা, আরব উপদ্বীপ সহ সারা পৃথিবীর অবস্থা দর্শনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে যে অশান্তির ঢেউ উঠেছিল, যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অশান্তি ও অস্থিরতাই হেরা গুহায় একটানা ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও ফায়সালায় হযরত ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পাঁচশত বছর পর প্রথমবার আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ওহী অবতরণের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপিত হল। ঐ সময়ে যদি সমগ্র বিশ্বের মেধাবী প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী জ্ঞানীশুণী ও দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হত যে, বলুন তো, পাঁচশত বৎসর পরে পুনরায় নতুন

করে ওহী অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীবাসী বার্তা লাভ করতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীবাসীর কল্যাণে কী বার্তা অবতীর্ণ হওয়া উচিত? তাঁদের প্রতি কিরূপ প্রত্যাশা আগত হওয়া উচিত? আপনাদের সামনে তো সারা বিশ্বের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নাজুক অবস্থা পরিদৃশ্যমান। সমগ্র মানবজাতি ব্যাধি ও পীড়ায় আক্রান্ত। তারা অজ্ঞ ও মূর্খ। তারা হয়ে গেছে বোধহীন। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাজার হাজার মেকী উপাস্যের উপাসনা চলছে। সমগ্র মানব জাতি যেন শিরক ও কুফরের শামিয়ানায় আচ্ছাদিত। আবার এই বার্তা ও ওহী অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে এরূপ এক দেশে যে দেশ অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় পূর্ণ, যে দেশের অধিবাসী নিরক্ষর আর যার উপর ওহী নাযিল হতে যাচ্ছে তিনিও নিরক্ষর-উম্মী, তাঁর পুরো সম্প্রদায় উম্মী ও নিরক্ষর, ইয়াহুদীরা তাদের প্রতি নিরক্ষর উপাধিই আরোপ করেছে। বলেছে-

ليس علينا في الاميين سبيل

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই নবীকে নিরক্ষর নবী বলে ঘোষণা করেছেন। তো এইরূপ অবস্থায় প্রথম ওহী ও প্রথম বার্তায় কী অবতীর্ণ হওয়া উচিত? আমি নিশ্চিত যে, সর্বোচ্চ মেধার অধিকারী ও তুখোড় প্রতিভাবান ব্যক্তিও তখন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত না যে, প্রথম ওহীতে, প্রথম আকাশ হতে অবতীর্ণ বার্তায় পাঠ, কলম ও ইলমের বিষয় উল্লেখ করা হবে। কারণ তৎকালে মক্কা মুকাররমায় ব্যাপক অনুসন্ধানের পর হয়তো দুই চারটা কলম পাওয়া যেতে পারত, এর বেশী নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হল, আর তিনি ঘাবড়ে গিয়ে হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর নিকট আগমন করলেন তখন হযরত খাদীজা তাঁকে নিয়ে গেলেন ওরাকা ইবনে নওফলের নিকট। কারণ তিনি লেখাপড়া জানতেন বলে মক্কায় আলোচিত ব্যক্তি ছিলেন। যেন লেখাপড়া জানাটা ছিল এক মহা কৃতিত্ব। তো এইরূপ নিরক্ষর সমাজে একজন নিরক্ষর নবীর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল হল তা ছিল اقرأ (তুমি পাঠ কর)। এটা ছিল এই বিষয়ের ইঙ্গিত বাহক যে, যে যুগের এখন সূচনা হচ্ছে তা লেখাপড়ার যুগ। ইলম ও কলম, জ্ঞান ও লেখনীর যুগ। কিন্তু নিছক লেখাপড়াই যথেষ্ট নয়। লেখাপড়া হতে হবে আল্লাহর নামে। নতুবা তা অনেক সময় বিষতুল্য হয়ে যায়। আল্লাহর নামবিহীন লেখাপড়াই মানুষকে হিংস্রতা ও বর্বরতা শিক্ষা দিয়েছে। শিক্ষা দিয়েছে যুদ্ধের কূট-কৌশল, লাখ লাখ মানুষকে আণবিক বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা ধ্বংস করার কৌশল এবং শহর-জনপদকে তছনছ করার কৌশল। এইজন্য আল্লাহর নামবিহীন

জ্ঞান গ্রহণযোগ্য জ্ঞান নয়। এটা কুরআন মাজীদের অসাধারণত্ব যে, তা প্রথমেই বলেছে "اقرأ" (পাঠ কর)। এখন পাঠের প্রয়োজন। প্রয়োজন দুনিয়ার সর্বত্র জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। তবে তা হতে হবে বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাওহীদের জ্ঞান, ইলাহী জ্ঞান, চরিত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান, নিজেকে চেনার জ্ঞান এবং খোদাভীতির জ্ঞান। যে জ্ঞানের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তা জ্ঞান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আজ দুনিয়াতে যে ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে এসেছে, শুধু স্বল্প কিছু মানুষ হত্যা নয় বরং জাতির পর জাতি দেশের পর দেশ ধ্বংস করার জন্য যে আণবিক বোমা তৈরি করা হয়েছে, যে জীবাণু বোমা তৈরি করা হয়েছে তা সবই ঐ জাতীয় জ্ঞানের ফসল, যে জ্ঞানের সাথে আল্লাহর নাম সম্পৃক্ত নেই। এই কারণে আল্লাহ তাআলা اقرأ (পাঠ কর)-র সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেছেন باسم ربك তোমার প্রভুর নামে পাঠ করো। তাহলেই জ্ঞান হবে হিতকর, মানুষের জন্য কল্যাণকর।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের নিকট কী দাবি করেন?

আমি ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসাবে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যদি দুনিয়ার বস্তুনিষ্ঠ ও যথার্থ ইতিহাস লিখতে যেয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যবহার করা হয় এবং অনুসন্ধান করা হয় যে, কবে থেকে জ্ঞান তার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, কবে থেকে তা নির্মাণ ও সৃষ্টির পরিবর্তে ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হয়েছে, তাহলে একজন ইতিহাস লেখক নিশ্চয়ই একথা লিখবে যে, যখন থেকে জ্ঞানের সম্পর্ক জগতের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা ও জগতের প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন থেকেই জ্ঞান হয়ে গেছে সর্বনাশের।

যে জ্ঞানের সূচনা হয় আল্লাহর নাম ব্যতীত এবং যা চলতে থাকে আল্লাহর নির্দেশনা ব্যতীত সেই জ্ঞান গ্রহণযোগ্য নয়, তা পতিত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য জ্ঞান। তা পরিহার করা উচিত। এরূপ জ্ঞান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া উচিত।

প্রথমে এই জ্ঞান লাভ করা উচিত যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে? আমাদের মালিক ও প্রতিপালক কে? বড় বড় বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, গবেষক ও দার্শনিকদের নিকট যখন এইসব মৌলিক প্রশ্নের বিশুদ্ধ জবাব ও জ্ঞান নাই যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা কে, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য কী, তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদের নিকট কী দাবি করেন, তিনি কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে বলেন, কোন্ পথে তিনি চলতে বলেন, এই জগত ও মানব সমাজ সম্পর্কে, এই দুনিয়ার পরিণতি সম্পর্কে তিনি কী বলেন তখন এসব বুদ্ধিজীবী গবেষক ও বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জ্ঞান হয়ে যায় বিষতুল্য; যা এক মুহূর্তে লাখ লাখ মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

কুরআন মাজীদ বলছে, পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। (সূরা ইকরা)

যে মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন রক্তের একটি পিণ্ড থেকে সেই মানুষ কী করে নিজের স্বরূপকে ভুলে যায়? কী করে সে উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হয়? একে অপরের রক্তপাত ঘটায়? কী করে জুলুম ও নির্যাতনের বাজার গরম করে তোলে? আজ মানুষ তার প্রকৃত পরিচয় ও স্বরূপ ভুলে যাচ্ছে। আজ ইউরোপ ও আমেরিকা এই সত্যকে ভুলে যাচ্ছে। ভারতবাসীও এই সত্যকে ভুলে যাচ্ছে। অথচ এখানে সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের যত উপকরণ পূর্বে ছিল এখনও তা বিদ্যমান আছে।

সুধী!

আপনারা দেখুন, এই উন্মত কত অল্প সময়ে কত বিপুল পরিমাণ বিশালাকারের সব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইউরোপের বড় বড় সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর নিকট এক ডজন পরিমাণ গ্রন্থাগারও ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যখন থেকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রথা চালু হয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি শাস্ত্রে মুসলমানরা হাজার নয়, লাখ লাখ গ্রন্থ প্রস্তুত করেছে এবং সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। এসব হতে পেরেছে ইলম ও কলমের দৌলতে। প্রথম ওহী এই কথা জানান দিয়ে দিয়েছে যে, এখন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ইলম ও কলমের যুগ, এই উন্মতের সাথে ইলম ও কলমের সম্পর্ক থাকবে চির অটুট। হাজারো ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হবে, যুগের পরিবর্তন ঘটবে হাজার রকমের কিন্তু কলমের সাথে এই উন্মতের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে না কখনো।

ভারতবর্ষকেই দেখুন। এখানে কত বড় বড় লেখক ও গবেষক সৃষ্টি হয়েছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শায়খ শরফুদ্দীন, ইয়াহইয়া মানীরী, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ। উর্দু সাহিত্য ও কবিতায় আল্লামা ইকবালের ন্যায় দার্শনিক ও গবেষককে দেখুন, যার কবিতায় দুনিয়া তোলপাড়।

সুধী!

আজ ইসলাম বিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাতে মুসলমানদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়, ইলম ও জ্ঞানের সাথে তাদের যে সম্পর্ক তা বিনষ্ট হয়ে যায়, নিজস্ব ভাষা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থেকে যায়, তাদের মৌলিক চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাস এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুসলমান যেন চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসগত ভাবে এবং সভ্যতা ও

সংস্কৃতিগতভাবে ধর্মচ্যুতির শিকার হয় সেই নীল নকশা পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এইরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য তীব্র প্রয়োজন অধিক হারে বিভিন্ন স্থানে মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করা। মহল্লায় ও মসজিদসমূহে সকাল ও সন্ধ্যাকালীন মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। এই উম্মত মুহাম্মাদী উম্মত। এই উম্মতের সাথে ইলম ও কলমের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। ইলম ও জ্ঞান ব্যতীত মুসলমান মুসলমানরূপে টিকে থাকতে পারে না। কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে যে জ্ঞান আমাদেরকে দান করা হয়েছে, যে তত্ত্ব ও তাৎপর্য আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তা না জানলে এই দ্বীনের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। কোন কোন ধর্মাবলম্বী ও তাদের নেতারা চায় কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের প্রসার না ঘটুক। কারণ তাতে তারা নিজেদের মৃত্যু দেখতে পায়। এর উদাহরণ আমি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারের একটি ঘটনা দ্বারা ব্যক্ত করে থাকি। একবার তাঁর দরবারে মশার দল এসে অভিযোগ করে বলল, আমরা বাতাসের কারণে কোথাও টিকে পাই না, বাতাস আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আপনি বাতাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বাতাসকে দরবারে উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন। বাতাসকে দরবারে উপস্থিত করা হলে বাতাসের তোড়ে মশারা সব উড়ে গেল। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন, বাদীর উপস্থিতি ব্যতীত তো কোন মামলার রায় দেওয়া যায় না। জ্ঞানের অবস্থাও তদ্রূপ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা হলে এই দ্বীন টিকে থাকবে আর তার প্রভাবে বাতিল মতাবলম্বীদের অস্তিত্ব উড়ে যাবে।

সুধী!

অতএব আমাদের সকলের মৌলিক কাজ হল, দ্বীনের ইলম ও জ্ঞানের প্রসারের জন্য, মুসলমানকে মুসলমানরূপে অস্তিত্বশীল রাখার জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের দ্বীন ও আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির হেফাজতের জন্য বহুল পরিমাণে দ্বিনী মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের উচিত, আমাদের সন্তানদেরকে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করা, শিরক ও পৌত্তলিকতার অপকারিতা ও ভয়াবহতা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেওয়া এবং এটা নিশ্চিত হওয়া যে, আমাদের সন্তানরা ভবিষ্যতে ইসলামের উপরই পরিপূর্ণভাবে টিকে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নিজের দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন। আমীন।

মানুষের বিপর্যয়ের কারণ জ্ঞান হতে

আল্লাহর নামের বিচ্ছিন্নতা

[১৯৯৩ সালে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির নব নির্মিত ভবনে কম্পিউটার বিভাগের উদ্বোধন কালে তিনি এই ভাষণটি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার মুহতামিম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাবে আল হাসানী সাহেব নদভী, আরবী বিভাগের প্রধান মাওলানা সাঈদুর রহমান আল-আযমী, কর্নেল মুহসিন শামসী, ড. মাসউদ উসমানী, ড. নাসিম আনসারী সহ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

সুধী!

এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দে আপ্ত। আমি অনুমানও করতে পারিনি যে, যে ভবনের ভিত্তি আমার হাতে স্থাপিত হয়েছিল সেই ভবন আজ এত উঁচু ও প্রশস্ত ভবনে পরিণত হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমি আমার প্রিয় সঙ্গী ও বন্ধুদেরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আনন্দের কথা এই যে, সত্যপ্রিয়তা, গঠনমূলক চিন্তা-চেতনা এবং সমাজ ও জাতির চাহিদা ও দাবি পূরণের প্রেরণাই এখানকার প্রাণ ও মূল চালিকাশক্তি। জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ও চরম উন্নতি সত্ত্বেও বর্তমানে গোটা পৃথিবী ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারও মাথার উপর উন্মুক্ত তরবারী আঘাতোদ্যত হলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনি।

বর্তমানে অর্থনৈতিক চরম উন্নতি ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতি যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার কারণ আল্লাহর নাম থেকে জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা। আল্লাহর নামের সাথে জ্ঞানের সম্পর্কহীনতা। আল্লাহ তাআলা জ্ঞানকে

তাঁর নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ যে আয়াতটি প্রথমে অবতীর্ণ করেছিলেন তা হল—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

আয়াতটি চিন্তা-ভাবনা ও গভীরভাবে উপলব্ধির দাবি রাখে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার জীবন নিয়ে চিন্তা করার, পরিবার-পরিজন সম্পর্কে চিন্তা করার, তার পরিবেশ ও সমাজ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ ও অবকাশ দান করেছেন। তবে এই সবকিছু হতে হবে তাঁর তত্ত্বাবধানে, তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী। তিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। এই বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল রাখতে হবে এবং এই বিশ্বাস যেন আমাদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে।

নিরক্ষর শহরে, নিরক্ষর নবীর উপর প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তা রাজ-রাজড়াদের দরবারেও তালাশ করে পাওয়ার মত নয়। যিনি কখনও লেখাপড়া করেননি তাকে বলা হল اقْرَأ (পাঠ কর)। যেন বলা হল যে, এখন যে জাতি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সে জাতি হবে শিক্ষিত জাতি, লেখাপড়ার জাতি। এই জাতির সম্পর্ক হবে জ্ঞানের সাথে। সেই সঙ্গে দিক-নির্দেশনাও দান করা হল যে, এই জ্ঞান হবে আল্লাহর নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে নির্দেশনা অধিকাংশ জাতিই উপেক্ষা করে চলেছে। আল্লাহ বলেছেন—اقْرَأ (পাঠ কর)। কিন্তু শুধু পাঠ করাই যথেষ্ট নয়। শুধু ‘পাঠ’ কোন কাজে আসবে না। বরং নিছক পাঠ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ধ্বংস হয়ে আনবে, ধ্বংসাত্মক চিন্তা ও মনোভাবের সৃষ্টি করবে, মানুষের মাঝে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা সৃষ্টি করবে, স্বজনপ্রীতি ও বন্ধুপূজার মনোভাব সৃষ্টি করবে, প্রবৃত্তি পূজার দিকে ধাবিত করবে।

যদি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা হয় এবং সত্যাস্থেষ্টী দৃষ্টিতে ইতিহাস লেখা হয় আর তা লিখতে যেয়ে অনুসন্ধান করা হয় যে, মানবতার অধঃপতন ও মানবতার বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে কখন থেকে, তাহলে নিশ্চয়ই শিরোনাম লিখতে হবে এভাবে যে, যখন থেকে জ্ঞানকে আল্লাহর নাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, আল্লাহর নাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্ঞান চলেছে স্বাধীন পথে তখন থেকেই শুরু হয়েছে মানবতার বিপর্যয়। বিপর্যয় শুরু হয়েছে তখন, মানুষ যখন তাঁর নাম বিস্মৃত হয়ে, তাঁকে অস্বীকার করে বরং বিদ্রোহ করে একথা বলেছে যে, এই জগতের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই অথবা সৃষ্টিকর্তা থাকলেও তিনি এই জগতের মালিক নন ও পরিচালক নন, তিনি শুধুই সৃষ্টিকর্তা, প্রশাসক নন। জগত যেন শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত তাজমহল, যা নির্মাণ করাটাই ছিল শুধু শাহজাহানের কাজ। এরপর এর তত্ত্বাবধান

ও পরিচালনের দায়িত্ব আর তার হাতে নেই। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মানুষ যা চাইবে তাই করবে, এতে তাঁর বলার কিছু নেই।

বন্ধুগণ! এই দুনিয়া তাজমহল নয়, কুতুব মিনারও নয়; বরং এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্মিত কারখানা, তিনিই এককভাবে এই দুনিয়া পরিচালনা করছেন।

اَلَا لَهُ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ

সৃষ্টি তাঁরই, শাসনও তাঁরই।

আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এবং প্রকৌশল ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এখন প্রয়োজন ছিল আল্লাহর নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। আর এই কাজ তাদের দ্বারাই সম্ভব, যাদের বুনியাদ রচিত হয়েছে আল্লাহর নামের উপর। এই ইতিহাসে সমৃদ্ধ হয়েই যাদের যিন্দেগীর সূচনা হয়েছে।

এই উম্মতের ইতিহাস শুরু হয়েছে আসমানী ওহীর মাধ্যমে, উম্মী নবীর পথ-নির্দেশনা ও তাঁর পয়গামের মাধ্যমে। এই উম্মতের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে জ্ঞানের সাথে সর্বদা আল্লাহর নামের সম্পৃক্ততার উপর। আজ ইউরোপ ও আমেরিকার যে করুণ দশা তা তাদেরই সৃষ্টি। বর্তমানে সমগ্র দুনিয়ার মোড়লীপনা তাদের হাতে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনাসহ সর্বক্ষেত্রে তাদের মোড়লীপনার একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান। আল্লাহর নামের সাথে জ্ঞানের যে সম্পর্ক ছিল তারা তা ছিন্ন করে দিয়েছে। প্রয়োজন ছিল জ্ঞানকে আল্লাহর নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে চলার। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী, তাঁর ছত্রছায়ায় জ্ঞানের অগ্রসরতার। তাঁর নামের বরকতও তার সাথে থাকার। তাহলেই নানা শাখা-প্রশাখাসহ আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আমাদের গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, আমাদের বিদ্যাপীঠগুলো, গবেষণাগারগুলো হত উপকারী ও কল্যাণকর। আল্লাহর শোকর যে, ক্ষুদ্র পরিসরে ও স্থানীয় পর্যায়ে হলেও বর্ণিত পথে আমরা এক কদম অগ্রসর হলাম। আমাদের এ পদক্ষেপ অত্যন্ত বরকতময়। আমি আমার সহকর্মী ও বন্ধুবর্গকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যারা এই পদক্ষেপের সাথে সম্পৃক্ত। আলহামদুলিল্লাহ উন্নতির সমূহ নিদর্শন আমাদের সামনে দৃশ্যমান। এই সুযোগে আমি আল্লামা ইকবালের একটি কবিতাংশের দ্বিতীয় পংক্তি আবৃত্তি করছি—

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দানের।

সুধী!

কম্পিউটার বিভাগ উদ্বোধন করার সুযোগ দান করে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমার স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, এর পূর্বে কম্পিউটার সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমি লেখাপড়ার মানুষ। আমার সম্পর্ক কিতাব ও কলমের সাথে। আমি যখন কম্পিউটারের কী-বোর্ডে আঙ্গুল রাখলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় কিছু চিত্র ভেসে উঠল। তখন আমার মস্তিষ্কে এই কথা উদিত হল যে, প্রকৃতপক্ষে আব্বাহ তাআলা তো মানুষকে, বিশেষত মুসলমানকে কম্পিউটারই বানিয়েছিলেন। তার মধ্যে সকল বিষয় সৃষ্টিগতভাবে গচ্ছিত রাখা আছে। সকল গুণ ও উৎকর্ষের আকর সে। প্রয়োজন ছিল শুধু আঙ্গুল চাপনের। তাহলেই তার সকল সুপ্ত গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। সে আঙ্গুল হল নবীকে চেনার আঙ্গুল। যুগের দাবি চেনার আঙ্গুল। সমাজ ও জাতির প্রয়োজন সমাজ ও জাতির চাহিদা পূরণের আঙ্গুল। এ এমন আঙ্গুল, যা জাতির গতি সৃষ্টি করে। জাতিকে মনষিলে মকসুদে, অভিশ্রু লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। এই আঙ্গুলের ব্যবহার হোক আর মানবতার চিত্র স্পষ্ট হোক। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সকল মানুষ তো দূরের কথা মুসলমানরাও আজ আর কম্পিউটার রূপে থাকেনি। মুসলমানদের মধ্যে এই চেতনা, এই উপলব্ধি নেই যে, আমরা কোন কাজে আদিষ্ট। আমাদেরকে কী পান করানো হয়েছে। আমাদের মাঝে কোন বিষয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে।

আজ কম্পিউটার যে কাজ করছে সেই কাজ করা উচিত ছিল মুসলমানদের। যখনই ইলাহী নির্দেশ সামনে আসে, যখনই শরীয়তের নির্দেশ শোনানো হয়, যখনই সমাজের ও জাতির প্রয়োজন ব্যক্ত করা হয় তখনই প্রয়োজন ছিল নিজের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভা ও চেতনাকে আঙ্গুল চাপনে জাগরূক করে তোলা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নিজের চেতনাকে জাগ্রত করতে আঙ্গুল চাপনের কাজ আর হচ্ছে না। সুতরাং মানুষ নামক কম্পিউটারটি নিষ্ক্রিয় হয়েই রয়ে গেল।

যে প্রতিষ্ঠানটিতে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উচিত এই চেতনা ও অঙ্গীকার, এই সংকল্প ও দৃঢ়তা, এই সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া যে, আমরা শুধু শাস্ত্রীয় জ্ঞানই শিক্ষাদান করব না, বরং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আব্বাহ পরিচিতির জ্ঞানও শিক্ষাদান করব। যে জ্ঞান আমরা দান করব তার সঙ্গে যুক্ত করে দেব আব্বাহ পরিচিতির জ্ঞান, তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার

করণের জ্ঞান। তিনি যে জগতের সৃষ্টিকর্তা, অপার কুদরতের অধিকারী, তাঁকে সন্তুষ্ট করাই যে আসল ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কাজ ও জীবনের লক্ষ্য, নবীগণের আনীত বার্তার প্রতি শুধু বিশ্বস্ত থাকাই নয়, বরং সে অনুযায়ী আমল করা, জীবন পরিচালনা করাই প্রকৃত দায়িত্ব— এই উপলব্ধি জাগ্রত করে দেওয়া। আজ পৃথিবীতে জ্ঞানচর্চার সাথে এই সকল বিষয়ের সংশ্লিষ্টতাই সমূহ বিপর্যয়ের কারণ। আজ আমেরিকা ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে জীবনের নানাবিধ উপকরণের পর্যাপ্ত উপস্থিতি সত্ত্বেও মূল লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ আর কিছু নয়, কারণ শুধু জ্ঞানের সাথে উপরিউক্ত বিষয়াবলীর সংশ্লিষ্টতাই। যার কারণে মানবতার সেবা ও সুরক্ষার পরিবর্তে মানবতার বিপর্যয়ই শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক সফরে ওয়াশিংটনে বিভিন্ন স্থানে আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। একদিন ইসলামী সেন্টারে বক্তৃতা করতে হল। আমি পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। মনে করলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে কারী সাহেব কুরআনুল কারীম থেকে যে আয়াত তেলাওয়াত করবেন তার আলোকেই কথা বলব। কারী সাহেব সূরা কাহ্ফ থেকে একটি অংশ তেলাওয়াত করলেন। অংশটিতে বলা হয়েছে যে, এক বাগানের মালিক বলেছিল, আমার মনে হয় না যে, এই বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা কাহ্ফ ৩৫)

কথাটি সে বলেছিল অত্যন্ত ঔদ্ধত্য সহকারে এবং অহংকার থেকে। তার এক সঙ্গী ছিল মুমিন। সে তাকে বলল—

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

যখন তুমি বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে না যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর দেওয়া শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (সূরা কাহ্ফ ৩৯)

আয়াতটির সূত্র ধরে আমি বললাম, আমেরিকাতে সবকিছু আছে। কিন্তু الله আল্লাহ যা চান তাই হয়— একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লোক নাই। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আজ আমেরিকা সবকিছু করে, পরোপকারও করে। কিন্তু এর প্রতিদান স্বরূপ কৃতজ্ঞতাটুকুও তারা পায় না। সারা পৃথিবীতে তাদের কর্মকাণ্ডের কোন ফল প্রকাশ পাচ্ছে না। পৃথিবীর নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা, একের প্রতি অপরের বিশ্বাস ও আস্থা, একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাশীলতা এসবের কিছুই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। তার কারণ তাদের কর্মকাণ্ডে আন্তরিকতার অভাব। ঈমান ও ইহতিসাবের অভাব। ঈমানী উত্তাপ ও ঈমানী আলোড়নবিহীন কর্মকাণ্ডের পরিণাম এইরূপই হয়।

আমি বলছি যে, আজ আমেরিকায় সকল নেয়ামত বিদ্যমান, আরাম-আয়েশের সকল উপকরণ বিদ্যমান, শান্তির সকল উপকরণ বিদ্যমান কিন্তু প্রকৃত যে শান্তি লাভের প্রয়োজন ছিল সেই শান্তি লাভ হচ্ছে না। কারণ সেখানে الله-এর চেতনা নাই, আল্লাহ যা চান তাই করেন- এই বিশ্বাস নাই। আমরা চাই এরূপ প্রতিষ্ঠান আরও প্রতিষ্ঠিত হোক কিন্তু তা হোক الله-এর ছায়াতলে, আল্লাহর নামের আশ্রয়ে। জ্ঞান ও আল্লাহর নাম একসাথে চলুক।

আমি আজ স্পষ্টরূপে বলছি- যদিও কথাটি বলার প্রয়োজন ছিল অতি বড় প্লাটফর্মে তবুও আমাদের এই ক্ষুদ্র মজলিসে কথাটি বলছি যে, যত দিন জ্ঞান ও আল্লাহর নাম জুটি না বাঁধবে, জ্ঞানের সাথে আল্লাহর নাম সম্পর্কযুক্ত না হবে তত দিন এই জ্ঞান দুনিয়ার উপকার সাধন নয় বরং দুনিয়ার ধ্বংস সাধন করবে, দুনিয়া অগ্রসর হবে ধ্বংস অভিমুখে, দুনিয়ার আত্মহননের পথ হবে উন্মুক্ত। জ্ঞানের সাথে আল্লাহর নামকে সম্পৃক্ত করা না হলে কাক্ষিত সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা, পারস্পরিক আস্থা ও সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয়গুলো কখনও অর্জিত হবে না।

আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি এবং আপনাদের সামনে ব্যক্ত করছি যে, আলহামদুলিল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বুনিয়াদ ও মৌলিক নীতির উপরই। আমার বিশ্বাস ও প্রত্যাশা যে, প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা এই ভিত্তির উপরই অবিচল ও অটুট থাকবে। প্রতিষ্ঠানটি চলবে দ্বীনের ছায়ায়, দ্বীনী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সঙ্গ্রে নিয়ে, মানবতার কল্যাণকে সাথে নিয়ে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন, যে মর্যাদায় তাদেরকে ভূষিত করেছেন সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেই মর্যাদার উপলব্ধি ধারণ করে এই প্রতিষ্ঠানটি চলবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আজ তীব্র। আল্লাহর নিকট দুআ করি, যেন এইরূপ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা উন্নতির শীর্ষ সোপানে উপনীত হয়। শুধু এইরূপ কারিগরী প্রতিষ্ঠান নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানেই আল্লাহর নাম বিদ্যমান থাকা জরুরী।

জরুরী আল্লাহর নামের আলো বিদ্যমান থাকা, তাঁর নির্দেশনা বিদ্যমান থাকা। আল্লাহর নামের প্রতি সমীহ থাকা। শুধু সমীহ নয় বরং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ হতে হবে। এরূপ না হওয়ার কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও নিরাপত্তা ও শান্তি অর্জিত হচ্ছে না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা মানব সমাজের যতটুকু উপকার হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ দ্বীন ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার কথা আমি এখানেই শেষ করছি এবং আপনারা আমাকে

যে সম্মান দান করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহর নিকট দূআ করি, তিনি যেন প্রতিষ্ঠানটিকে জীবন্ত রাখেন এবং উন্নতি দান করেন।

وما علينا الا البلاغ المبين

আলেমগণের সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব আধুনিক যুগের

সন্দেহবাদী ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রশান্তি স্থাপন

[দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ এটি। দারুল উলূমের নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনালগ্নে ভাষণটি প্রদানের কথা ছিল। কিন্তু রমযানুল মুবারকের পর পাকিস্তান, তুরস্ক, লণ্ডন ও হেজাযসহ বিভিন্ন দেশের সফর এবং স্বদেশের মুসলিম পার্সোনাল 'ল' বোর্ডের একাধিক অধিবেশনে যোগদানের ব্যস্ততার কারণে তা হয়নি। পরবর্তীতে তিনি এই ভাষণটি প্রদান করেন। চিন্তার খোরাক সরবরাহকারী এই ভাষণটিতে একটি ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটিত হয়েছে।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বড় অংশ যথাযথ সংরক্ষিত হয়েছে এবং সে ইতিহাস নির্ভরযোগ্যও বটে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস সংরক্ষিত হয়নি। পৃথিবীর সব ইতিহাসই যদি সংরক্ষিত হত, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নবুওয়াতের ইতিহাস সংরক্ষণের প্রতি যদি গুরুত্বারোপ করা হত অথবা বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ আসমানী সহীফা যদি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হত, ঐ সকল সহীফা নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং তার বাহকগণ ঐ সকল সহীফার আলোকে যেভাবে মানবজাতিকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, তাদের সঙ্গে দ্বীনের পরিচয় ঘটিয়ে বিশুদ্ধ জীবনাচারে অভ্যস্ত করেছেন তা যদি সংরক্ষিত হত তাহলে এটা প্রমাণ করা যেত যে, প্রত্যেক যুগে প্রেরিত নবী, তাঁদের নবুওয়াত, তাঁদের আনীত বার্তা, তাঁদের কর্মধারা ও দায়িত্বের সাথে গভীর ঘনিষ্ঠতা ও সামঞ্জস্য ছিল তৎকালীন যুগের প্রয়োজন, তৎকালীন যুগের মানবজাতির ক্রটি-বিচ্ছাতি, তাদের চিন্তাধারা, তাদের জীবনের জ্ঞানগত ও কর্মগত, বিশ্বাসগত ও চরিত্রগত বিচ্ছাতি ও ভ্রষ্টতার।

বর্তমানে আমাদের নিকট ইতিহাসের যে নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার ও রেকর্ড সংরক্ষিত আছে এবং কুরআন মাজীদে মাধ্যমে আমরা যে আলো ও নির্দেশনা পাই তা দ্বারা আমাদের এই দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়। এর কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন সে যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তৎকালীন যুগের মানব সমাজ তাওহীদের বিশ্বাস বিবর্জিত হয়ে নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। মনুষ্য মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা তৎকালীন মানবসমাজে বিশ্বৃতির আড়ালে চলে গিয়েছিল। আল্লাহর সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক কার্যত বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের মাধ্যমে যে নব যুগের, যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল তা এখনও চলছে এবং সত্যিকারার্থে তাঁর দাওয়াত ছিল তাঁর পূর্ববর্তী যুগ ও তাঁর পরবর্তী যুগের মধ্যকার ভেদরেখা। আমি কোন এক বক্তৃতায় যেমনটা বলেছি যে, পৃথিবীতে যে দুটি ধারা যুগ পরস্পরায় চলে আসছে সে দুটি ধারার জন্য যদি কোন নাম তালাশ করা হয়, তাহলে দুটি নাম আমরা পাব। এক. ইবরাহীমিয়াত, দুই. বারহামিয়াত (ব্রাহ্মণ্যবাদ)। আমি নুন অক্ষরটিকে (বাংলায় ণ') ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়েছি, যাতে মানুষ ভুল না বোঝে। এই দুটি ধারা হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। প্রথম ধারাটি বিশুদ্ধ তাওহীদের ধারা। এই ধারায় নিহিত রয়েছে মনুষ্য মর্যাদার পুনরুদ্ধার ও নবায়ণ। এই ধারার সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ তাআলার প্রেম ও ভালবাসা, আল্লাহতে লীনতা ও তন্মুখতা।

এই কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাওহীদের আলোচনা এসেছে বার বার। কোন কোন রুকুর পুরোটা জুড়েই বিশেষত সূরা ইবরাহীমের শেষ রুকুর আয়াতসমূহে বিশুদ্ধ তাওহীদ, আল্লাহর সাথে অপরিমেয় সম্পর্ক, তাঁর প্রেম ও ভালবাসা, তাঁর জন্য নিবেদিত প্রাণ হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে এই সবকিছুর প্রমাণ মেলে তৎকর্তৃক প্রাণাধিক পুত্রের গলায় ছুরি চালানোর মধ্যে। আল্লাহ তাআলা যার সত্যতা তুলে ধরেছেন এই ভাষায়—

يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছ। আর আমি এইভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে বিনিময় প্রদান করে থাকি।

এটা ইবরাহীমী দ্বীনের বৈশিষ্ট্য, ইবরাহীমী মেযাজ ও ইবরাহীমী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য।

এরপর হযরত সুলাইমান ও দাউদ (আ.)-এর যুগের আগমন ঘটল। যুগটি ছিল রাজ-রাজত্বের ও শিল্প-কারিগরির উৎকর্ষের যুগ। এইজন্য আল্লাহ তাঁদের আলোচনায় বিশেষভাবে সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বের কথা আলোচনা করেছেন।

رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْفِي لَاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন আমার পরে যা অন্য কারও জন্য শোভনীয় না হয়। (সূরা সোয়াদ ৩৫)

আরও বলেছেন-

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

‘আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত।’ (সূরা সোয়াদ ৩৬)

এরপরে আলোচনা করা হয়েছে জীনদের সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাদেরকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বশীভূত করে দিয়েছেন সেই আলোচনা।

হযরত দাউদ (আ.) প্রসঙ্গে আলোচনায় তাঁর জন্য লোহাকে কীরূপ নরম করে দেওয়া হয়েছিল সেই আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدَ

‘এবং আমি তার জন্য নরম করে দিয়েছি লোহাকে।’

এ থেকে বোঝা যায় যে, সেই যুগটি ছিল শিল্প ও কারিগরি বিদ্যার বিস্তৃতি ও উন্নতির যুগ। এরপর আমাদের সামনে আসে ইউনানী যুগ। এই যুগকে বলা হয়-দর্শন, গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎকর্ষের যুগ। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও তাঁর নবুওয়াতের প্রকাশ ঘটেছিল ইউনানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিশেষভাবে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি মৃতকে জীবিত করছেন, অসুস্থকে সুস্থ করছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মসীহী কারিশমা এবং তাঁর জন্য আসমান থেকে খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ কুরআনুল কারীমে বিবৃত হয়েছে। তাঁর হাতে পর্যাপ্ত মুজিয়া প্রকাশের ঘটনা আমরা জানি।

মোটকথা হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের পরিবেশ ও সমাজের সাথে তাঁর হাতে প্রকাশিত মুজিয়াসমূহের বেশ মিল ও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ইলাহী বিবেচনা খাতামুল আঘিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এমন এক যুগ নির্বাচিত করেছে যে যুগ সর্বক্ষেত্রে মানবজাতির উন্নতির যুগ। জীবনের ব্যাপ্তি, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় মানুষের বিচরণ, মানুষের সমূহ চাহিদা ও সমস্যা এবং সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মানুষের গভীর সম্পৃক্ততার যুগ। যেহেতু তিনি ছিলেন শেষ নবী, তাঁরই শিক্ষা ও আদর্শকে যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে সেহেতু মানব জীবন ও মানবজাতির জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের মধ্যে সুপ্ত আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাকে, শক্তি ও সামর্থ্যকে এবং সফলতার সকল উপকরণকে, তাদের সকল যোগ্যতাকে উজাড় করে দেওয়ার। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন যুগের আগমন ঘটবে না। শেষ নবীর যুগই নিরবচ্ছিন্নভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। অতএব মানুষকে তার বুদ্ধি ও প্রতিভার, তার উপলব্ধি ও জ্ঞানের এবং শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োগ ঘটাতে হবে পরিপূর্ণরূপে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ন্যায় মহাশব্দ আপনাদেরকে দান করেছেন। যে কুরআন ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলনাহীন দৃষ্টান্ত, যার নজীর কোন মানুষের পক্ষে উপস্থাপন করা অসম্ভব। আরববাসী কবিতা ও সাহিত্যে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করেও তারা এই কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে পারেনি। অপর দিকে কুরআনুল কারীমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃতির এরূপ অমিত সম্ভাবনা সুপ্ত রাখা হয়েছে এবং এরূপ সূক্ষ্ম নির্দেশনা ও ইঙ্গিত তাতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে যে, যখনই মানুষের জ্ঞান গবেষণা- চাই তা যে কোন ক্ষেত্রে হোক না কেন, চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হবে তখন তা তার সম্ভাবনাকেই শুধু প্রমাণ করবে না বরং তার বাস্তবতাকে নির্দেশ করবে।

আর তাই কুরআনুল কারীমে رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا এবং عِلْمَ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ বলে জ্ঞানের যে মাহাত্ম্য ও বিশালতা ও তার অসীমতা তুলে ধরা হয়েছে তা শুধু কুরআনুল কারীমেই পাওয়া যায়। এর অনিবার্য ফল বের হয় এই যে, এই উম্মতের আঁচলকে জ্ঞানের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই উম্মত জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চা হতে, চিন্তা ও গবেষণা হতে, রচনা ও লেখনী হতে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এটা কুদরতে ইলাহীর ফায়সালা যে, এই উম্মতের অভিযাত্রা, তাদের কর্মতৎপরতা, তাদের রুচি ও ঝোঁক এবং তাদের সফলতা জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত থাকবে।

সুধী! আমার এই দাবির সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ প্রথম ওহী। প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল افر 'পাঠ কর' শব্দ দ্বারা।

যদি পৃথিবীর বড় বড় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী-গুণীকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করা হত যে, দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর পর ওহী অবতরণের মাধ্যমে আকাশ ও পৃথিবীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হতে যাচ্ছে এবং মানুষকে আসমানী বার্তা, ঐশী পয়গাম দান করা হচ্ছে, বলুন তো এই প্রথম বার্তার সূচনা হতে পারে কোন শব্দ বা কোন বাক্য দ্বারা? আমি অকাট্য দাবি করে বলতে পারি যে, তাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন রকম সব শব্দ এবং বিভিন্ন রকম সব বাক্য উদ্ভূত হত। কেউ বলত, প্রথম ওহীর সূচনা হওয়া উচিত এই বাক্য দ্বারা—

اعرف نفسك

‘নিজেকে চেন।’

কারণ মানুষ তখন আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়েছিল, নিজের উৎসের সন্ধান তারা হারিয়ে ফেলেছিল। কেউ বলত, প্রথম ওহীর সূচনা হওয়া উচিত এই বাক্য দ্বারা—

اعبد ربك

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর।’

কেননা তখন মানুষ পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, বিশুদ্ধ ইবাদত বিন্ধুত হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলত, এইরূপ, কেউ বলত ঐরূপ। কিন্তু কেউ বলত না যে, افر 'পাঠ কর'—এই শব্দ দ্বারা ওহীর সূচনা হওয়া উচিত। কারণ যার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে তিনি নিজে নিরক্ষর। তিনি যে জাতির মাঝে প্রেরিত হয়েছেন সেই জাতিও নিরক্ষর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

‘তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য হতে।’

ইয়াহুদীরাও তাঁকে উম্মী বলত। যে দেশে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সে দেশটি ছিল উম্মী বা নিরক্ষর দেশ। যে শহরে ওহী নাযিল হচ্ছিল সেই শহর তথা মক্কায় প্রচুর অনুসন্ধানের পর সাক্ষর ব্যক্তি হয়তো পাওয়া যেত দুই-চারজন, এর বেশি নয়। লেখাপড়া জানা ব্যক্তির জন্য পৃথিবীতে বহু শব্দের ব্যবহার প্রচলন রয়েছে।

লেখাপড়া জানা ব্যক্তিকে বলা হত কাতেব। কলম দ্বারা লিখতে পারাটাকেই মনে করা হত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গুণ। যেন লিখতে পারাটা এক মহা দুঃসাধ্য কর্ম। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে জ্ঞান আত্মস্থ করার এবং জ্ঞানের সব দাবি পূরণের যে অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতা দান করেছেন এবং এই উম্মতের সাথে জ্ঞানের যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাকে আমরা এক কথায় চুম্বক বলে ব্যক্ত করতে পারি। এ কারণেই প্রতি যুগে জ্ঞানের সাথে এই উম্মতের সম্পর্ক অটুট রয়েছে এবং এই কারণেই প্রত্যেক যুগে এই উম্মত নতুন নতুন জ্ঞানী-গুণী, নতুন নতুন শাস্ত্রজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও জিনিয়াস ও প্রতিভা জন্ম দিয়েছে।

যত দিন জ্ঞানের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে তত দিন সমূহ জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হতে থাকবে। চাই তা সভ্যতা সংক্রান্ত হোক কিংবা জ্ঞান সংক্রান্ত হোক কিংবা বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সংক্রান্তই হোক। দ্বীন ও শরীয়তের আলোকে সেই সকল জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানও অব্যাহত থাকবে, উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান দানও অব্যাহত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম চতুষ্টয় এবং উম্মতের অন্যান্য মুজতাহিদগণকে পেশ করতে পারি। এটাকে নিছক আকস্মিক কোন ঘটনা বলা যায় না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সজীব মস্তিষ্কের অধিকারী ও প্রতিভাবান এরূপ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, যারা রোম ও ইরানের ন্যায় উন্নত সভ্যতার অধিকারী সাম্রাজ্যের মোকাবেলা করতে এরূপ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, যার কোন দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্ম উপস্থাপন করতে পারবে না। তদ্রূপ ইমাম চতুষ্টয় ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এরূপ প্রতিভাবান আইনবিদ ছিলেন যে তাঁরা জীবন ও দ্বীনের মৌল নীতিমালার মধ্যে সঙ্গতি বিধান করতে এরূপ অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন, যা না রোমীয়দের মধ্যে পাওয়া যায়, না ইরানীদের মধ্যে, না ইউনানীদের মধ্যে, না অন্য কোন জাতির মধ্যে। তাঁরা ছিলেন স্ব-যুগের সর্বাধিক প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁদের কীর্তি শত শত বৎসর যাবৎ দীপ্যমান ও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের কীর্তির সঠিক মূল্যায়ন আজ কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

যখন ইউনানী জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবী ভাষায় অনূদিত হল তখন তা ইলম ও জ্ঞান চর্চাকারীদের মধ্যে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আজ আর কেউ অনুমানও করতে পারবে না। ইউনানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামনে মানুষ তখন হয়ে পড়েছিল বুদ্ধি-বিভ্রান্ত। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা তখন এক রকম ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত থাকাকে মানুষ গর্বের বিষয়

বলে মনে করত। কিন্তু ইমাম আবুল হাসান আশআরী, সাইয়েদ আবদুল কাদের জিলানী, ইমাম গায়যালী, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী, শায়খ মঈনুদ্দীন চিশতী, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ প্রতিভাবান ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাদের নিজ নিজ যুগে সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা যুগের স্রোত ও গতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে যুগকে দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ গতি ও স্রোত। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তারা মোকাবেলা করেছিলেন ভ্রান্ত ইউনানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং সমূহ বিপদ থেকে দ্বীনকে করেছিলেন নিরাপদ।

‘যুবক শ্রেণীর মন-মস্তিষ্কে সমূহ সন্দেহ ও সংশয়ের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে নতুনভাবে তাদের মন ও মস্তিষ্কে ঈমান ও ইয়াকীনের ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের পর ইংরেজ-সংস্কৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে এরূপ প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল যে, সরাসরি দ্বীনকে অস্বীকার না করলেও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান ও সংশয়যুক্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন যুগের অটল ঈমানের অধিকারী পরিবার সমূহ থেকে জন্ম নেওয়া মাশায়েখ ও সুফীগণের অবস্থাও ছিল এইরূপ যে, যদি তাঁদের পিতা-মাতার বিশেষ তত্ত্বাবধান তাঁদের প্রতি না থাকত এবং তাঁরা যদি বুযুর্গদের সংসর্গ লাভ না করতেন, বুযুর্গদের সতর্ক দৃষ্টির অধীনে যদি তাঁরা প্রতিপালিত না হতেন, তাহলে চিন্তা ও বিশ্বাসগত ইরতিদাদ ও বিচ্যুতি ব্যাপক আকার ধারণ করত এবং গোটা হিন্দুস্তান এই ইরতিদাদের শিকার হয়ে যেত।

আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর করুণায় ঠিক সময় মতো যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেন, তাহলে তিনিই জানেন এই দেশের মুসলমানদের অবস্থা কী রূপ হত। এটা শুধু হিন্দুস্তানের বৈশিষ্ট্য নয়, যখনই ইসলামী ইতিহাসের দীর্ঘকালীন সময়ে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তখনই আল্লাহ তাআলা এরূপ কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাঁরা দ্বীনের সাথে এই উন্মত্তের সম্পর্ক অটুট রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন। এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকা প্রয়োজন, থাকা উচিত।

আমাদের দায়িত্ব হল— এই ধারাকে অব্যাহতভাবে চলমান রাখা। আমি আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দকে বলতে চাই, কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বড় আলেম ও লেখক ও গবেষক সৃষ্টি হয়ে যাওয়া যথেষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠান এমনকি দ্বীন ও মাযহাবও ইতিহাস দ্বারা চলে না। বরং তা চলে এই ধারা অব্যাহতভাবে গতিমান

থাকার দ্বারা। কোন কর্মসূচী ও আন্দোলন কোন একজন গবেষক ও চিন্তাবিদ সৃষ্টি করে দিল কিংবা একজন বড় লেখকের জন্য দিয়ে দিল- শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয়।

এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, যখন নিজেদের পূর্বসূরীদের কীর্তি নিয়ে শুধু গর্ব করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, তখন নিজেদের চিন্তাশক্তি অথর্ব ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। নিছক পূর্বসূরীদের কীর্তিচর্চা মানুষের কর্মদক্ষতা ও চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। জৈনিক আরব কবি অতি চমৎকারভাবে এই সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন-

الهی بنی تغلب عن کل مکرمة

قصيدة قالها عمرو بن كلثوم

‘বনু তাগলিবকে বিরোচিত কোন কৃতিত্ব, বড় কোন বিজয় অর্জন করতে এবং বড় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধার সৃষ্টি করেছে শুধু একটা বিষয়। আর তা হল, তারা শুধু আমার ইবনে কুলছুম রচিত কাসিদা আবৃত্তি করে এবং তাতেই তারা বিভোর থাকে।’ এই রোগ কোন প্রতিষ্ঠানেও সৃষ্টি হতে পারে, কোন দলের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে। দলের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা দলের মধ্যকার কোন বিখ্যাত ব্যক্তির রচনা, গবেষণা তাঁর উন্নত ও উচ্চ চিন্তা-চেতনা দলের জন্য গর্বের বিষয় হল। দল তাই নিয়েই শুধু গর্ব করতে থাকল। কিন্তু এ দ্বারা কাজ চলবে না। দল হোক, প্রতিষ্ঠান হোক, মাদরাসা হোক বরং বলতে পারি পুরো জাতি হোক কারও জন্যই এরূপ পূর্ব ইতিহাস নিয়ে শুধু গর্ব করলে চলবে না।

একথা বলাতে কোন লাভ নেই যে, এই জাতি গায়যালী, ইবনে তাইমিয়াহ ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর ন্যায় ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছে। এই বললে চলবে না যে, আমরা অমুক অমুক নগর ও জনপদ আবাদ করেছি। সমরকন্দ, বোখারা, থানাডা, আশবিলিয়াহ ও দিল্লীকে আমরা আবাদ করেছি, সমৃদ্ধ করেছি। বরং প্রয়োজন প্রত্যেক যুগেই এরূপ ব্যক্তিত্বের জন্মলাভ অব্যাহত থাকা। প্রয়োজন স্ব-স্ব যুগের চিন্তাগত ও বিশ্বাসগত অস্থিরতার অনুসন্ধান, এর কারণ নির্ণয় এবং তদনুযায়ী যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ। দ্বীনী আদর্শ ও শিক্ষাকে, দ্বীনের মৌল নীতিমালা সমূহকে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী ও কার্যক্রমের সাথে, জীবনযাত্রায় উদ্ভূত সমস্যাসমূহের সাথে সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ। প্রত্যেক যুগে ইসলামী আইনের মর্যাদাকে সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করণ।

আল্লামা ইকবাল তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন, এই যুগে সবচেয়ে বড় মুজাদ্দিদ সেই ব্যক্তি যে অন্যান্য আইনের উপর ইসলামী আইনের উচ্চতা ও মর্যাদাকে

সুপ্রমাণিত করবে। আল্লামা ইকবাল ষাট বৎসর পূর্বে যে কথা বলেছিলেন তা আজ এক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ইসলামী শরীয়ত বিশেষত পারিবারিক বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা। ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য ইসলামী বিধি-বিধানই যে সর্বোত্তম উপায় তা প্রমাণ করা।

আমরা আমাদের প্রিয় ছাত্রবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলব যে, তারা কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্বীনী ইলমে পাণ্ডিত্য অর্জন করুক। অতঃপর আধুনিক জিজ্ঞাসা সম্পর্কে অবহিত হোক এবং দ্বীনের আলোকে সেগুলোর সমাধান দান করুক।

দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা গর্বিত যে, প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্ক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন, আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সাথে এবং 'সীরাতুন নবী'র লেখক আল্লামা শিবলী নুমানীর ন্যায় ধর্মতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সীরাতে রচয়িতার সাথে।

বাস্তবতা হল, আজ পর্যন্ত ইলমী ও দ্বীনী বিষয়ে লেখনী ধারণ এবং ইলমী ও দ্বীনী বিষয়কে কার্যকর ও প্রভাব বিস্তারকারী রূপে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমার জানা মতে আল্লামা শিবলী নুমানীর পদ্ধতি ও ধরণ অপেক্ষা উত্তম কোন পদ্ধতি ও ধরণ হতে পারে না। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, আবদুস সালাম নদভী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এতটুকু তো যথেষ্ট নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, আপনারা এই জাতীয় জলসায় শুধু তাঁদেরই নাম উচ্চারণ করতে বাধ্য হন, নতুন কোন নাম এই তালিকায় সংযুক্ত করতে পারেন না। এটা এই প্রতিষ্ঠানের অধঃগতি ও অবক্ষয়ের প্রমাণ এবং গোটা জাতির জন্য শঙ্কার বিষয়। এটা কত বড় দুঃখের কথা যে, কোন ক্ষেত্রেই কাজিফত মানে উত্তীর্ণ নতুন কোন ব্যক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না।

কোন কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সেখানকার অবস্থাও অভিন্ন। সেখানেও এখন জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের মত ব্যক্তিত্বের অভাব। এ রকম কোন ব্যক্তি নেই যিনি ইউরোপ আমেরিকায় লেখাপড়া করা নতুন প্রজন্মকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার উপকরণ সরবরাহ করতে পারেন। এমন কোন পুস্তিকা বা গ্রন্থ নেই, যাতে দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও সমস্যার জবাব ও সমাধান দান করা হয়েছে। জ্ঞান গবেষণা ও ভাষার মান নিম্নমুখী ও নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। যেসব পুস্তিকা আছে তা নির্দিষ্ট দল ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, নির্দিষ্ট মত ও পথ কেন্দ্রিক। তাতে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা মূলত নির্দিষ্ট দল, নির্দিষ্ট মত ও

পথের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেসব পুস্তিকা লিখিত হয়েছে। এই অবস্থা বড় ভয়াবহ। যে আলেমগণের দায়িত্ব ছিল যুবক শ্রেণীর আস্থা ও বিশ্বাসকে ইসলামের পক্ষে সুসংহত করা, যাদের দায়িত্ব ছিল ইসলামের সত্যতা ও চিরন্তনতা প্রমাণ করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণকারিতা প্রমাণ করা তাঁরা এখন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে লিপ্ত। এটা বড় সর্বনাশা ব্যাপার। যদি এই উন্মত্তের মধ্যে দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ নেককার মুত্তাকী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তবুও উপরিউক্ত প্রয়োজন সব সময়ই অবশিষ্ট থাকবে।

وما علينا الا البلاغ المبين

দ্বীনী শিক্ষাদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে

রক্ষা করা অপরিহার্য

১. [১৯৮২ ঈসাব্দী সনের তের অক্টোবর গোরখপুরের ইসলামিয়া কলেজে প্রদত্ত ভাষণ এটি।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
يَدْعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে ঐ সকল ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর ঐ আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন এবং তারা তা-ই করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। (সূরা তাহরীম ৬)

সুধী!

আমি আপনাদের সামনে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আয়াতটি আপনাদের সামনে এর পূর্বেও অনেকে তেলাওয়াত করে থাকবেন। আপনাদের নিজেদের তেলাওয়াতের সময়ও আয়াতটি আপনাদের দৃষ্টিতে পড়ে থাকবে। অবশ্য কোন বিষয় বার বার সামনে আসা সত্ত্বেও অনেক সময় তা গভীর দৃষ্টিতে ও মনোযোগী দৃষ্টিতে দেখা হয় না। আপনি একই রাস্তায় বার বার আসা-যাওয়া করে থাকেন, রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে অনেক সাইনবোর্ড টানানো থাকে আপনি সেগুলোকে বার বার দেখেও থাকেন। কিন্তু আপনি নিজেই চিন্তা করুন এ সকল সাইনবোর্ডের কতটিকে আপনি মনোযোগ সহকারে দেখেছেন

এবং তাতে কী লেখা আছে তা মনে রেখেছেন? আপনাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, বলুন তো এসব সাইনবোর্ডের মধ্যে কয়টি সাইনবোর্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত? আপনাদের মধ্যে কম লোকই তা বলতে পারবে।

আয়াতটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং চমকে দেওয়ার মত। কোন জিনিস বার বার সামনে আসলে অনেক সময় তা সাধারণ ও মামুলী বিষয় বলে গণ্য হতে থাকে— তা না হলে আয়াতটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী যে, আমি অনুরোধ করতাম এবং জোর দিয়ে বলতাম যে, আয়াতটি দেয়ালে দেয়ালে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে রাখা হোক। সাইনবোর্ড আকারে লিখে মসজিদে মসজিদে টানিয়ে দেওয়া হোক।

আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে ঐ সকল লোক, যারা নিজেরা ঈমান এনেছ— **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**—এর মধ্যকার **آمَنُوا** শব্দটি অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ। প্রতিটি শব্দ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। কুরআন মাজীদে কোন শব্দের ব্যবহারই যথেষ্টাচার-নির্ভর নয়, অপরিবর্তনীয় নয়। এটা কবিতা কিংবা কাব্যগ্রন্থ নয়। এর প্রতিটি শব্দই তাৎপর্যপূর্ণ। **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ** বা **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** হে মুসলমানগণ! হে মুসলমানগণ বলা যেত, কিন্তু তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** হে ঐ সকল লোক, যারা ঈমান এনেছ

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর ঐ আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। আয়াতটিতে প্রথম সন্বোধন যাদেরকে করা হয়েছে তাঁরা ছিলেন মুসলমান, তাঁরা ছিলেন সাহাবী। কুরআন অবতরণের সময় কালে যাঁরা ছিলেন বর্তমান। তাঁরাই ছিলেন আয়াতের সন্বোধনের প্রধান লক্ষ্য। এমনিতে তো কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল মানুষ জন্ম নেবে তাদের সকলেই এই আয়াতের সন্বোধনের লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম লক্ষ্য তাঁরাই যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে ঈমান এনেছেন। যাঁরা সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই ঐ সকল সাহাবীও ছিলেন, যাঁরা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা হৃদয়বিয়াতে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রাসূলের হাতে হাত রেখে ইসলামের জন্য জীবন দানের শপথ করেছিলেন। যাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

‘আল্লাহ তো মুমিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করল এবং তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত হলেন; ফলে তাদের উপর তিনি নাযিল করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দান করলেন আসন্ন বিজয়।’ (সূরা ফাতহ ১৮)

যাদেরকে স্থায়ী সনদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এইরূপ সনদপ্রাপ্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগণও ছিলেন আলোচ্য আয়াতের সম্বোধনের লক্ষ্য। নিশ্চয়ই আশারায় মুবশশারা বিল জান্নাহ সাহাবীগণও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বদর ও উহদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় সাহাবীগণ।

এখন আমি আপনাদের নিকট প্রশ্ন করি, কোন ব্যক্তি কি জেনে-শুনে তার সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে আগুনে নিক্ষেপ করে কিংবা আগুনে ঝাঁপ দিতে দেয়? তাহলে এই আয়াতে যে বলা হল, হে ঐ সকল লোক, যারা নিজেরা ঈমান এনেছ তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর- এর অর্থ ও তাৎপর্য কী?

আপনারা কী ইতিহাসে এরূপ কোন ঘটনার কথা পাঠ করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে আগুনে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেছিল কিংবা তাদের সন্তান ও পরিবার-পরিজন আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিল, আর তারা নিশুপ বসে বসে তামাশা দেখছিলেন? তাহলে কেন তাদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হল যে, হে ঐ সকল লোক, যারা ঈমান এনেছ তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর? এটা কি বিনা প্রয়োজনে বলা হয়েছে? এটা কোন আগুন ছিল? কবে এই ঘটনা ঘটেছিল যে, মুসলমানদের সন্তান ও পরিবার-পরিজন আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিল আর মুসলমানরা আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছিল, তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল না, ফলে আল্লাহ তাদেরকে সচেতন করতে ওহী নাযিল করলেন, আর তাতে সকলে চমকে গেল, সচেতন হল এবং নিজেদের সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল? বলাবাহুল্য, এইরূপ ঘটনা কখনও ঘটেনি। তাহলে এই আয়াতের মর্ম ও তাৎপর্য কী?

আয়াতটির মর্ম এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা তোমাদের সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে এরূপ বিষয় থেকে এরূপ কাজ-কর্ম থেকে রক্ষা কর, যার পরিণতি হবে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ। কোন মানুষ নিজ সন্তান বা পরিবার-পরিজনকে আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হতে দেখলে তাকে রক্ষার চেষ্টা না করে

পারে না। কিন্তু শঙ্কার বিষয় শুধু একটাই যে, মানুষ জানে না কোন কর্মে, কোন কারণে আগুনে জ্বলতে হয়। সুতরাং আগাতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, ঐসব আমল থেকে তাদেরকে রক্ষা কর, যা আগুনে প্রবেশের কারণ হয়। ফিকহের পরিভাষায় ঐসব আমলকে বলা হয়, আসবাবে মুআদিয়াহ (কোন কিছুতে উপনীতকারী কারণ)। অর্থাৎ ঐ সকল কারণ যা কোন পরিণামের দিকে ধাবিত করে। ফিকাহ বিদগণের মতে ঐসব কারণ ও পরিণাম প্রকারান্তরে একই বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি এমন ঔষধ কাউকে পান করায়, যা মৃত্যু ডেকে আনে তাহলে এই ঔষধ প্রদান হত্যার সমার্থক হবে। কেননা সে এরূপ কারণ অবলম্বন করেছে, যার ফলে মৃত্যু অনিবার্য। আইনও তাকে হত্যাকারী বলেই সাব্যস্ত করবে এবং চিকিৎসকরাও তাকে হত্যাকারী বলে সাব্যস্ত করবে।

এখন আমি আপনাদের নিকট আরজ করছি যে, বর্তমান পরিস্থিতি এইরূপই। সন্তানদেরকে দ্বীনী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদেরকে ন্যস্ত করা হচ্ছে ধর্মহীন শিক্ষার পরিবেশে। ঐ সকল লোকের ইচ্ছা ও মর্জির উপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, যে শিক্ষার উপর পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল, পয়গম্বরগণের আনীত যে শিক্ষা না থাকার পরিণতি হল ঈমানহারা হওয়া শিশুদেরকে সেই শিক্ষাদানের ব্যাপারে যাদের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ নেই এবং যারা ঐ শিক্ষাদানের উপযুক্তও নয়। দেখার বিষয় হল তাহলে এই বিষয়টা সন্তানদের জন্য কিভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শুধু ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা নয়; বরং এই শিক্ষাব্যবস্থা দ্বীন ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শগত শিক্ষাব্যবস্থা। ব্রিটিশ শাসনামলের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা। তৎকালীন পাঠ্য পুস্তকে কুকুর-বিড়ালের কাহিনী থাকত। আমাদের অনেকেই তৎকালীন যুগে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তৎকালীন যুগের ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসে কোন বিরূপ প্রভাব বিস্তার করত না, ঐসব পাঠ্যপুস্তক দ্বারা সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি দাসত্ব মনোভাব সৃষ্টি হত না এবং এই জগতে কোন মাখলুকের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ধারণাও সৃষ্টি হত না। সেই সময়কার পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীরা বাঘ, ভালুক, শিয়াল, নেকড়ে আর বিড়াল-কুকুরের কাহিনী ও গল্প পাঠ করত। বাড়ী থেকে যৈরূপ মানসিকতা নিয়ে পাঠশালায় যেত সেই মানসিকতা নিয়েই ঘরে ফিরে আসত। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারী সিলেবাসভুক্ত পাঠ্যপুস্তকে আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সমূহ উপাদান, গল্প ও আলোচ্য বিষয়াদি বিদ্যমান থাকে। আকীদা-বিশ্বাস বিনষ্টকারী উপাদানে যতটুকু ঘাটতি থাকে

শিক্ষকগণ তা পূর্ণ করে দেন। শিক্ষার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে কিছু কাজ এইরূপ করতে হয়, যা তাওহীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

দেখুন, রাস্তা এরূপ ঢালু যেখানে ঠিকমত পা জমে না। এরূপ ঢালু রাস্তায় কোন বালক সাইকেল চালাচ্ছে। সামনে গভীর বড় গর্ত রয়েছে। সাইকেলের ব্রেকও ঠিকমত কাজ করছে না। পিতা বসে বসে দেখছেন কিন্তু তাকে বাধা দিচ্ছেন না। অথচ তিনি জানেন যে, তার ছেলের সাইকেলটির ব্রেক ঠিকমত কাজ করে না, তিনি এটাও জানেন যে, সাইকেল চালিয়ে ঐ রাস্তায় গেলে তার ছেলের জীবন রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় আপনারা কি বলবেন না যে, পিতাই ছেলেটিকে ঐ গর্তে নিপতিত করে তার জীবন ধ্বংস করেছে?

তাহলে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা ঈমান কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে যদি সন্তানের জন্য দ্বীনী শিক্ষার ভিন্ন কোন ব্যবস্থা না করা হয় (যাকে আমরা সাইকেলের ব্রেকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি)? স্কুলে বাচ্চারা যা পাঠ করে এবং যা শিক্ষা লাভ করে তার সংশোধনের ব্যবস্থা না করা হয়? যদি বাচ্চাকে ঈমানী ও তাওহীদী ব্যবস্থা দেওয়া হয়, প্রভাতকালীন অথবা সাক্ষ্যকালীন মক্তবে প্রেরণ করা হয়, দ্বীনী আলোচনা সভায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, পিতা-মাতা নিজেরাও তাদেরকে দ্বীনের উপদেশ দান করে, উৎসাহব্যঞ্জক ও দ্বীনী অনুপ্রেরণা মূলক ভাল ভাল কিসসা-কাহিনী তাদেরকে শোনানো হয়, ঘরের পরিবেশও দ্বীনের অনুকূল হয়, তবে তো এসব এক প্রকার ব্রেকের কাজ করবে। পক্ষান্তরে এসব যদি না হয় তাহলে আপনি যেন আপনার সন্তানদেরকে কানে কানে বলে দিলেন যে, স্কুলে শিক্ষা লাভ করা সব বিষয়ই মেনে নেবে। হাঁ আপনি আপনার সন্তানদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন আর তার জন্য দ্বীনী শিক্ষার ভিন্ন কোন ব্যবস্থা করলেন না, তবে তার কানে যেন এই কথাই বলে দেওয়া হল যে, স্কুলের সব বিষয়ই মেনে নেবে। আপনি যেন আপনার সন্তানদেরকে একপ্রকার উৎসাহ দান করলেন ইসলাম বিরোধী সব কথা মেনে নিতে। তার দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন না, মহল্লায় কোন মক্তবও চালু নেই, দ্বীনী পুস্তকাদিও সে পাঠ করে না তাহলে আপনি বলুন আপনার উদ্দেশ্যে কি বলা হয়নি **قُوا أَنْفُسَكُمْ وَآهْلِيكُمْ نَارًا** তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর?

লাঞ্ছীতে মহিলাদের একটি মাহফিলে আমি একজন মমতাময়ী মায়ের গল্প বলেছিলাম। সুশিক্ষিতা ঐ মা একবার একটি আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। অন্য মহিলারা মহিলাটিকে বেশ অস্থির, বিষণ্ণ ও চিন্তিত দেখতে পেল। তারা দেখল

যে, কোন কথায় মহিলাটির মন বসছে না। অনেক দিন পর সকলেই একত্রিত হয়ে আনন্দ-ফূর্তির কথাবার্তা বলছে কিন্তু ঐ মহিলা কোন কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে- যেন তার মন-মস্তিষ্ক অন্য কোথাও পড়ে আছে। অন্যরা তাকে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার বোন! শরীর খারাপ? মনে কোন বেদনা আছে কি? অনেক জিজ্ঞাসার পর মহিলাটি বলল, না এসব কিছুই নয়। আসলে আমি ঘরে আমার শিশুটিকে রেখে এসেছি। এদিকে রান্নাঘরের দিয়াশলাইর কৌটাটা সামলে রেখে আসিনি। ফলে আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে আমার বাচ্চা না পাছে দিয়াশলাই থেকে কাঠি বের করে আগুন জ্বালিয়ে নেয়। সঙ্গিনী মহিলারা বলল, আল্লাহ রক্ষা করুন! আপনার বাচ্চার বয়স কত? মহিলাটি জবাব দিল- এই বছর দুয়েক হবে। দেখুন, বাচ্চা দিয়াশলাইয়ের বাস্র খুলতে জানে কি জানে না, যদি জানে তবে দিয়াশলাইয়ের কাঠির বারুদ যুক্ত দিক দিয়ে ঘষা দেবে কি উল্টো দিক দিয়ে ঘষা দেবে এই উভয় রকম সম্ভাবনাই বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও মা বিচলিত হয়ে পড়ছেন। তার কল্পনায় ভেসে উঠছে তার বাচ্চা খেলতে খেলতে সেখানে গেল। দিয়াশলাইয়ের কৌটা খুলল। দিয়াশলাইয়ের কাঠি বের করে দিয়াশলাইয়ের বারুদযুক্ত পাশে কাঠির বারুদযুক্ত দিক দিয়ে ঘষা দিল। ফলে আগুন জ্বলল আর তার বাচ্চার কাপড়ে আগুন লেগে গেল। এইসব কিছু দূর সম্ভাবনার বিষয় হলেও মমতাময়ী মা এই সম্ভাবনায়ুক্ত শঙ্কাকেই নিশ্চিত মনে করে বিচলিত হয়ে পড়ছে।

দ্বীন পরিপন্থী পরিবেশে দ্বীন ও ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কি জীবন নাশের সম্ভাবনা অপেক্ষা গুরুতর নয়? আপনাদের যে বাচ্চারা স্কুলে লেখাপড়া করছে আপনি কি তাদেরকে কোন দিন শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছেন যে, তাওহীদ কী? নিজেদের শহর ও মহল্লায় দ্বিনী মক্তুব প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। না ঘরে দ্বিনী পরিবেশ আছে, না মহল্লায়। এই অবস্থায় তাদের দ্বীন ও ঈমান কিভাবে সংরক্ষিত হবে? স্কুলের ব্যাপারে কী বলব, আরবী মাদরাসাগুলোর অবস্থাও এই দাঁড়িয়েছে যে, যে সকল শিশুরা এখানে আসছে তারাও ঐসব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ, আমাদের শৈশবে যেসব বিষয়ে কোন মুসলমান শিশুর অজ্ঞ থাকার কল্পনাও আমরা করতে পারতাম না।

এই অবস্থার পরিণতি কী হবে? পরিণতি হবে এই যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম দ্বীন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থেকে যাবে। উর্দু পড়তে পারবে না। (পাঠকগণের মনে রাখা উচিত, ভাষণটি ভারতের একটি সমাবেশে প্রদত্ত হয়েছিল। -অনুবাদক) বর্তমানে অবস্থা এই যে, ঐহিত্যের অধিকারী একটি বড় মাপের তিব্বীয়া কলেজের এক ছাত্রকে বলা হল একটি প্রবন্ধ লিখতে। ধারণা করা হল যে, যেহেতু তিব্বীয়া

কলেজের পাঠ্যপুস্তক সব আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় রচিত সেহেতু সে প্রবন্ধটি কমপক্ষে উর্দুতে লিখবে। কিন্তু দেখা গেল যে, সে হিন্দীতে তা লিখে এনেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ছেন অথচ উর্দু লিখতে জানেন না? উত্তরে সে বলল, আমাদেরকে হিন্দীই পড়ানো হয়েছে। তো বলছিলাম যে, নতুন প্রজন্মের ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা অমূলক নয়, বাস্তবও বটে। দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞ, আমাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে যে বিশ্বাস বিদ্যমান সে সম্পর্কে অজ্ঞ প্রজন্ম যথারীতি সৃষ্টি হয়ে গেছে। একজন মুসলিম ছাত্রকে সীরাত সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে বলা হলে, সে তা হিন্দীতে লিখল এবং পাঠ করল উর্দু উচ্চারণে। শব্দ তো উর্দু কিন্তু Script ও বর্ণমালা হিন্দির।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আর্নল্ড টয়েনবি লিখেছেন, এখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে তাদের গ্রন্থাগারে আগুন দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু Script তথা তাদের ভাষার হস্তলিপি ও বর্ণমালা পরিবর্তন করলেই যথেষ্ট। এর দ্বারা ঐ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালিত কর। যে জিনিস জাতিকে তার অতীত ও ঐতিহ্যের সাথে, তার মতাদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি করে তা হল ঐ জাতির Script তথা হস্তলিপি ও বর্ণমালা। হস্তলিপির পরিবর্তন হল তো জাতিরও পরিবর্তন হল। ভারতে তাই হচ্ছে। দলগত বিভেদে লাভ কিছুই হয় না, দেশের বদনাম হয়। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন যদি হয়ে যায়, তাহলেই আমাদের সর্বনাশের জন্য যথেষ্ট। আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে মরহুম আকবর এলাহাবাদী বলেছেন—

شیخ موحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے
دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

শায়খ মরহুমের কথাটি আজ আমার খুব মনে পড়ে

হৃদয় বদলে যাবে শিক্ষা বদলে গেলে।

আমাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিছু সময় লাগবে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এরূপ এক প্রজন্মের সৃষ্টি হবে যাদের নিকট কুফর ও ঈমানের পার্থক্য, তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য, আকীদা-বিশ্বাসের পার্থক্য এসব কিছুই নিরর্থক বলে মনে হবে।

মুসলমান পিতা-মাতা তাদের সন্তানের ক্যারিয়ার ক্ষতি হবে আশঙ্কায় সন্তানদেরকে মাতৃভাষা উর্দু লেখায় না, পড়ায় না। তাদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। তাদের ক্যারিয়ারের সাথে এগুলো কি সাংঘর্ষিক? একজন মুসলমানের চেতনা তো এরূপ দৃঢ় হওয়া উচিত যে, যদি সে কোনভাবে বুঝতে পারে, তার সন্তানের ভাগ্যে ইসলাম নেই কিংবা খোদা না করুন সে মুসলমান থাকবে না তবে সে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আমার এই সন্তানকে ভালোয় ভালোয় উঠিয়ে নাও। মুসলমানের শান এটাই।

একজন মহিলা সাহাবীয়া ছিলেন। নাম ছিল খানসা (রাযি.)। কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল। তিনি তাঁর মৃত দুই ভাইয়ের শোকগাথা রচনা করে সব সময় বেদনার্ত হৃদয়ে তা আবৃত্তি করতেন। বলা যায় যে, কোন ভাষায় নারী কর্তৃক রচিত শোকগাথার এত বড় ভাণ্ডার আর নেই। এই কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী নারী একটি জিহাদ উপলক্ষ্যে তাঁর এক সন্তানকে ডাকলেন এবং বললেন, বৎস! তোমাকে আমি এই দ্বীনের জন্যই লালন-পালন করে বড় করেছি। যাও, আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে দাও। অতঃপর দ্বিতীয়জন, তৎপরে তৃতীয়জনকে ডেকেও অনুরূপ কথা বললেন। যখন তাদের সকলের শহীদ হওয়ার সংবাদ তাঁর নিকট আসল তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন,

الحمد لله الذى اكرمنى بشهادتهم

‘ঐ আল্লাহর শোকর, যিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে।’

ঈমানের শান এটাই। ইসলামের জন্য সবকিছুই কুরবান করতে প্রস্তুত হওয়া।

জিজ্ঞাসা একটাই। তা হল এই প্রজন্মকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে। কিভাবে মুসলমানরূপে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা যাবে। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনী শিক্ষারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ আমাদেরকে কাজ করার তাওফীক দিন। আমীন!

وما علينا الا البلاغ المبين

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব ও উপকারিতা :

কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ !
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ - إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

এই মজলিসে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ যেমন আছেন তেমনি দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্মানিত উলামায়ে কেরামও আছেন। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন! আমার অন্তরে এই ধারণা রয়েছে যে, আমাদের সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দের বিশেষত উলামায়ে কেরামের মস্তিষ্ক কখনও এই দিকে হয়তো ধাবিত হয়নি যে, কুরআন মাজীদেও শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং ঐ সকল দক্ষ ব্যক্তিদের সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে, যাঁরা সমকালীন যুগে কারিগরি বিদ্যা দ্বারা নির্মাণমূলক কাজ করেছেন এবং জনগণের সেবা করেছেন এবং মানবতাকে ও নিজের সম-বিশ্বাসী লোকদেরকে রক্ষা করেছেন। বিষয়টি খুব স্বল্প সংখ্যক লোকের মস্তিষ্কেই জাগ্রত হয়েছে। আমি এইমাত্র আপনাদের সামনে কুরআন মাজীদের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি—

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ - إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

‘আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেন কে প্রত্যক্ষ না

করেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।' (সূরা হাদীদ ২৫)

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, আমি নাযিল করেছি লোহা। প্রথমে লক্ষ্য করুন, কথটি ব্যক্ত করতে অন্য কোন শব্দও ব্যবহার করা যেত। উদাহরণ স্বরূপ خَلَقْنَا 'আমি সৃষ্টি করেছি' শব্দটি ব্যবহার করা যেত। কিন্তু নাযিল করেছি শব্দটি দ্বারা বিশেষত্ব ও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও অনুগ্রহের উপাদানও বস্তুটির সাথে যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তা প্রকাশ পায়। আপনারা জানেন, শুধু প্রযুক্তি নয় বরং স্থাপত্য, শিল্প ও কারিগরি, যুদ্ধ ইত্যাদি প্রায় সকল ক্ষেত্রে লোহা এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কোন শিল্প ও কারিগরি জগত লোহা ব্যতীত চলতে পারে না।

বিশোধ খনিজ ধাতব পদার্থের মধ্য থেকে সবকিছুকে বাদ দিয়ে কুরআন একমাত্র লোহার উল্লেখ করেছে। বলেছে- **وانزلنا الحديد** এবং আমি নাযিল করেছি লোহা, তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। লোহা আল্লাহ তাআলার রবুবিয়াত গুণের প্রকাশস্থল। লোহা শুধু তরবারি তৈরির জন্য নয়, নয় শুধু বন্দুক ও তার গুলি তৈরির জন্য; বরং **فیه باس شدید ومنافع للناس** তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতা ও কল্যাণ। যাঁরা আরবী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তাঁরা জানেন- অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। বলা হয়েছে, **منافع للناس** তাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ ব্যবহার করে কল্যাণের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এক নবী হযরত দাউদ (আ.) প্রসঙ্গে বলেছেন-

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ

‘আর আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ করতে, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে।’ (সূরা আশ্বিয়া ৮০)

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘আমি তার জন্য লোহাকে করে দিয়েছিলাম নরম। (এবং বলেছিলাম) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার কর এবং বুনে পরিমাপ রক্ষা কর।’ (সূরা সাবা ১০-১১)

অর্থাৎ লোহাকে তাঁর জন্য এরূপ করে দিয়েছিলাম, যাতে তিনি তা দ্বারা ইচ্ছা মাফিক সহজেই বর্ম ইত্যাদি তৈরি করতে পারেন। ধ্বংসাত্মক কাজে নয় বরং নির্মাণ ও গড়ার কাজে যেন লোহাকে তিনি ব্যবহার করতে পারেন।

হযরত দাউদ (আ.) নয় বরং কুরআনুল কারীম হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.)-এর প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছে। জীন জাতিতে তাঁর সেবকরূপে নিয়োজিত করার কথা বিবৃত করেছে। বলেছে—

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ

‘তার প্রতিপালকের আদেশক্রমে জীনদের কতক তাঁর সম্মুখে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আবাদন করাব। তারা নির্মাণ করত সুলাইমানের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ।’ (সূরা সাবা ১২-১৩)

এ থেকে বোঝা যায়, জীনরা শিল্প ও কারিগরী কার্যাবলী সম্পাদন করত। হযরত সুলাইমান (আ.) যা চাইতেন সেই অনুযায়ী তারা কাজ করত। নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা কিছু করত না। সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, তারা ধ্বংসাত্মক কোন কাজ করত না। কারণ নবীর নির্দেশনা অনুযায়ী যেহেতু কাজ হত নিশ্চয়ই তা মানুষের কল্যাণের জন্যই হত। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত পদার্থ ও শক্তিকে তাঁর মর্জি মাফিক এবং নবী কর্তৃক আনীত পয়গামের দাবি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। সমগ্র জগতের জন্য মহাবিপদ হল এই সকল বস্তু ও শক্তিকে ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক (DESTRUCTIVE & PASSIVE) লক্ষ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বলেছেন—

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ

তারা তার জন্য তাই করত যা সে (সুলাইমান আ.) চাইত। তারা স্বাধীন ছিল না। যা তারা চাইত তাই করতে পারত না। মানুষের উপর আক্রমণ করা,

ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়া, দেশকে পয়মাল করে দেওয়া -এ সবার কিছুই তারা করতে পারত না।

আমার শুধু ধারণা নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা হল এই যে, মুসলমানরা অতীতে কারিগরি ও শিল্প ক্ষেত্রে কী পরিমাণ উন্নতি লাভ করেছিল আর আধুনিক যে জগতকে উন্নত জগত বলা হয়, বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ জগত বলা হয়, তাতে মুসলমানদের অংশীদারিত্ব (Contribution) কতটুকু- এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ইতিহাসকে খুব কমই অধ্যয়ন করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কথা বলি। দর্শনে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। একটি কিয়াস বা অনুমাননির্ভর যুক্তি। যাকে বলা হয় অবরোহ বা deductive logic। দ্বিতীয়টি হল ইস্তিকরা (استقراء) যাকে বলা হয় inductive Logic বা যুক্তির আরোহ পদ্ধতি। এটা এক ঐতিহাসিক সত্য এবং স্বীকৃত বাস্তবতা যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও স্থাপত্য কলার সূচনা ও উন্নতি যুক্তিশাস্ত্রের এই আরোহ পদ্ধতিরই অবদান। ইউরোপে সায়েন্স ও বিজ্ঞান এবং তার সমূহ শাখা-প্রশাখার বিকাশ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও আবিষ্কারের যুগ তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন তারা কিয়াস তথা deductive logic এর পরিবর্তে ইস্তিকরা তথা inductive logic কাজে লাগাতে শুরু করেছে। আর যুক্তির এই পদ্ধতি ও এর মূলনীতিসমূহ আরবদের দান। আরব হতে স্পেনের পথ বেয়ে তা ইউরোপে এসেছিল।

প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ও লেখক Gustave Lebon লিখেছেন, ‘মানুষ নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি আরোহ যুক্তি (Inductive logic) সম্পর্কে বলে থাকে যে, তা ফ্রান্সিস বেকনের উদ্ভাবন। কিন্তু আজ এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে আরবদের সৃষ্টি।’

কিয়াস বা অবরোহ হল আপনি একটি বিষয়কে সত্য বলে ধরে নিলেন এবং বললেন, অমুক বস্তুতে এই গুণ রয়েছে। এরপর সমজাতীয় সব বস্তু সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই সকল বস্তুতেও ঐ গুণ রয়েছে। যুক্তিবিদ্যার এই পদ্ধতিটি দুনিয়ার সব দর্শন এমনকি ইউনানী দর্শনের উপরও জেঁকে বসেছিল। ইউনানী দর্শনের আলোচনা উঠলেই যুক্তিবিদ্যার এই পদ্ধতির দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাস্তিষ্ক ধাবিত হয় যে, তারা এই ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। আমাদের এখানেও যে মানতেক (যুক্তিবিদ্যা) ও দর্শন পড়ানো হয়, তা ইউনানী দর্শনকেন্দ্রিক।

ইসতিকরা বা আরোহ অনুমান হল কার্য থেকে কারণ অনুমান। একাধিক বস্তুকে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে সবগুলোর মধ্যে যে সাধারণ গুণ (Common Factors) পরিলক্ষিত হয় তাকে মূল ধরে অন্য বস্তুতেও সেই গুণের উপস্থিতি অনুমান করা।

ইউরোপের যে সকল ঐতিহাসিক বিজ্ঞান ও ইউরোপের উন্নতি সম্পর্কে ইতিহাস লিখেছেন তাদের সকলেই একমত যে, ইউরোপের উন্নতি এবং তার বিশ্ব-বিস্তারী প্রযুক্তিগত বিজয়, আবিষ্কার ও উন্নতির মূল ভিত্তি হল ইসতিকরা বা আরোহ অনুমান। আর এটা সবাই জানে যে, এই বিদ্যার মূলনীতিসমূহ স্পেন থেকে আমদানীকৃত। স্পেন থেকে যদি তা ইউরোপে আমদানী না হত তাহলে ইউরোপ উন্নতি করতে পারত না।

আপনি দেখলেন যে, পানির মধ্যে এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে আপনি অতি তড়িঘড়ি একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন এবং অপর বস্তুর ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করলেন। এটাই কিয়াস বা অবরোহ অনুমান। অনেক সময় এতটুকুও দেখা হয় না বরং নিজের ধারণা থেকে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এরপর সব বস্তুকে ঐ সিদ্ধান্তের আওতাভুক্ত করা হয় এবং ঐ সব বস্তুতে ঐ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হয়, এটাকেই বলে কিয়াস। কিন্তু এটা যথার্থ নয়। আসল বিষয় ইসতিকরা বা অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি না করা। বরং বস্তুসমূহকে দেখা, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা, তার বৈশিষ্ট্যকে দেখা, তার আচরণকে দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা। গাছকেও দেখবেন, পাতাকেও দেখবেন, ভূমি দেখবেন অন্যান্য বস্তুসমূহকেও দেখবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন, পরীক্ষা করবেন। অতঃপর দেখবেন এইসব বস্তুর মধ্যে Common Factors বা সাধারণ গুণ কী? এরপর মূলনীতি প্রস্তুত করবেন ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। যুক্তি বিজ্ঞানের এই পদ্ধতিই ইউরোপকে নতুন আলোর, নতুন পথের সন্ধান দান করেছে এবং নতুন এক ক্ষেত্র দান করেছে এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছে। যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, মানুষের যেমন জন্মদিন থাকে তদ্রূপ বিজ্ঞানের জন্মদিন কোনটি? তবে আমি বলব, যে দিন ইসতিকরা বা যুক্তিবিজ্ঞানের আরোহ অনুমান পদ্ধতিকে ইউরোপ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং স্পেন থেকে তা অর্জন করেছে সেই দিন।

তদ্রূপ যে এলাকাকে মা-ওরাউন্নাহর বলা হয়, বোখারা-সমরকন্দ ইত্যাদি শহর যে এলাকায় অবস্থিত সেখানে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, গবেষক ও আবিষ্কারক সৃষ্টি হয়েছেন। শায়খ ইবনে সীনা প্রণীত ‘আল-কানুন’ দেখুন। আজও তা সমভাবে সমাদৃত। আজও তা থেকে জ্ঞান আহরণ করা হচ্ছে। তাঁর বিস্তৃত

নিরীক্ষণ ও গভীর পর্যবেক্ষণ, তাঁর প্রজ্ঞা ও মেধা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, কিভাবে তিনি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের কার্যাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন রোগ চিকিত্সা করেছিলেন এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন! ঠিক একইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইসলামী বিশ্বের উন্নতি এরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, ইউরোপের জন্য যা ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল। এই কথাটি একটি বড় ভ্রান্তি ও অজ্ঞতাপ্রসূত যে, মানবজাতির উন্নতি, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র ও বিদ্যার উন্নতির সূচনা হয়েছে ইউরোপে এবং ইউরোপ ছিল এসবের প্রথম শিক্ষক। এটা বক্রদৃষ্টি ও গোঁড়ামী প্রসূত তথ্য। আল্লাহ আমাকে স্পেন ভ্রমণের সুযোগ দান করেছেন। স্পেনের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত, টলেটোলা থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত সফর করেছি। আমি আলহামরা প্রাসাদ দেখেছি, কর্ডোভার মসজিদ দেখেছি, সেখানকার অন্যান্য স্থাপনা এবং পুরাতত্ত্বের নিদর্শনসমূহ দেখেছি। আপনি দেখলে বিস্মিত হবেন যে, সেই যুগে স্থাপত্য কলায় এত উচ্চ স্তরে মানুষ কিভাবে পৌঁছে গিয়েছিল? বিশ্বাস করতে কঠিন হয় যে, এসব স্থাপনা এভাবেও নির্মাণ করা যায়! এখানে আল বেরুনীর ন্যায় ব্যক্তি জন্মলাভ করেছেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন। তাঁর লিখিত ইতিহাসে স্বীকার করা হয়েছে যে, অনেক সূত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবক তাঁরাই।

এটা মনে করা উচিত নয় যে, এক বিদআতের প্রচলন দান করা হচ্ছে। হয়তো অনেককে এ থেকে বিরত রাখা হবে। এজন্য আমি দ্বীনী পরিভাষাতেই বলছি যে, এটা বিদআত নয় বরং আমি মনে করি যে, এটা মুসলমানদের এক প্রাচীন রীতির প্রচলন দান এবং মৃত রীতিকে পুনরায় জীবন দান। মুসলমানদের জন্য বর্তমানে এটা অপরিহার্য। এইসব ক্ষেত্রেও মুসলমানরা এক সময় অগ্রসর ছিল। আমি যেহেতু অনবরত সফর করতে থাকি এবং বিভিন্ন শিক্ষিত মহল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেয়ে থাকি এবং হিন্দুস্তানেই শুধু নয়; হিন্দুস্তানের সংলগ্ন দেশগুলোতেও আমার সফর হয়েছে একাধিকবার। সেহেতু এসব সফরের কারণে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, মুসলমানদের মস্তিষ্ক সাহিত্য ও কাব্য-কবিতায় ব্যস্ত থাকে বেশি। তাদের মস্তিষ্ক এই জাতীয় বিষয় চর্চার দিকে অধিক ধাবিত হয়। এইজন্য কেউ কেউ এ রকমও বলে যে, মুসলমান তো ব্যস ঐ সকল বিষয় চর্চা করতে ভালবাসে যেসব বিষয় অপেক্ষাকৃত লঘু, যাতে আনন্দ উপভোগ করা যায়, স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু যেসব বিষয় কিছুটা কঠিন, কষ্টকর এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের দাবি করে অথবা যেসব বিষয় অর্জন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে, যা অপেক্ষাকৃত নিরানন্দের ও শুষ্ক বিষয় সেসব বিষয়ে তাদের মস্তিষ্ক খুব কমই চলে। অথচ কথাটা সত্য নয়। মুসলমানদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা অন্যায় ধারণা বৈ নয়।

আমি খুব আনন্দবোধ করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের শহরে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি শহরেই এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেননা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির, শিল্প ও কারিগরির এবং গবেষণা কর্মের বিভিন্ন শাখার গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। অনুমান করা যায় যে, এই গুরুত্ব দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে। আমরা ভারতে নিজেদের যোগ্যতাবলে ও স্বনির্ভররূপে মর্যাদাকর জীবন যাপন করতে সক্ষম হবো না, যতক্ষণ না আমরা এই সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারব। কমপক্ষে এই সকল বিষয়কে আমরা যতক্ষণ না কাজে লাগাতে পারব।

সূধী!

এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং দুআ করছি আল্লাহ যেন প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতি দান করেন এবং অন্যত্র এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। দুআ করি এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মুসলমানদের যে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা যেন দূরীভূত হয়। আল্লাহ তাআলা যেন এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি তৈরি করে দেন, যারা মুসলিম সমাজের মূল্যবোধ ও মান, মুসলিম সমাজের মাকসাদ ও লক্ষ্যের হেফাযত করতে পারবে। এটা অনেক বড় সেবা হবে এবং ইসলামকে শক্তিশালী করার এক বড় অবলম্বন হবে। জীবনোপকরণ উপার্জনের সাথে সাথে তা হবে সমাজের জন্য প্রভূত কল্যাণকর।

وما علينا الا البلاغ المبين

আকুড়া খটকে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদ এবং শহীদগণের রক্ত দারুল উলুম হক্কানিয়ার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে

[১৯৭৮ সালের ১৯ জুলাই সীমান্ত প্রদেশের আকুড়াখটকে অবস্থিত প্রাচীন ও
বৃহৎ দ্বীনী শিক্ষাগার দারুল উলুম হক্কানিয়ায় সমবেত উলামায়ে কেরাম,
শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দের সামনে প্রদত্ত ভাষণ।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

শ্রদ্ধেয় মুরব্বীগণ, আমার বন্ধুগণ ও প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার ইশার নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা মোবারক থেকে বের হতে বিলম্ব করলেন।
সাধারণত যে সময় বের হন সে সময়ে বের হলেন না। মুসলমান এই আশ্রয় নিয়ে
মসজিদে বসে অপেক্ষা করছিলেন যে, যাঁর বরকতে এবং যাঁর শিক্ষায় তাঁরা নামায
শিখেছিলেন তাঁর পিছনে ইশার নামায আদায় করবেন। অতঃপর যে যার ঘরে
চলে যাবেন এবং আরাম করবেন। এই সকল লোক সারা দিন হাত গুটিয়ে বসে
থাকতেন না। তাঁরা ক্ষেতে-খামারে, খেজুর বাগানে এবং দোকানে সারাদিন কঠোর
পরিশ্রম করতেন। সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁরা এসেছিলেন রাসূলের
পিছনে নামায আদায় করে বাড়িতে যেয়ে বিশ্রাম নিবেন, ঘুমোবেন এই আশায়।
কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসতে বিলম্ব করলেন।
অনেকেই ঘুমের চাপে ঝিমোতে শুরু করলেন। কেউ কেউ ঘুমিয়েও পড়লেন।
সকলের শরীরে ছিল ক্লান্তি এবং চোখে ছিল ক্লান্তিজনিত গভীর ঘুমের প্রাবল্য।

হযরত উমর (রাযি.)- যিনি উম্মতের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, যিনি
প্রায়ই সমাধানকারী রূপে আবির্ভূত হতেন- এই অবস্থা দর্শনে আওয়াজ দিলেন।
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকলেই ঘুমিয়ে পড়ছে আপনি বের হয়ে আসুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরা মোবারক থেকে বের হয়ে আসলেন, সকলকে এক নজর দেখলেন এবং বললেন, এই মুহূর্তে নামাযের অপেক্ষায় জাযত অবস্থায় তোমরা ব্যতীত আর কেউ নেই। অর্থাৎ জাযত তো অনেকেই আছে, এক সাথে একত্রিত অবস্থায়ও হয়তো অনেকেই আছে কিন্তু তাদের সমাবেশ ও জাযত থাকা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, গল্প-গুজবের উদ্দেশ্যে অথবা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে, কিন্তু নামাযের অপেক্ষায় জাযত অবস্থায় তোমরা ব্যতীত আর কেউ নেই।

ঘটনাটি হিজরতের প্রথম দিকের অথবা আরও পরের। যাই হোক, ঘটনাটি থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে কোন কাজের মূল্য নির্ভর করে কাজের ধরণের উপর ভিত্তি করে। কাজের মূল্য হয় কাজের লক্ষ্য ও ধরণের। কতজন মানুষ কাজ করছে, কত বিশাল সংখ্যক মানুষ কাজটির সঙ্গে জড়িত এসব বিবেচ্য হয় না।

ভারতবর্ষে প্রথম যখন ইসলামের আগমন ঘটেছিল, একের পর এক যুদ্ধ হয়েছিল। বিজয়ের পর বিজয় অর্জিত হচ্ছিল। ঘটনাক্রমে বিজয়ীরা প্রবেশ করেছিল আপনাদের এই এলাকা দিয়েই। খায়বার গিরিপথ দিয়ে অথবা বুলান দিয়ে। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করলেন। আমরা তাদের জন্য দুআ করি। কারণ তাদের কারণেই ভারতে ইসলামের পতাকা সমুন্নত হয়েছে। যারা বস্তুগত ও জাগতিক কল্যাণ না দেখে এক পা-ও অগ্রসর হত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। অতঃপর তাদের সন্তানদের মধ্যে হাজার হাজার আল্লাহর ওলী ও উলামায়ে রব্বানী জন্মাভ করেছেন। আমরা ঐসব বাদশাহ ও বিজয়ীদের অবদানকে ভুলতে পারি না এবং ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, যাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

‘এবং যারা তাদের (তথা সাহাবাদের) পরে আসে তারা বলে— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ালু, পরম দয়ালু।’ (সূরা হাশর ১০)

তো এই রাস্তায় আগমন করেছিলেন মাহমুদ গজনবী (রহ.)। তাঁর পূর্বেও কেউ হয়তো এসে থাকবেন। সর্বশেষে আগমন করেছিলেন আহমদ শাহ

দুররানী। যিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ শক্তির কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং যিনি মোঘল শাসনেরই শুধু নয় বরং মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ও মর্যাদার নিভু নিভু প্রদীপে পুনরায় তেল সরবরাহ করেছিলেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রদীপকে পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। যার ফলে ভারতের মুসলমানরা পঞ্চাশ ষাট বৎসরের জন্য নিজেদেরকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিল। তো আমরা মাহমুদ গজনবী থেকে শুরু করে আহমদ শাহ দুররানী পর্যন্ত এই রাস্তায় আগমনকারী সকলের জন্য কল্যাণের দুআ করি এবং করতে থাকব ইনশাআল্লাহ। এই রাস্তাও আমাদের নিকট অতি প্রিয় যে রাস্তায় এই সকল বীরদের আগমন ঘটেছিল। কিন্তু যেমনটা একটু পূর্বে মাওলানা সামিউল হক সাহেব বলেছেন এবং যথার্থই বলেছেন যে, এ'লায়ে কালিমা তুল্লাহর লক্ষ্যে, নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, সুন্নাতকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে, মুসলমানদের জীবনকে শরীয়তের আদলে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, ادخلوا في السلم তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর -এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শরয়ী হুদুদ ও শরয়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শত শত বৎসর পরে শুধু হিন্দুস্তানের ইতিহাসেই নয়; বরং আমি যতদূর অধ্যয়ন করেছি, সেই আলোকে বলছি যে, সারা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে শত শত বৎসর পরে যে পবিত্র ও বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমবার যে ভূমিতে প্রবাহিত হয়েছে সেই ভূমি হচ্ছে এই ভূমি। এই আকুড়াখটকের ভূমি।

এখানে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত জিহাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যার প্রচলন পৃথিবীতে প্রায় ছিল না বললেই চলে। কোন বাদশাহ কি বীর কি গাজী সম্পর্কে ইতিহাসে পাওয়া যায় না যে, জিহাদ আরম্ভের পূর্বে সে শত্রুর নিকট তিনটি বিষয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। প্রথমত ইসলামের প্রতি আহ্বান যে, আমরা তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে তোমাদের এই ভূমি তোমাদের হাতেই ন্যস্ত করে যাব। তোমরা আমাদের ভাইয়ে পরিণত হবে। ইসলাম গ্রহণের পর তোমাদের ভূমি দখল করে, তোমাদেরকে উচ্ছেদ করে এখানে আমাদের নিজেদের বসতি স্থাপনের কোন অধিকার থাকবে না। কারণ এখানে মালিকানার পরিবর্তন নয়, পরিবর্তন প্রয়োজন দ্বীনের ও মতাদর্শের। যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর তবে কর দিতে রাজি হয়ে যাও এবং আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নাও। আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করব, তোমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করব। জিযিয়া ও কর দিতে যদি না চাও তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এগুলো জিহাদের পূর্ব শর্ত। শর্তগুলো ছিল অপরিহার্য।

বালাজুরী প্রণীত ফুতুহুল বুলদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুসলিম সৈনিকেরা যখন সমরকন্দে প্রবেশ করেছিল তখন এই শর্তগুলো পালন না করেই সমরকন্দ আক্রমণ করেছিল এবং তা জয় করে নিয়েছিল। সমরকন্দবাসীরা জেনে গিয়েছিল যে, ইসলামের মৌলিক বিধান হল প্রথমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান। অতঃপর জিযিয়া প্রদানের আহ্বান। ইসলাম গ্রহণ ও জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তারপর যুদ্ধ ও জিহাদ। কিন্তু সমরকন্দবাসীদের চেতনার উদয় হল যত দিনে, মুসলমানরা তত দিনে সমরকন্দে বসতি স্থাপন করে ফেলেছে এবং ঘর-বাড়ি তৈরি করে ফেলেছে। তারা তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন, ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসাবে প্রসিদ্ধ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ.)-এর নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করল। প্রতিনিধি দল এসে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ.)-এর নিকট অভিযোগ করল যে, এই রীতি পালন ব্যতীতই, শরীয়তের একটি হুকুমের উপর আমল না করেই মুসলিম সৈনিকরা সমরকন্দ দখল করেছে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ তৎক্ষণাৎ একটি পত্র লিখলেন সমরকন্দের কাজীর উদ্দেশ্যে।

লিখলেন- পত্র পাওয়ামাত্র আদালত কায়েম করবেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, মুসলিম সেনাপতি সমরকন্দ বিজয়কালে এই সুন্নাহ ও রীতি অনুযায়ী আমল করেছিল কি না। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম সেনাপতি প্রথমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান অতঃপর জিযিয়া দাবি না করেই সমরকন্দে প্রবেশ করেছিল, তবে যেন সকল সৈনিক সমরকন্দ ত্যাগ করে এবং সমরকন্দের সীমানার বাইরে চলে যায়। অতঃপর তারা যেন নতুন করে এই সুন্নাহের উপর আমল করে। প্রথমে তারা সমরকন্দবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে তো ভাল নতুবা তাদের নিকট জিযিয়া বা কর দাবি করবে। জিযিয়া দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। কাজী সাহেব পত্র পেয়েই আদালত কায়েম করলেন। আসামী মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। দুনিয়ার ইতিহাসে এর উদাহরণ পাওয়া যাবে না। যে সেনাপতির তরবারী তুর্কিস্তানের রাজধানী জয় করল সেই সেনাপতি সাধারণ একজন মুসলমানের ন্যায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে! মসজিদে স্থাপিত আদালতে, জনসমক্ষে! তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করলেন। বললেন, অবিরাম যুদ্ধের ডামাডোল, একের পর এক বিজয়ের আনন্দে এখানে এই ভুলটা হয়ে গেছে। শরীয়তের বিধানের উপর আমল করা হয়নি। ব্যস, কাজী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন সমরকন্দ শহর ছেড়ে বাইরে চলে

যেতে, শহরকে মুক্ত করে দিতে। মুসলমানরা ঘর-বাড়ি বানিয়ে নিয়েছিল, জমি-জিরাত চাষাবাদ করেছিল। কিন্তু সবকিছু ত্যাগ করে তারা শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। এই অবস্থা দর্শনে তথাকার মূর্তিপূজারী, মুশরিক ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। তারা দেখল, শরীয়তের বিধি-বিধানের মর্যাদা মুসলমানদের নিকট কী পরিমাণ। তারা দেখল যে, ইসলামে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এরূপ যে, একজন কমাণ্ডার ইন চীফকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় এবং তার বিরুদ্ধে রায় কার্যকর হয়। এসব দেখে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, আমরা এমনিতেই মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। অতঃপর সমরকন্দের সকলেই একযোগে মুসলমান হয়ে গেল।

ঘটনাটি বর্ণনা করে আমি বলতে চাচ্ছি যে, তখনকার যুগেও কখনও কখনও জিহাদের এই সূনাত ছুটে যেত। পরবর্তী যুগের কথা তো বলাইবাহুল্য। নির্দিষ্ট তারিখ বলা তো কঠিন, তবে এতটুকু বলা যায় যে, পরবর্তীকালের মুসলমানদের বিজয়ের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই না যে, এই সূনাতের উপর যথাযথভাবে আমল করা হয়েছে। মুসলিম সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়েছে আর সামনে যে শহর বা দেশ পড়েছে তা জয় করে গেছে। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দা, এই মর্দে মুজাহিদ যার নাম সাইয়েদ আহমদ শহীদ এবং তাঁর সঙ্গী শাহ ইসমাইল শহীদ যিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন, তাঁর ডান হাত ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজী ও মুফতী ছিলেন— এই দুইজন প্রথমবার এই সূনাতের উপর আমল করলেন। এই আকুড়াখটক থেকেই তাঁরা জিহাদের পূর্বশর্ত সম্বলিত ঘোষণাপত্র লাহোরে প্রেরণ করলেন। যা হুবহু ইতিহাস গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে। তো এই আকুড়াখটকই সেই ভূমি যা ঐ মুজাহিদদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

শহীদের রক্ত বৃথা যায় না

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

মনে রেখ, শহীদের রক্ত বৃথা যায় না। তা সহস্র বাগানে ফুল ফোটে। শহীদের রক্তের বিনিময়ে যেরূপ বাগান সৃষ্টি হয় তদ্রূপ মাদরাসাও সৃষ্টি হয়। খানকাও সৃষ্টি হয়। মসজিদও অস্তিত্ব লাভ করে। আর ঐ রক্তে রঞ্জিত ভূমি আল্লাহর রাস্তায় মর্যাদাশীল বলে গণ্য হয়। কারণ তাতে গড়িয়ে পড়েছে মুজাহিদ ও শহীদদের রক্ত। তো আপনাদের এই ভূমির জন্য রয়েছে সেই গর্ব। আল্লাহর রাস্তায় বিশুদ্ধ জিহাদ এখানে সংঘটিত হয়েছে। আসতে পথে কিছুক্ষণ পূর্বে আমি

সফর সঙ্গীদের শুনাচ্ছিলাম যে, আমাদের রায়বেরেলীর আবদুল মজীদ খান নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামও ঐ সৈনিকের তালিকায় ছিল যাদেরকে রাতে প্রেরণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আকুড়াখটক আক্রমণের জন্য রাতের সময়টাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। আকুড়াখটক থেকে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর সেনাছাউনি ছিল আট-দশ ক্রোশ দূরে। সিদ্ধান্ত ছিল রাতে আক্রমণ করে সেনাবাহিনী পুনরায় সেনা ছাউনিতে ফিরে যাবে। ঐ সময় আবদুল মজীদ খান সাহেব ছিলেন অসুস্থ। অসুস্থতার কারণে তিনি দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন। সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর নিকট সৈন্যদের নামের তালিকা পেশ করা হলে তিনি বললেন, আবদুল মজীদ তো অসুস্থ ও দুর্বল। এটা জিহাদের সূচনা মাত্র, শেষ নয়। অতএব সে জিহাদে অংশগ্রহণের আরও অনেক সুযোগ পাবে। এই বলে তিনি তালিকা থেকে তার নাম বাদ দিয়ে দিলেন। অন্য কেউ হলে হয়তো এতে খুশিই হত। কারণ জিহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কারও নেই। জিহাদে নানাবিধ ভয়াবহ অবস্থা সামনে আসতে পারে। জীবনও চলে যেতে পারে। সুতরাং এটা তো খুশির বিষয় যে, আমীর নিজেই তার নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু না, আবদুল মজীদ খান সাহেব যখন তাঁর নাম বাদ দেওয়ার সংবাদ শুনলেন তখন দৌড়ে সাইয়েদ আহমদ সাহেবের নিকট আসলেন এবং অভিমানের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তার নাম বাদ কেন বাদ দেওয়া হল?

সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) বললেন, ভাই! আমি শুনেছি, তুমি জ্বরে আক্রান্ত, তোমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। এই জিহাদ হবে কঠিন জিহাদ। এর জন্য প্রয়োজন সুস্থ, সবল ও ধকল-সহনশীল শরীরের। তোমার শরীরের প্রতি লক্ষ্য করেই তোমার নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি।

আবদুল মজীদ সাহেব বললেন, হযরত! আজ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বুনিয়াদ রচিত হচ্ছে, এটা প্রথম সুযোগ। আমি কি এই বুনিয়াদ রচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকব? আল্লাহর ওয়াস্তে আমার নাম তালিকাভুক্ত করে নিন। এরপর তাঁর নাম তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হল। আল্লাহ তাঁকে কবুল করে নিলেন। ঐ জিহাদে তিনি শহীদ হলেন।

আকুড়াখটকের আরও অনেক জায়গায় সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) জিহাদ করেছেন। সে সকল জায়গার নামও আমার জানা আছে। আমি এই রাস্তায় এই প্রথমবার এসেছি। এর পূর্বে প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি পেশোয়ারের রাস্তায় এসেছিলাম। তখন দারুল উলুম হক্কানিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমি এসেছিলাম এবং ঘোরাফেরা করে চলে গিয়েছিলাম। আমি কি জানতাম যে, এই

দারুল উলুম হক্কানিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে আর আমার জীবন আমার সঙ্গে প্রতারণা করবে না, আমি জীবিত থাকব আর স্বচক্ষে এই দারুল উলুম দেখব, যা শুধু সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.)-এর স্মৃতিধারকই নয়; বরং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত?

এই সম্পর্ক ইনশাআল্লাহ রঙ ধরিয়ে দেবে। শহীদদ্বয়ের রক্ত রাঙিয়েছে। এই সম্পর্কও রাঙাবে। প্রতিষ্ঠানটির নাম হক্কানিয়াত। এখানে হক্কানিয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। এখান থেকে শিক্ষা সমাপণ করে যারা বের হবে তারা সত্যের মশালধারী হবে। আল্লাহ তাআলা শায়খুল উলামা, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেব মুন্নাযিল্লুল আলী-র হায়াতে বরকত দান করুন। এই মাদ্রাসার সফলতা দেখে তাঁর চোখ শীতল হোক, তিনি আনন্দিত হোন। আল্লাহ তাঁর রচিত বাগানকে সবুজ-শ্যামল রাখুন, ফুলে ফলে সুশোভিত করুন। এখানে এরূপ একটি মাদরাসার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল যেখানে قال الله এবং قال الرسول -এর আওয়াজ ধ্বনিত হবে। কারণ قال الله এবং قال الرسول -এর ফলশ্রুতিতেই কত আল্লাহরবান্দা জীবনবাজী রেখে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে, ভারত থেকে এবং আরও কত জায়গা থেকে এখানে এসেছেন। قال الله এবং قال الرسول ই তাদেরকে এত দূর থেকে এখানে টেনে এনেছিল। এখানে قال الله এবং قال الرسول -এর আওয়াজ যত দিন ধ্বনিত হতে থাকবে তত দিন আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। কবি হাফিজ-এর এই কবিতা দিয়ে আমি শেষ করছি।

از صد غنچه پیرمی نکته مرآداست

عالم نه شد ویراں تا میکده آبادست

আমার মুর্শিদের শত কথার মধ্য থেকে একটি কথাই আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। জগত বিরাগভূমিতে পরিণত হবে না, যত দিন মারেফাতের এই শরাবখানা থাকবে প্রাণবন্ত।

قال الله আর قال الرسول -এর কেন্দ্র টিকে থাকলে তো জগত বিরাগভূমিতে পরিণত হবে না। হাদীসে বলা হয়েছে, যত দিন আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণকারী একজন ব্যক্তিও পৃথিবীতে থাকবে তত দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আপনাদের প্রতি মোবারকবাদ, এই ভূখণ্ডটির প্রতিও মোবারকবাদ।

تازه خواهی داشتن گرداغهای سیفدرا
 گاهے باز خواں این قصہ پارینہ را

হৃদয়ের উত্তাপকে যদি জীবন্ত রাখতে চাও পুরোনো এই কাহিনী কখনও কখনও নতুন করে পাঠ করো।

আপনারা এই দারুল উলূমের মূল্যায়ন করবেন। এর শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের মূল্যায়ন করবেন। মেধাবী ছাত্রদেরকে এখানে প্রেরণ করবেন। কেননা মাওলানা সামিউল হক সাহেব যেমনটা বললেন যে, পাশ্চাত্য ফেতনার মোকাবেলায় মেধাবী ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এমন ব্যক্তির প্রয়োজন যার মধ্যে রয়েছে সাহস ও প্রেরণা, যার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে সম্ভ্রান্ত রক্ত, মুজাহিদ ও শহীদের রক্ত। তারা আসুক এবং কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করুক। অতঃপর সঙ্কটে আপতিত এই ভূখণ্ডে, যেখানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং তার জন্য নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ চলছে তারা যেন দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে।

এখানেই আমার কথা আমি শেষ করছি। এখানে এসে আমি কারও প্রতি অনুগ্রহ করিনি। বরং আমি নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করেছি। আমন্ত্রণকারীগণ আমার এবং সঙ্গীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরা আমাদেরকে এই পবিত্র ভূখণ্ড দ্বিতীয়বার দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছেন। যে লক্ষ্যে এই ভূখণ্ড রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবীতে সেই লক্ষ্যকে ব্যাপক করে দিন। ইসলামের কালিমা বুলন্দ হোক। ইসলাম জয়ী হোক। আমাদের ঘরে, পরিবারে, অফিস-আদালতে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানে ইসলাম বাস্তবায়ন হোক।

اللهم انصر من نصردين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم

واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم

‘হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে সাহায্য কর, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে সাহায্য করে এবং আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। আর যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে লাঞ্ছিত করে তাদেরকে তুমি লাঞ্ছিত কর এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না।’

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ সকলকে সকল শারীরিক ও আত্মিক রোগ থেকে মুক্ত করে দিন। সুস্বাস্থ্য দান করুন। তিনি আমাদেরকে

ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত দান করুন। আমাদের অন্তর্জগতকে আলোকিত করুন।
 আমাদের মন-মস্তিষ্কে প্রখর করুন। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তি দান করুন।
 আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ এবং উন্মত্তে মুহাম্মাদিয়ার দায়িত্ব

[ফয়সালাবাদে অবস্থিত জামেয়া তালিমাতে ইসলামিয়ার ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সামনে প্রদত্ত ভাষণ। সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৮ ইসায়ী সনের ২৩ জুলাই জামেয়ার মিলনায়তনে। স্বাগত ভাষণ ও পরিচিতি তুলে ধরেন জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার উস্তাদ মাওলানা আবদুল গাফফার হাসান সাহেব।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى بِدَعْوَتِهِمْ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

জামেয়ার দায়িত্বশীল, শিক্ষকবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আমি আপনাদের এই মাহফিলে যোগদান করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। এখানে নিজেকে পরদেশী বলে মনে হচ্ছে না। এরূপ মনে করা আমার উচিতও নয়। কারণ আমরা সকলেই একই ভাষাভাষী, একই চিন্তা-চেতনার অধিকারী, একই নৌকার আরোহী, একই কাফেলার যাত্রী। সে কাফেলা হল ইলমে দ্বীনের কাফেলা, ইসলামের দাওয়াত, ইসলামের প্রতিনিধিত্বের কাফেলা।

সুধী!

আমি মনে করি আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা বা আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় চ্যালেঞ্জ তা হল জড়বাদিতা ও ইহজাগতিকতা, প্রবৃত্তিপূজা ও অর্থ-সম্পদ। এই ফেতনা নতুন নয়, এটি সর্ব যুগের ফেতনা। কিন্তু বর্তমান যুগে ফেতনাটি যেরূপ বিন্যস্ত, শক্তিশালী ও প্রমাণপুষ্ট হয়ে এবং দর্শনের মোড়কে সামনে এসেছে তদ্রূপ আর কখনও আসেনি। অতীতে ইহ-জাগতিকতার উন্মত্তি কালে যারা ইহ-জাগতিক উন্মত্তির শীর্ষ পর্যায়ে ছিল তারাও কিছুটা অপরাধবোধে

ভুগত। তারা প্রবৃত্তির দাস ছিল, অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার পূজারী ছিল কিন্তু এতে তারা গর্ববোধ করত না। বরং কিছুটা লাজ-লজ্জার ভাব তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হত। তাদের এই উপলব্ধি ছিল যে, তারা কোন একটা ভুল করছে। তারা উপলব্ধি করত যে, বিলাসী সামগ্রী ও অর্থ-সম্পদ দ্বারা তারা শরীরী শান্তি তো অর্জন করতে পারছে কিন্তু মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে তারা সক্ষম হচ্ছে না। আপনি সেই যুগের ইতিহাস পাঠ করুন এবং জড়বাদী দর্শনের ধজাধারীদের অবস্থা পরীক্ষা করুন।

আপনি দেখবেন ও জানতে পারবেন যে, সেই যুগের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ তো বটেই এমনকি যারা কিছুটা দুনিয়াবিমুখ ছিল তাদের সামনেও এই দুনিয়াদাররা মাথানত করে ফেলত। তাদেরকে সম্মান করত। তাদের সামনে আসতে তারা কুণ্ঠা ও লজ্জাবোধ করত। তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস তারা পেত না। তাদের মধ্যে নফসে লাওয়ামা ছিল। তথা ঐ হৃদয় যার কারণে মানুষের মধ্যে অপরাধবোধ থাকে। তাদের হৃদয় সেইরূপই ছিল। ঘন অন্ধকারে বাস করেও তারা উপলব্ধি করত যে, তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তাদের অনেকেই একাকী ও নির্জনে চোখের পানি ফেলত। তাদের হৃদয় যখন জাগ্রত হত তখন তারা কখনও কখনও স্বীকার করে নিত যে, তাদের পথ ভ্রান্ত পথ, তারা প্রবৃত্তির দাসত্ব নিগড়ে বন্দী হয়ে আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় শিবিরের

চিন্তা-চেতনায় কোন পার্থক্য নেই

কিন্তু এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল, অর্থ-সম্পদ ও ইহ-জাগতিক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি ও চরম সফলতা বলে মনে করা হয়। বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। মতভেদ ও অনৈক্য শুধু অর্থ-সম্পদ ও জীবনোপকরণের উপার্জন ও তা ব্যয়ের ব্যবস্থাপনা নিয়ে। কোন মতবাদ ও দর্শন অনুযায়ী পৃথিবীর অর্থ-সম্পদ ও জীবনোপকরণ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে তা নিয়ে। আমেরিকার বক্তব্য হল— অর্থ-সম্পদে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা ও তা ব্যবহারের যথেষ্ট স্বাধীনতার নীতিই বিশুদ্ধ ও সঠিক নীতি। পক্ষান্তরে রাশিয়া সহ কমিউনিস্ট ব্লক বিশ্বাস করে যে, অর্থ-সম্পদে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ইজারাদারী চলবে না। জীবনোপকরণকে ব্যাপক করে দেওয়া উচিত এবং তাতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আর তা করতে অর্থ-সম্পদ ও তা উপার্জনের উপকরণ রাষ্ট্রীয় অধিকারে থাকা উচিত। কিন্তু

কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে; জীবনের শক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত, জীবনকে কিভাবে সুসংহত করতে হবে, উপকরণ ও লক্ষ্যের মাঝে কিভাবে সেতু বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, অতঃপর উৎপাদিত ফল দ্বারা কিভাবে উপকৃত হওয়া যাবে এবং জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও মনয়িলে মাকসুদ কী, মানুষের প্রকৃত উন্নতি কোন জিনিসের মধ্যে নিহিত রয়েছে ইত্যাদি প্রশ্নে এই দুই মতবাদের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। উভয় মতবাদ ও উভয় দর্শনই এ বিষয়ে এক ও অভিন্ন চিন্তাধারা লালন করে যে, জীবনের মূল লক্ষ্য হল ভোগ-বিলাসিতা, আনন্দ উপভোগ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা। মন যা চায় তাই করা এবং প্রবৃত্তিকে জীবন উপভোগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা। নিজের পার্থিব লালসাকে পূর্ণ করা, প্রবৃত্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এই অস্থি-মাংসের শরীরকে পূর্ণ শান্তি দান। এগুলোই জীবনের লক্ষ্য। আমরা না অন্য কোথা থেকে এসেছি, না অন্য কোথাও যেতে হবে, না অন্য কারও সামনে আমাদের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এতদপেক্ষা না উন্নত কোন চারিত্রিক দর্শন আছে, না আধ্যাত্মিক দর্শন, না আকীদা-বিশ্বাসগত কোন দর্শন। এটাই প্রকৃত সত্য এবং মহা সত্য হল- আমরা পৃথিবীতে এসেছি পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ও ভোগ্য সামগ্রীকে কাজে লাগাতে। এগুলোকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে ভোগ করতে। জীবনকে উপভোগ্য করে তুলতে। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে যা কিছু বাধা তা দূর করতে হবে। অর্থাৎ ভোগবাদী সব দর্শনের লক্ষ্য হল ভোগ। এই ভোগের পথে অন্তরায় ও বাধা কোন বিষয়টি তা চিহ্নিত করণে ভোগবাদীদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলে, ব্যক্তি-ক্ষমতা অন্তরায়, কোন গোষ্ঠীর নিরক্ষুশ আধিপত্য অন্তরায়। কেউ বলে, ব্যক্তি মালিকানা অন্তরায়। কেউ বলে পুঁজিবাদ অন্তরায়। কেউ বলে, সম্পদের বণ্টন-বৈষম্য অন্তরায়। কেউ বলে, অজ্ঞতা অন্তরায়। কেউ বলে, অন্তরায় হচ্ছে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি, যে প্রতিষ্ঠান জীবনোপকরণকে সকলের মাঝে সুষম বণ্টন করতে সক্ষম হবে।

মোটকথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোন দর্শন ও মতবাদের কোন দ্বিমত নেই, দ্বিমত শুধু শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে। বর্তমান যুগে বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতাকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে, যেভাবে তাকে Refine করে তার চটকদার নাম দেওয়া হয়েছে এবং সুদৃশ্য লেবেল লাগানো হয়েছে, এর পিছনে যে শক্তি ও মেধা ব্যয় হচ্ছে, যেভাবে বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতাকে ব্যাপকতা দান করতে এবং তাকে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, আমাদের জানা মতে মানব ইতিহাসে এর পূর্বে তেমনটা হয়েছে বলে কোন রেকর্ড নেই।

অতএব বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ হল বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতার চ্যালেঞ্জ। এটা এমন এক সামগ্রিক মতবাদ ও দর্শন যে, এর বাস্তবায়নের নীতিমালা ও শাখা-প্রশাখা তো বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু মৌলিকত্বে কোন পার্থক্য নেই। রূপ ও আকারগতভাবে তা হতে পারে পুঁজিবাদ কিংবা সমাজবাদ ও সাম্যবাদ বা অন্য কোন অর্থনৈতিক দর্শন কিন্তু সব মতবাদ ও দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হল ভোগবাদিতা ও প্রবৃত্তি-পূজা।

যখন মানুষ ছিল উদর প্রবৃত্তির দাস, হীন প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট চাহিদার দাস, যখন মানুষের নিকট নারী, সম্পদ ও জমি-জমা ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই কোন মূল্য ছিল না, যখন পৃথিবীর মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ব্যতীত সকলেই মাখলুকের সামনে মাথানত করত, মাখলুকের নিকট আত্মসমর্পণ করত তখন আখিয়া আলাইহিমুস সালাম স্ব-স্ব যুগে আগমন করলেন এবং তাঁরা পৃথিবীবাসীকে জানালেন যে, এই জগতের পরেও এক জগত আছে। সেই জগত এই জগত অপেক্ষা বৃহৎ, আকর্ষণীয় ও মোহনীয়। যদি তোমরা সেই জগতকে দেখতে তবে এই ইহজগতকে প্রশ্রয় দেওয়া তোমাদের জন্য কঠিন হত। সেই জগত যদি তোমরা দেখ তাহলে এই জগতে জীবন যাপন করা ঐ মাছের ন্যায় হয়ে যাবে যাকে পানি থেকে উঠিয়ে পানিবিহীন শুষ্ক জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছে। ফলে সে ছটফট করে মৃত্যুবরণ করছে। তদ্রূপ তোমরা যদি ঐ জগতকে দেখ তাহলে তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং এই জগতের প্রতি তোমাদের ঘৃণা সৃষ্টি হবে। যে দুনিয়াকে তোমরা সর্বস্ব মনে করছ, যে দুনিয়ার জন্য তোমরা তোমাদের মূল্যবান সম্পদ—নৈতিকতা, চরিত্র ও জ্ঞান বিসর্জন দিচ্ছ সেই দুনিয়া তোমাদের নিকট ঘৃণিত মনে হবে। কোন ব্যক্তিকে যেমন মলমূত্র ও পুঁতিগন্ধময় আবর্জনার স্তুপের নিকট এক মিনিটের জন্যও দাঁড় করিয়ে দিলে তার দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়, তার নাড়িভূড়ি বের হয়ে আসতে চায়, বমি হওয়ার উপক্রম হয় ঐ জগত দেখলে এই দুনিয়াকেও তোমাদের নিকট পুঁতিগন্ধময় মলমূত্র ও আবর্জনার স্তুপ বলে মনে হত। এই কথাই বিভিন্ন আসমানী গ্রন্থ বিশেষত কুরআন মাজীদ ব্যক্ত করেছে। বলেছে—

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

‘বল, দুনিয়ার ভোগসামগ্রী যৎসামান্য।

কোথাও দুনিয়াকে বলা হয়েছে حطام বা খড়কুটা। কোথাও বলা হয়েছে زرع শস্যক্ষেত। কোথাও বলা হয়েছে—

كزوع اعجب الكفار نباته

শস্যসম্ভারের ন্যায়, যা কৃষককে চমৎকৃত করে।

তা দেখে কৃষকের লোভী জিহ্বা হতে লাল টপকে পড়তে থাকে।

সে বলতে থাকে কী চমৎকার ক্ষেত্র, কী সুন্দর ফসল! অতঃপর এক ঝঞ্ঝা বায়ু আসে আর সব শস্যসম্ভারকে খড়-কুটায় পরিণত করে। কৃষকের কান্ধে তাতে ব্যবহারের পর সে বুঝতে পারে আসলে কিছুই নাই, সব শেষ হয়ে গেছে।

আল্লাহর নবীগণ সর্বপ্রথম দুনিয়ার স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন যে, দুনিয়া প্রকৃতপক্ষে শিশুদের খেলাধুলা। শিশুরা ধুলোবালি দিয়ে ঘর বানায়, সংসার পাতে অতঃপর নিজের হাতেই তা ভেঙ্গে ফেলে। তাদের নির্মিত ক্ষণস্থায়ী ঘর দেখে তারা খুব আনন্দ বোধ করে কিন্তু ক্ষণকাল পরে নিজেরাই তা ভেঙ্গে ফেলে। যারা বুদ্ধিমান, সত্যসন্ধানী তাদের নিকট এই দুনিয়া শিশুদের নির্মিত ঐ খেলাঘর ব্যতীত কিছুই নয়।

একবার বাগদাদের একটি মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম অতীত যুগের বিভিন্ন সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সব নিদর্শন। এছাড়া নমরুদ সহ বিভিন্ন বাদশাহর যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো স্মারক হিসেবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর আমার মানসপটে ভেসে উঠল অতীতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ ও কাল। অতীতে বিচরণ করতে করতে আব্বাসীয় যুগ অতঃপর সেলজুকীয় যুগ, তাতারী যুগ, মোঘল শাসনের যুগ, তুর্কী যুগ, ইংরেজ যুগ, ফয়সাল বিন হুসাইন যুগ- এসব আমার মানসপটে ভেসে উঠল। আপনি বিশ্বাস করুন, ততক্ষণে পৃথিবীর ও যুগের এই পরিবর্তন চিন্তা করে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমার শুধু মনে হল- এই সবই তামাশা আর তামাশা। এসব বাদশাহী যুগের অবসান ঘটতে হাজার বছর লেগেছে। কোন কোন শাসনের অবসান ঘটতে লেগে গিয়েছে পাঁচশত বৎসর। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, তাদের শাসনকাল ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার। যা ছিল মূলত নিছক ধোঁকা আর তামাশা অথবা ছিল স্বপ্ন। মানুষ যাকে হাজার বছরের শাসন মনে করেছে। আমরা সেসব শাসনের পরিসমাপ্তি দেখে ফেলেছি। আমরা এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে মানবতার শুধু খড়কুটো পড়ে রয়েছে। আমরা যেন দাঁড়িয়ে আছি সেই খড়-কুটোর উপর। তদ্রূপ আমাদের পরে যারা আসবে তারাও এইরূপই দেখবে। তাদের নিকটও এইরূপই মনে হবে। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন-

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

বল, দুনিয়ার ভোগ অত্যন্ত স্বল্প। আমরা যাকে অত্যন্ত দীর্ঘ মনে করি তা আসলে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা দুনিয়াকে প্রাণচঞ্চল রাখা। এই কারণে দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে সকল মানুষের হৃদয়ে সমভাবে উপলব্ধি জাগ্রত করেননি। আল্লাহর অভিজ্ঞানে যারা সমৃদ্ধ তাঁদের হৃদয়েই শুধু দুনিয়ার প্রকৃত রূপ, এর ক্ষণস্থায়িত্ব ও ধ্বংসশীলতার উপলব্ধি পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন। সকলেই যদি সমভাবে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব, এর ভঙ্গুরতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করত তাহলে দুনিয়া বিরাগভূমিতে পরিণত হত। এই দুনিয়ায় ঘর-বাড়ী নির্মাণ করতে কেউই আগ্রহী হত না। কল-কারখানা নির্মাণ করতে কারও মনে চাইত না। এটা আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল। যে, তিনি দুনিয়ার স্বরূপকে মানুষের চোখের আড়াল করে রেখেছেন। দুনিয়ার স্বরূপ যদি সকলের চোখে উন্মোচিত হয়ে যেত, পরে যা ঘটবে তা যদি মানুষ পূর্বেই প্রত্যক্ষ করে ফেলত, তাহলে মানুষ কর্তৃক দুনিয়াতে কোন কর্মই সংঘটিত হত না। তাদের হয়তো দম বেরিয়ে যেত অথবা হাতের উপর হাত রেখে নিশ্চল বসে থাকত। নবীগণ ও নায়েবীনে নবীগণের কথা তো ভিন্ন। এটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যে, তাঁদের সামনে দুনিয়ার স্বরূপ ও আখেরাত প্রত্যক্ষকরণের ন্যায় সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দুনিয়ার সকল কর্ম সম্পাদন করেছেন। দুনিয়ার হক আদায় করেছেন। ঘনিষ্ঠজন, সঙ্গী-সাথীর হক আদায় করেছেন। সকল মানুষের হক আদায় করেছেন। দুনিয়াতে তাঁরা বসবাস করেছেন যথোপযুক্ত যোগ্যতার সাথে। প্রশান্তির সাথে থেকেছেন, দৃঢ়তার সাথে থেকেছেন। নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছেন। যে জনপদে থেকেছেন, যে নগরে থেকেছেন তা সংস্কার করেছেন, পরিচ্ছন্ন করেছেন। কিন্তু তাঁরা এক মিনিটের জন্যও নিজের হৃদয়কে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেননি। তাঁরা সব সময় বলেছেন—

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة

‘হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই একমাত্র জীবন।’

কেননা তারা পার্থিব জীবনের পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁরা নির্মাণ কাজও করেছেন, ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছেন, মসজিদও নির্মাণ করেছেন। ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। যুদ্ধ করেছেন, জয়লাভ করেছেন। বিভিন্ন দেশকে আল্লাহর আইনভুক্ত করেছেন। নতুন নতুন বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের একরূপ ভিত্তি রচনা করেছেন, যা আজ অবধি মজবুত ও শক্তিশালী রয়েছে। এই সবকিছু তাঁরা করেছেন। কিন্তু আমাদের ও তাঁদের মাঝে পার্থক্য হল,

তঁারা দুনিয়াকে শেষ মনযিল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করেননি। তঁারা দুনিয়াকে মনে করেছেন জীবন পথের সূচনা মনযিল।

তৎকালে অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতার যে সম্মোহনী শক্তি ছিল সেই সম্মোহনী শক্তিকে ভোগবাদিতা থেকে মুক্ত মানুষ ভেঙ্গে চুরমার করে দিত। ভোগবাদিতার দাস হয়ে যেত না। তারা অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবকে নিজেদের অনুগত করে নিত। তারা নিজেরা অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের অনুগত হত না। তারা অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের কাঁধে সওয়ার হয়ে চলত। তাদের কাঁধে এগুলো কখনও সওয়ার হতে পারত না। এ কালের সঙ্গে সে কালের পার্থক্য এটাই যে, এই কালে অর্থ-সম্পদ ও ভোগ-লিস্সা আমাদের কাঁধে সওয়ার হয়ে বসেছে। আমরা সেগুলোর বাহন হয়ে পড়েছি। আমরা সেগুলোকে বাহন বানিয়ে আরোহী হতে পারিনি। আরোহী হলেও এ রকম আরোহী যে, না বাহনের লাগাম আমাদের হাতে, না আমাদের পা বাহনের পা দানিতে।

“نہ ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں”

বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতার ঘোড়া আমাদেরকে তড়িত করে ফিরছে। আমরা বুঝতে পারছি না যে, ঐ ঘোড়াকে আমরা কোন দিকে ছুটাবো, কিভাবে তা থেকে পরিজ্ঞাণ পাবো। ঘোড়া হয়তো আমাদেরকে নিয়ে গভীর খাদে নিপতিত হবে অথবা অতল সাগরে তলিয়ে যাবে। কি হবে আমাদের জানা নেই। তো বর্তমানে আমাদের গোটা সমাজের অবস্থা এইরূপই। সমাজ আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। সমাজের লাগাম আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। অতীতের তঁারা সব সময়ই বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কানাত ও অল্পে তুষ্টির ঐশ্বর্য দান করেছিলেন। তারা রাজা-বাদশাহদেরকেও গণায় ধরতেন না। তঁারা রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে এরূপভাবে কথা বলতেন, যেন রাজা-বাদশাহরা রোগগ্রস্ত। তঁারা রাজা-বাদশাহদেরকে রোগগ্রস্ত বলেই ভাবতেন। তাদের প্রতি তাঁদের করুণা হত। তঁারা ভাবতেন, আহ! বেচারী বাদশাহ কি মহাবিপদে নিপতিত! রাজা-বাদশাহদের প্রতি তাঁদের অন্তরে অকৃত্রিম বেদনাবোধ জাগ্রত হত। রিব্বঈ ইবনে আমেরের (রাযি.) ঘটনা দেখুন। রুস্তম যখন তাঁকে প্রশ্ন করল, তোমরা কেন এসেছ? তিনি বললেন, আমরা তোমাদেরকে দুনিয়ার সক্ষীর্ণ কুঠরী থেকে বের করে দুনিয়ার মুক্ত ময়দানে নিয়ে যেতে এসেছি। সম্প্রতি আবুধাবিতে এক বয়ানে আমি বলেছিলাম, আল্লাহর বান্দা রিব্বঈ ইবনে আমের যদি বলতেন, আমরা তোমাদেরকে দুনিয়ার সক্ষীর্ণতা থেকে আখেরাতের

প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে এসেছি, তাহলে আমি বিস্মিত হতাম না একটুও। কারণ প্রত্যেকটি মুসলমানই তো বিশ্বাস করে যে,

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

দুনিয়া হল মুমিনের জন্য কারাগার স্বরূপ আর কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।

দুনিয়া তো একটি পাখির পিঞ্জর সদৃশ। কিন্তু আমি বিশ্বয়বোধ করি এই ভেবে যে, আল্লাহর ঐ বান্দার অবস্থা তো এইরূপ, প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যও যার নিকট হয়তো ছিল না, যিনি হয়তো জীর্ণ একখণ্ড বস্ত্রে কোন রকম নিজেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন। তিনি কী দেখে বললেন যে, আমরা তোমাদেরকে দুনিয়ার সঙ্কীর্ণ কুঠরী থেকে— যাতে তোমরা বন্দী হয়ে আছ— দুনিয়ার বিস্তৃত ও বিশাল প্রাঙ্গণে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি। আরবের জীবনোপকরণ কি বিস্তৃত ছিল? আরবে জীবনোপকরণ শুধু সীমিত নয় বরং প্রায় ছিল না বললে কি ভুল হবে? পেট ভরার মত দুই বেলার আহার জোগাড় করাও তো আরবের লোকদের জন্য কঠিন ছিল। যাদের বসবাস ছিল উটের চামড়া দ্বারা তৈরি তাঁবুতে কিংবা মাটির কুঁড়ে ঘরে। কোন বন্য পশু শিকার করতে পারলে যাদের মাঝে ঈদের আনন্দ বয়ে যেত। তাদের সে দিন মনে হত রিষিকের ভাণ্ডার তাদের জন্য খুলে গেছে। তো তাদেরই মধ্য থেকে এক আল্লাহর বান্দা বলল, তোমরা নিজেদের খবর নাও। কিছু আহার পেলে আর তাতে তোমরা খুশী হয়ে গেলে। আমরা তোমাদেরকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে এসেছি। তো এই ছিল তৎকালীন মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁরা ছিলেন স্ব-যুগের উলামায়ে রব্বানী। মানুষ তাদের নিকট যেত নিজেদের ভোগবাদী মানসিকতার চিকিৎসা করাতে। মানুষ মনে করত, ‘আমরা মহা কোন বিপদে নিপতিত আছি আর এঁরা কি সুখময় জীবন যাপন করছে যেন তারা জান্নাতে বসবাস করছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার উক্তি বর্ণিত আছে যে,

الجنة في صدري

জান্নাত আমার বুকে অবস্থিত।

এরূপ কথা তিনি বলতে পেরেছেন, কারণ আল্লাহর উপর তাঁর ভরসা ছিল। তিনি কোন কিছুতে ভয় পেতেন না। সব সময় অনাবিল এক আনন্দ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। নামাযে তিনি স্বাদ অনুভব করতেন, দুআয় অনুভব করতেন মিষ্টতা। সব সময় তিনি জান্নাতেই বিচরণ করতেন। লোকে দেখত তিনি দুনিয়াতে আছেন কিন্তু তিনি বিচরণ করতেন প্রকৃতপক্ষে জান্নাতুল ফেরদাউসে। আবেগপ্রবণ হয়ে

একবার বললেন, লোকে আমার কী হরণ করবে, আমার কোন জিনিস ছিনিয়ে নেবে? আমার শান্তি ও সুখের উপকরণ তো আমার হৃদয়-অভ্যন্তরে সংগুপ্ত। তাকে বের করে আনতে সক্ষম হবে কে?

কোন কোন আরেফের উক্তি উদ্ধৃত আছে যে, ‘যদি দুনিয়ার লোকে জানত যে, আমরা কী সুখ ও শান্তিতে রয়েছি, আমরা কী উপভোগ করছি তাহলে তারা আমাদের পিছনে লাগত, আমাদের উপর তরবারী হাতে আক্রমণ করত। মসজিদের নিভৃত এক পাশে যেখানে আমরা নিজেদের জন্য একটু স্থান নির্বাচিত করেছি সেখানেও আমাদের বসতে দিত না। মনে করত, এখানে বুঝি কোন ধন-ভাণ্ডার মজুদ রয়েছে।’

যে বিছানায় তাঁরা বসেন তাতে এত মগ্নতা ও তন্ময়তা থাকে যে, না তাদের ক্ষুধার অনুভূতি থাকে, না পিপাসার অনুভূতি। তাঁদের জায়নামাযের নিচে একটি যোগাযোগসূত্র আছে যেখান থেকে রিযিক লাভ হয়। যেখানে শান্তি ও সুখ উথলে ওঠে। লোকদের যদি এ সম্পর্কে ধারণা থাকত, তাহলে তারা তাঁদেরকে জঙ্গলে চলে যেতে বলত এবং নিজেরা ঐ স্থানে বসে খনন কার্য শুরু করত যেভাবে খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য মাটি খনন করা হয়।

অল্পে তুষ্টি এক মহাসম্পদ

সুধী!

প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতার মোকাবেলা ঐ সকল আলেমই করতে পারেন, যাঁদের মধ্যে অল্পে তুষ্টির মহা সম্পদ বিদ্যমান, যে সম্পদের কোন মূল্য হয় না। যাঁরা বলতে পারেন— যাও, অন্য কাউকে চেষ্টা করো, আমাদেরকে খরিদ করতে চেষ্টা করো না। আমরা অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে অথবা তোমাদের পদ ও পদবীর বিনিময়ে, সিংহাসনের বিনিময়ে অথবা সম্মানের বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রি করে দেব, নিজেদের হৃদয়ের প্রশান্তিকে বিক্রি করে দেব তা হবে না। এর আশাটিও করো না।

হযরত মির্জা মাজহার জানে জাঁনা-র নিকট দিল্লীর বাদশাহ অনুরোধ জানিয়ে পাঠাল যে, হযরত! আপনি আমাকে কখনও আপনার খেদমতের সুযোগ দেন না। একটিবার অন্তত আপনার খেদমতের সুযোগ দিন। অন্তত একটিবার আমাকে আপনার জন্য কিছু করতে নির্দেশ দিন। এরপর দিল্লীর বাদশাহ তাঁর জন্য এক হাজার টাকা পাঠাতে চাইলেন। তিনি বলে পাঠালেন, দেখুন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

বল, দুনিয়ার সামগ্রী অতি স্বল্প ও তুচ্ছ।

এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশ একটি অংশ মাত্র। এশিয়া মহাদেশের একটি ক্ষুদ্র দেশ হিন্দুস্তান। তারও একটি অংশবিশেষ আপনার শাসনাধীন। সেখান থেকেও আমি কিছু অংশ নিয়ে আপনার রাজত্ব ছোট করে দেব- তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কথাটি বলেছিলেন, অকৃত্রিমভাবেই, সম্পূর্ণ মন থেকে। এরূপ ঘটনা তো বহু আছে।

বুরহানপুরে এক বুয়ুর্গ ছিলেন। বাদশাহ আলমগীর তাঁর নিকট আসা-যাওয়া শুরু করলে তিনি বললেন, আমি আমার একটি স্থান নির্বাচিত করে নিয়েছি, এটাও যদি বাদশাহর পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আমি অন্য কোথাও চলে যাব। দুঃখের বিষয়, বুয়ুর্গানে দ্বীনের জীবন চরিত, তাঁদের ইতিহাস এমনভাবে লিখিত হয়েছে যে, তাতে তাঁদের শরীয়ত অনুসরণের আবেগ ও প্রেরণা, ইত্তিবায়ে সুন্নাতের জযবা ও আবেগ তাঁদের রাত্রি জাগরণ, কুরআন তেলাওয়াত, কুরআন ও হাদীসের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় অনালোচিত থেকে গেছে। ‘তারীখে গুজরাট’-এর প্রণেতা মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই মরহুমের ভাষায়- যে বুয়ুর্গেরই জীবন চরিত পাঠ করবে তাতে মনে হবে যে, অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত করণ ও কারামত প্রদর্শন ব্যতীত যেন ঐ সকল বুয়ুর্গের আর কোন কাজ ছিল না। মৌল উপাদান-চতুষ্টয় (মাটি ও বাতাস, আগুন ও পানি) এবং সৃষ্টিত্রয় (উদ্ভিদ, জড়বস্তু ও প্রাণীকুল) এর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই যেন তারা সদা সচেষ্ট থাকতেন। অমুককে মেরে ফেলল, তমুককে যিন্দা করল, নৌকা ডুবে গেল তো আঙ্গুলের ইশারায় তাকে আবার পানির উপরে উঠিয়ে আনল ইত্যাদি। ঐ সকল বুয়ুর্গের জীবন ইতিহাস ভ্রান্ত ধারায় লিখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন অনেক বড় জ্ঞানী, পর্যাণ্ড জ্ঞানের অধিকারী। হাঁ কখনও কখনও কোন কোন বুয়ুর্গ কর্তৃক বিশুদ্ধ হাদীস জানা না থাকার কারণে অথবা হাদীস শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ দখল না থাকার কারণে এরূপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেছে, যা হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা জ্ঞান ও ইলমের অধিকারী ছিলেন। ইলম ব্যতীত মুরশিদের পদে কেউ অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

আমি আপনাদের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

আয়াতটিতে নবুওয়াতের চারটি শাখার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যারা নায়েবে নবী আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এই শাখা চারটি নায়েবে নবী হিসাবে দান করে থাকেন।

এক. তেলাওয়াতে কুরআন, যার নমুনা আপনারা কিছুক্ষণ পূর্বে দেখেছেন। কয়েকজন কারী কুরআন তেলাওয়াত করে আমাদেরকে শুনিয়েছেন। প্রতিটি মাহফিলেই এইভাবে কুরআন তেলাওয়াতের প্রচলন রয়েছে। প্রতিটি মাদরাসাতেই হিফয ও তাজবীদ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

‘আমিই যিকির (তথা কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।’

আলোচ্য আয়াতটিতে তেলাওয়াতে কিতাবের পর তাযকিয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে—

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

কিতাব ও হেকমতের শিক্ষাদান কথাটিকে সেখানে তাযকিয়ার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদগ্ধ পণ্ডিত আলেমগণ বলবেন— কেন এক আয়াতে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দানের কথা পরে আনা হয়েছে। আর অপর আয়াতে কেন পূর্বে আনা হয়েছে? এটা গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির গবেষণার বিষয়। আমি আলোচনা করছি কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদান সম্পর্কে। কিতাবের শিক্ষাদান বলে দ্বীনী ইলমের শিক্ষাদান বোঝানো হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান, তাফসীর ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

হিকমাহ বলে আখলাক বোঝানো হয়েছে

হিকমাহ বলে আখলাকে ফায়েলা ও উন্নত চরিত্র বোঝানো হয়েছে। আমাদের উস্তাদ স্ব-যুগের বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর গবেষণা ও

তাহকীক তেমনটাই বলে। তিনি বলেন যে, হিকমাহ শব্দটি কুরআন কারীমের যত জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, সর্বত্র তা দ্বারা চরিত্র বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

‘আমি লুকমানকে হেকমত দান করেছি।’

এরপর যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সবই চরিত্র আর চরিত্র। প্রথমে হিকমাহ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর হিকমাহর যে শাখা-প্রশাখা আলোচিত হয়েছে তার সবই আখলাক ও চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। সূরা বনী ইসরাঈলে আখলাক সংক্রান্ত বিষয়াবলী বর্ণনার পর আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

‘তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা যে হিকমাহ দান করেছেন এইগুলি তার অন্তর্ভুক্ত।’ (সূরা বনী ইসরাঈল ৩৯)

এখানে উন্নত চরিত্রসমূহ বর্ণনার পর সেইগুলোকে হিকমাহ’র অন্তর্ভুক্ত বলে বলা হয়েছে। অতএব বোঝা গেল যে, হিকমাহ হল চরিত্র, উন্নত চরিত্র।

তায়কিয়াহ ব্যতীত কিতাব ও হিকমাহ’র শিক্ষা অসম্পূর্ণ

এরপর আসে নফসের পবিত্রতা অর্জনের বিষয়। মন্দ চরিত্রকে অন্তর থেকে বের করে দেওয়া, হিংসা-বিদ্বেষকে দূরীভূত করা। পার্থিব লালসা, অর্থ ও ক্ষমতা লিপ্সাকে দূরীভূত করা। এর পরিবর্তে অন্তরে আল্লাহর প্রেম, আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে সৃষ্টি করা। যে কোন জামেয়া ও দারুল উলূমের লক্ষ্য হওয়া উচিত এরূপ ব্যক্তিত্ব তৈরি করা, যারা তেলাওয়াত, তালীমে কিতাব, তালীমে হিকমাহ এবং তায়কিয়ায়ে নফস— এই চার বিভাগেই আশ্বিয়ায়ে কেরামের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তেলাওয়াত ও তালীমে কিতাব ও তালীমে হিকমাহ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত থেকে যাবে যদি এগুলোর সঙ্গে তায়কিয়ায়ে নফস না থাকে। অর্থাৎ আমাদের উলামায়ে কেরামকে নফস ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। সম্পদ ও সম্মানের কোন বিশাল পরিমাণও তাদেরকে নিজস্ব নীতি হতে, দাওয়াতী কার্যক্রম হতে, তাদের স্বকীয়তা হতে, শিক্ষা হতে এবং জীবন পদ্ধতি হতে তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারবে না— তাদেরকে এরূপ হতে হবে।

আজ আরব ও আয়ম কোন জায়গাতেই কোন কিছুর অভাব নেই, অভাব শুধু একটি জিনিসের। আর তা হল সাদাসিধা ও দুনিয়াবিমুখ জীবন যাপন এবং অল্পে তুষ্টি গুণ। মানুষ সেখানেই যায় যেখানে তার প্রয়োজনীয় ও অভাবের বস্তুর সন্ধান পায়। এটাই রীতি। আমার যদি কোন জিনিসের অভাব থাকে তাহলে আমি ভীত ও হীনবল থাকব। হাঁ তা যদি আমার নিকট বিশেষ জায়গায় উনিশ পরিমাণও থাকে তাহলে আমি মার খাব না অন্যের নিকট মাথা নত করব না। তো যারা এখন ভোগবাদিতা ও বস্তুবাদিতার আঘাতে জর্জরিত এরা যখন নিজেদের ক্ষত প্রশমনের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট যায় এবং দেখে যে, উলামায়ে কেরামও আমাদের চেয়ে ভোগবাদিতা ও বিলাসিতায় কোন অংশে কম নয়, তখন তারা উলামায়ে কেরাম কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতি অনাস্থাশীল হয়ে ওঠে, তাদের অন্তরের কুধারণা আরও বৃদ্ধি পায়। অতএব এই দেশে ঐ জাতীয় আলেম গড়ে উঠুক, যারা হবেন—

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

এর উপর আমলকারী। হবেন নববী উত্তরাধিকারের বাহক—

ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم

‘নবীগণ দীনার ও দিরহাম (তথা টাকা-পয়সার) উত্তরাধিকার রেখে যান না বরং তারা রেখে যান ইলমের উত্তরাধিকার।’

বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ হল বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতা। এই চ্যালেঞ্জের জবাব হল ভোগবাদিতা ও বস্তুবাদিতার উর্ধ্বে অবস্থান। ভোগবাদিতার ভূমি থেকে উচ্ছে বিচরণ এবং এটা প্রমাণ করণ যে, অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাদেরকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না। এগুলো আমাদেরকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। আমরা অর্থ-সম্পদের গোলাম নই। আমি একথা বলছি না যে, আমরা হালাল বস্তুকেও নিজেদের জন্য হারাম ও অবৈধ জ্ঞান করব। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

‘বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?’ (সূরা আরাফ ৩২)

এবং বলেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

‘হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তা তোমার জন্য নিষিদ্ধ করছ কেন?’ (সূরা তাহরীম ১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আল্লাহ তাআলা এরূপ বলেছেন, তখন আমরা তো কোন ছার? আমরা হালাল বস্তুকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাব। আল্লাহর নেয়ামত রাজিকে সোৎসাহে কাজে লাগাব। আমরা যদি উন্নত ও উপাদেয় খাদ্য খেতে সক্ষম হই তবে অযথাই তাকে বিশ্বাদ বানিয়ে নেব না। যেমন অনেক অতি সুফীদের কথা শোনা যায় যে, তরকারীতে অতিরিক্ত পানি দিয়ে দিয়েছে, যাতে তা বিশ্বাদে পরিণত হয়। প্রতিবেশীদেরকে দেওয়ার জন্য নয় বরং তরকারীকে বিশ্বাদযুক্ত বানানোর জন্য অতিরিক্ত পানি ঢেলে দিয়েছে অথবা বেশি করে লবণ দিয়ে দিয়েছে, যাতে তরকারী বিশ্বাদযুক্ত হয়। এটা ইসলামের তাযকিয়া নয়। শরীয়ত এরূপ করতে উৎসাহিত করে না। আপনার যদি সুস্বাদু খাবার খাওয়ার সামর্থ্য থাকে, তবে অবশ্যই তা খাবেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন, প্রত্যেক লুকমায়, প্রত্যেক গ্রাসে শুকরিয়া আদায় করবেন। কিন্তু ‘আরো চাই’-এর লালসা- যা আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে, অর্থ-সম্পদের কোন পরিমাণই, ক্ষমতার কোন স্তরই তাদেরকে তৃপ্ত করতে পারছে না, সর্বদা ‘আরও চাই’-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; তা থেকে উলামায়ে কেরামকে মুক্ত থাকতে হবে। ঐরূপ মানসিকতা থেকে মুক্ত থেকে তাদেরকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে।

চাটাইতে উপবেশনকারী কিছু নির্মোহ ব্যক্তির প্রয়োজন

করাচী থেকে ইসলামাবাদ, ইসলামাবাদ থেকে এই ফয়সালাবাদ পর্যন্ত যে কথাটি আমি বলে আসছি তা হল, আজ পাকিস্তানকে রক্ষা করতে অন্য অনেক কিছুর মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজন যে উপকরণ ও উপাদানের, প্রয়োজন যে শক্তির তা হল উলামায়ে কেরামের দুনিয়াবিমুখ জীবন, অল্পে তুষ্ট জীবন, স্বকীয়তা ধারণকারী জীবন যাপন। উলামায়ে কেরামকে এরূপ জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে যাতে অনুমিত হয় যে, এঁরা বিশেষ কোন স্তরের লোক। এঁরা আশ্বিয়া কেরামের রেখে যাওয়া সম্পদের যথার্থ উত্তরাধিকারী। এঁরা তাঁদের উপযুক্ত প্রতিনিধি। এঁরা অর্থ-সম্পদ ও ভোগবাদিতায় নিবিষ্ট নয়, ভোগবাদিতার তরবারী এদেরকে হত্যা করতে পারেনি, টিকিটিও স্পর্শ করতে পারেনি। যাঁদের কাছে গেলে দুনিয়ার অসারতা স্পষ্ট হয়, কমপক্ষে এতটুকু উপলব্ধি হয় যে, অর্থ-সম্পদই জীবনের

সবকিছু নয়। যার প্রয়োজন সে আমাদের নিকট আসুক, আমরা কারও দরজায় ধর্না দিতে রাজি নই। যদি কারও দরজায় যাই তবে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাব। ‘আমর বিল মারুফ নাই আনিল মুনকার’ এর উদ্দেশ্যে যাব। কোন ফরয কিংবা কোন সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাব। নিজের স্বার্থসিদ্ধি কিংবা কারও পক্ষে সুপারিশ ও তদবিরের জন্য যাব না।

এই শূন্যতা কোন কিছুই পূরণ করতে পারবে না

পাকিস্তানের জন্য বিষয়টির প্রয়োজন খুবই তীব্র। এই শূন্যতাকে অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। রচনা, লেখনী, গবেষণা ও রাজনীতি, বয়ান ও বাগ্মিতা কোন কিছুই এই ঘাটতিকে পূরণ করতে পারছে না। এখানে কিছু এইরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন যাদের নিকট ক্ষমতাসীন, রাজনীতিবিদ সকলেই আসতে বাধ্য হবেন এবং নিজেদের অন্তর্বেদনার চিকিৎসা পাবেন এবং যাদের নিকট আসলে উপলব্ধি জন্মাবে যে, আল্লাহর খাস বান্দারা কী রকম হন। মানুষ যাদের নিকট আসলে এই উপলব্ধি নিয়ে ফিরে যাবে যে, তারা মানুষ পদবাচ্যের উপযুক্ত নয়।

আমি একবার বলেছিলাম যে, তাযকিয়া ও ইহসানের প্রয়োজন যদি আপনাদের নিকট বোধগম্য না হয় তাহলে তৎপরিবর্তে এরূপ কিছুর আমদানী করুন, যা তাযকিয়া ও ইহসানের বিকল্প হতে পারে। যার কারণে আপনার নিকট এসে মানুষের নিজের নিকৃষ্ট চরিত্রের উপলব্ধি হবে। নিজের মানবতার অবনতি এবং আত্মিক অসুস্থতার উপলব্ধি হবে। যার কারণে মানুষ আপনার নিকট এসে এক নতুন শক্তি, নতুন প্রাণ অর্জন করতে পারবে। আমি জনৈক আরবী কবির একটি কবিতা দ্বারা সে দিনের বয়ান শেষ করেছিলাম—

اقلوا عليهم لا ابا لابيكم

من اللوم وسدوا المكان الذى سدوا

ব্যস, অনেক তিরস্কার করা হয়েছে, তাদেরকে তোমরা অপমানিত করেছ, লাঞ্ছিত করেছ। এখন তিরস্কার কমিয়ে দাও। ঐ স্থান পূর্ণ কর যে স্থান তারা পূর্ণ করেছিল।

আপনারা যদি একটি আরোগ্য কেন্দ্র বন্ধ করে দেন তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন আরোগ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করুন। আরোগ্য কেন্দ্র ও শেফাখানা বন্ধ করে দিলেন অথচ তদস্থলে দ্বিতীয় কোন শেফাখানা খুলবেন না

তৎপরিবর্তে গ্রন্থাগার ও কুতুবখানা প্রতিষ্ঠিত করবেন তাতে তো কাজ হবে না। কুতুবখানা ও গ্রন্থাগার খুব জরুরী বিষয় কিন্তু তা শেফাখানার বিকল্প হতে পারে না। শেফাখানা ও ডাক্তারখানার বিকল্প শেফাখানা ও ডাক্তারখানাই হতে পারে। ডাক্তারের বিকল্প একমাত্র ডাক্তারই। বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগবাদিতা। এর সর্বোৎকৃষ্ট জবাব হল বিশুদ্ধ শরীয়ত, সুন্নাহ মোতাবেক আধ্যাত্মিকতা ও এমন তায়কিয়ায়ে নফস, যাতে শরীয়ত বিরোধী কিছু না থাকে। এ রকম কিছুর মিশ্রণ তাতে না থাকে যার নজীর কিতাব ও সুন্নাহ, নববী যুগ ও সাহাবী যুগে পাওয়া যায় না।

একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে এই রাস্তায় চলার তাওফীক দান করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

কঠিন চ্যালেঞ্জ ও সুদূরপ্রসারী কুফল সৃষ্টিকারী বিপদসমূহ

[তালিবুল ইলম ও উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এই ভাষণটি দান করেছিলেন। ভাষণে তিনি অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে তাঁদেরকে মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের ফেতনাসমূহের মোকাবেলা করতে ফেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি ভাষণে একথাও বলেছেন যে, এসব ফেতনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী পদ্ধতিতে সেগুলোর মোকাবেলা যুগের সর্বাপেক্ষা বড় দাবি। মাদরাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের প্রতি জোর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

সুধী!

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুরআন মাজীদে কি দ্বীনী মাদরাসার আলোচনা আছে? মাদরাসাসমূহের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য সে সম্পর্কে কি কোন দিক-নির্দেশনা আছে? তাহলে আমি বলব যে, আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে কিয়ামত পর্যন্ত মাদরাসাসমূহের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য তার পূর্ণ চিত্র অঙ্কণ করা হয়েছে। এই আয়াতে মাদরাসাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে যে, মুমিনদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে কিছু লোক

জ্ঞানানুশীলনের জন্য বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে নিজের দেশ ও জাতির নিকট ফিরে যেয়ে তাদেরকে স্ব-যুগের ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে, যাতে তাদের সম্প্রদায় ও জাতি সতর্ক হয়ে যায় এবং ঐ সকল ফেতনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে? (সূরা তাওবা ১২২)

(উল্লেখ্য অনুবাদটি আয়াতের ভাবানুবাদ। -অনুবাদক)

প্রকৃতপক্ষে মাদরাসাগুলোর কাজ এটাই। মাদরাসাগুলো এরূপ ব্যক্তিত্ব গড়বে যারা স্ব-স্ব যুগের ফেতনা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত থাকবে এবং সেগুলোর মোকাবেলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে।

ঐতিহাসিক ফেতনা

সুধী!

ইতিহাস চর্চাকারী হিসাবে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে অতি নিকট থেকে দেখার সুবাদে এবং অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাদের সামনে আরজ করছি যে, মুসলমানদের ইতিহাসে মুসলমানদের জন্য দুটি মহা ফেতনা ও বিপদের সৃষ্টি হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি খ্রিস্টানদের ক্রুসেড। যার লক্ষ্য শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করা ছিল না বরং হারামাইন শরীফাইন দখল করাও তাদের লক্ষ্য ছিল। যদি আল্লাহ তাআলা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে দাঁড় করিয়ে না দিতেন, তাহলে আল্লাহ না করুন আজ ইসলামী বিশ্বের অস্তিত্ব বলে কিছু থাকত না। গায়েবী ফায়সালায় তাঁর ন্যায় একজন মর্দে মুজাহিদ সৃষ্টি হলেন এরপর তিনি মুসলমানদের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে সুসংহত ও সুসংঘবদ্ধ করলেন এবং পূর্ণ শক্তি নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদেরকে এমনভাবে পরাস্ত করলেন যে, দ্বিতীয়বার ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে আক্রমণের সাহস আর কখনও তাদের হয়নি। তবে উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডারদের এই আক্রমণের পিছনে তাদের কোন দাওয়াত, কোন আন্দোলন কিংবা কোন দর্শন নিয়ামক হিসাবে কাজ করেনি। তাদের আক্রমণ ছিল শুধু আক্রমণের উদ্দেশ্যেই। ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যেই।

দ্বিতীয় ফেতনাটি ছিল তাতারী ফেতনা। তাতারীরা ছিল হিংস্র জাতি। তারা মুসলিম বিশ্বের উপর আক্রমণ করে তাগব চালিয়েছিল। গণহত্যার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে তছনছ করে দিয়েছিল। যদিও তাদের লক্ষ্যস্থল ছিল শুধু ইরাক, ইরান ও তুর্কিস্তান। এই দেশ তিনটিতেই তারা ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ চালিয়ে দেশ তিনটিকে তছনছ করে দিয়েছিল, তবু তাদের সম্পর্কে মানুষের অন্তরে এত প্রচণ্ড

ভীতি জন্মেছিল যে, তৎকালে এই কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল যে, তোমাদেরকে কেউ যদি বলে যে, তাতারীরা পরাস্ত হয়েছে তবে তা বিশ্বাস করো না। তদ্রূপ কোথায় ইরাক, ইরান আর কোথায় ইংল্যান্ডের সাগর পাড়। ঐতিহাসিকগণ লেখেন যে, তাতারীদের ভয়ে ইংল্যান্ডের সাগর পাড়ের জেলেরা বহু দিন পর্যন্ত মাছ শিকার করতে বের হয়নি। তাতারীদের সেই নৃশংসতার যুগে এই শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তাতারীদের এই আক্রমণ ছিল সেনা আক্রমণ, তাদের আক্রমণ অন্তর্কেন্দ্রিক ছিল। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল শুধু হত্যা। এই আক্রমণের সঙ্গে তাদের কোন আদর্শ বিস্তার লক্ষ্য ছিল না। তাদের আক্রমণের পিছনে কোন আদর্শিক লক্ষ্য কিংবা কোন আদর্শিক আন্দোলন বা দর্শন নিয়ামক হিসাবে কাজ করেনি। তাতারীরা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্যে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করেনি। যাহোক, অবশেষে মিসরের এক জেনারেলের হাতে তাতারীদের পতন হয় এবং আল্লাহর অসীম কুদরতে এই তাতারীরা সকলেই এক সময় ইসলাম গ্রহণ পূর্বক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

সুধী!

কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ ও যে ফেতনার উদ্ভব ঘটেছে তা প্রথমোক্ত ফেতনা দুটি অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক ও অধিক ভয়াবহ। বর্তমান যুগের ফেতনা ও চ্যালেঞ্জ ইসলামের জন্য, মুসলিম জাতির জন্য অতীতের ঐসব ফেতনা ও চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর, অধিক সর্ব বিনাশী ফল উৎপাদক।

বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী ও শাসক শ্রেণীর হৃদয় ও মস্তিষ্কে কুটিল রাজনীতি ও মিডিয়ার মাধ্যমে এই কথাটি বদ্ধমূল করে দেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করা হচ্ছে যে, বর্তমান যুগে ইসলামের কোন কার্যকারিতা নেই। বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে ইসলামের কোন বার্তা নেই। ইসলাম অতীতের স্মৃতিবহ মাত্র। আধুনিক যুগকে কিছু দেওয়ার যোগ্যতা ইসলামের মধ্যে নেই। অতএব আজ ইসলামের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে এক সময় ইসলাম সফল ছিল। ইসলাম কন্যা হত্যা বন্ধ করেছিল। জ্ঞানের বিস্তার লাভে ইসলাম বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এখন ইয়াহুদীবাদ ও খ্রিস্টবাদের ন্যায় ইসলামও এক প্রাণহীন মতবাদ মাত্র। ইসলাম বিরোধীতাতেই ইউরোপ ও আমেরিকা নিজেদের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে এবং বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত ইসরাঈলী ধ্যান-ধারণা, ইসরাঈলী ষড়যন্ত্র এবং আমেরিকান সাহায্য-সহযোগিতা ও সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে যে, কিভাবে সকল ইসলামী দেশ এমনকি হারামাইন

শরীফাইনও তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য শক্তিগুলো ইসলামী বিশ্বের শাসকবর্গকে এবং ইসলামী বিশ্বের আধুনিক শিক্ষিতদেরকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, বর্তমান যুগে ধর্মনিরপেক্ষতা ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ গ্রহণ ব্যতীত গতান্তর নাই। তারা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মধ্যেই তাদের উন্নতি ও সফলতা নিহিত। এটা এত ভয়াবহ এবং ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে এত গভীর ষড়যন্ত্র যে, এর ভয়াবহতা ও বিপজ্জনকতার কথা কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে। এর দূর পরিণাম ও ফল কল্পনা করলে রাতের ঘুম উড়ে যায়। সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম ও গণ-মাধ্যমের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও সমভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্য রয়েছে যে, এই ষড়যন্ত্রসমূহের কেন্দ্র হল ইসরাঈল। ইসরাঈল এর নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই মহা ফেতনার মোকাবেলা করতে পারে একমাত্র দ্বীনী মাদরাসাগুলোই।

সুধী!

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের দায়িত্ব শুধু কিতাব বুঝিয়ে দেওয়া এবং মাসআলা-মাসায়েল শিখিয়ে দেওয়াই নয়। অবশ্য আমরা এটাকে খাটো করে দেখছি না। শিক্ষাব্যবস্থার এই ধারাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বলতে চাচ্ছি যে, শুধু এতটুকু যথেষ্ট নয়। বর্তমান ফেতনা সম্পর্কে ধারণা রাখা, সম্যক রূপে ফেতনা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং শক্তিশালী ও কার্যকরী ভাষায় এবং আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে তার মোকাবেলা করা যুগের মৌলিক দাবি। আমাদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের উচিত আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা, যাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীকে তারা প্রভাবান্বিত করতে পারে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন ও গবেষণা ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং হালনাগাদ হতে হবে। আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নাদওয়াতুল উলামা যে সংগ্রাম ও যুদ্ধ করেছে, নাদওয়াতুল উলামার কৃতী সন্তানেরা যেভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি ও সামর্থ্য সহকারে শক্তিশালী ও কার্যকরী পদ্ধতিতে ঐ ফেতনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তা অদ্যাবধি আরব দেশসমূহে স্বীকৃত হয়ে আছে।

সুধী!

আপনারা বহু দূর থেকে এখানে আসার কষ্ট স্বীকার করেছেন। এতদূর থেকে এসে আপনারা কোন ভুল করেননি। আপনারা এমন কেন্দ্রে এসেছেন যে কেন্দ্রটি দ্বীনের খেদমতের একটি দিক সামাল দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে নদভী সন্তানেরা আরব দেশসমূহকে নিজেদের শক্তিশালী লেখনী দ্বারা প্রভাবান্বিত

করতে সক্ষম। তারা আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন তা বৃথা যায়নি। বর্তমানেও নাদওয়াতুল উলামা এরূপ যুদ্ধের ময়দানে দণ্ডায়মান, যা ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য জীবন মরণের সমাধানের ময়দান। বর্তমানে সমগ্র পাশ্চাত্য শক্তির একমাত্র চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র হল ইসলামকে কোণঠাসা করে রাখা। ইসলামকে অতীত স্মৃতিতে পরিণত করা। জীবনের সাথে ইসলামের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। বর্তমানে এই ফেতনার বিরুদ্ধে কৌশলগত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অতীব জরুরী। এই যুদ্ধ ইসলাম ও মুসলমানের জীবন-মরণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের জন্যই নাদওয়াতুল উলামা সদা প্রস্তুত। এর জন্য আমাদের সকলের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। এটাই এখানকার শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی اله وصحبه اجمعین

والسلام علیکم

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ এবং মাদরাসার

ছাত্র-শিক্ষকদের দায়িত্ব

[দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় আগত মাদরাসাসমূহের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এই ভাষণটি দান করেছিলেন।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

সুধী! বিভিন্ন মাদরাসার ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ- যাঁরা নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এবং দূর পথের কষ্ট স্বীকার করে এই মজলিসে এন্তেজামীতে অংশগ্রহণের জন্য তাশরীফ এনেছেন আমি অধম এবং আমার কর্মসঙ্গীগণ তাঁদের সকলকে স্বাগতম ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশের বিশিষ্ট ও নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের এই সমাবেশ দেখে আমি আপনাদের নিকট অনুমতি চাইছি ব্যবস্থাপনা বিষয়, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত-কাম্য শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের নির্দিষ্ট সীমার কিছুটা বাইরে সরে এসে কিছু বাস্তবতা ও পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করতে এবং আপনাদের মনোযোগ সে দিকে আকৃষ্ট করতে যে পরিস্থিতি ও বাস্তবতা শুধু দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর চৌহদ্দিতে নয় বরং সমগ্র দেশ ও জাতির সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যা সমগ্র দেশ ও জাতির উপর কু-প্রভাব বিস্তার করছে। কোন প্রতিষ্ঠান কি কোন আন্দোলন, কিংবা কোন সংগঠন ও ইউনিট কিংবা কোন সমাজ এমনকি দ্বীন ও মিল্লাতও সেই সকল পরিস্থিতি ও প্রভাব, শক্তি ও চ্যালেঞ্জের সামনে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না।

মিল্লাতে ইসলামের দৃঢ় ও সত্যপন্থী আলেমগণের

কীর্তি ও কর্ম

সুধী! আমাদের পূর্বসূরী আলেমগণ দ্বীনী শিক্ষার যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে স্ব-স্ব যুগে এবং স্ব-স্ব স্থানে ইসলামের দূর্গ ছিল। হাঁ সেগুলোকে দূর্গ হিসাবে আখ্যায়িত করাই সমীচীন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন, আল্লাহর তাওফীক প্রাপ্ত সে সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতাগণ (যাঁদের মধ্যে তালিকার শীর্ষে অবস্থানকারী ও অধিক উজ্জ্বলতর হলেন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী ও মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী [রহ.]।) নিজেদের ভবিষ্যত-দৃষ্টি, ঈমানী বিচক্ষণতা, গভীর জ্ঞান ও গভীর পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও খোদাপ্রদত্ত পরিণামদর্শিতার যোগ্যতা দ্বারা নিজের দেশ শুধু নয় বরং বহির্দেশের ও চলমান যুগের এবং ইতিহাসের যথার্থ বাস্তবতা পরখ করে নিয়েছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, শুধু শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন নয়, বরং কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কুপ্রভাব থেকে জাতির নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে, তাদেরকে চিন্তাগত ও বিশ্বাসগত ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে, দীন ও ঈমান বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে এমনকি দ্বীনের সঙ্গে নিজের সামান্য সম্পৃক্ততাকে লজ্জাক্ষর বলে মনে করা থেকে ও দ্বীনের সম্পৃক্ততাজনিত হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করতে এরূপ কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজন যেখানে এলে সৃষ্টি হবে দ্বীনের গভীর জ্ঞান, ঈমানী দৃঢ়তা, জ্ঞান ও ঈমানে গর্ববোধ ও শোকরের মেজায়, শুধু তাই নয়, বরং যেখানে এলে সৃষ্টি হবে দ্বীন ও ঈমানের প্রচার-প্রসার, দাওয়াত ও তাবলীগের আবেগময় মেজায়। যে কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃষ্টি হবে দ্বীন ও শরীয়ত মোতাবেক চলার দৃঢ় মানসিকতার, সৃষ্টি হবে দ্বিনী স্বকীয়তা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য গর্ব ও কৃতজ্ঞতাবোধ। যারা দ্বীনের একবিন্দুও ছাড় দিতে কখনও প্রস্তুত হবে না।

কোন রকম অন্ধ গোষ্ঠীপ্রীতি থেকে বলছি না, বরং এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, তাঁরা তাঁদের এই দায়িত্ব সফলতার সাথে আজাম দিয়েছেন এবং তাদেরই কারণে আজ অবধি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধর্মীয় স্বকীয়তা, চিন্তা, বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস সুরক্ষিত আছে, দ্বীনের ফরজ-ওয়াজিবসমূহ জীবন্ত রয়েছে। মসজিদসমূহ আবাদ রয়েছে এবং তাদের কারণেই ইসলামের কেন্দ্র জাযিরাতুল আরব ও পবিত্র হেজাজ ভূমির সাথে হজ্জ ও উমরার মাধ্যমে, ভালবাসা ও অনুরাগের মাধ্যমে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ও দ্বিনী উলূমের মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রয়েছে।

ঐ সকল দ্বিনী নেতৃবর্গ, আত্ম-সচেতন মুসলমান, আলেম ও দ্বিনী পথপ্রদর্শকগণ নিজেদের ঐ দ্বিনী প্রেরণা, জাতি-সচেতনতা, দ্বিনী বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতাকে ভারত উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তাঁরা তাঁদের ঐ গুণাবলীকে গোটা মুসলিম বিশ্বে কাজে লাগিয়েছেন। আর সেই পর্যায়ে খেলাফত

আন্দোলন, তুরস্কে সহায়তাদান এবং জাযিরাতুল আরবের পবিত্রতা রক্ষা পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টা, আগ্রহ এবং কর্মতৎপরতা থেমে থাকেনি। এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ এতদসংক্রান্ত ইতিহাসের অনেক কিছুই সংরক্ষিত আছে। এখানে উপস্থিত সুধীগণের অনেকেই সেসব ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী। আর অনেকেই সেসব ইতিহাস একাধিক সূত্রে, একাধিক মুখে শুনে থাকবেন।

হকানী উলামায়ে কেরামের কীর্তিগাথা

কিন্তু একথা হয়তো অনেকের মাথায় নেই যে, ভারতের আলেমসমাজ ও মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্তগণ তাঁদের ইলম ও জ্ঞান, চিন্তা ও বুদ্ধি, লেখনী ও যুক্তি দ্বারা ভারতে তো বটেই ভারতের বাইরেও খ্রিস্টবাদের প্রচারণামূলক আক্রমণকে রুখে দিয়েছেন। খ্রিস্টানদের রচিত মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী লিটারেচারসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তাঁদের এই কর্ম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে এবং ইলম ও দ্বীনের কেন্দ্র দেশগুলো- যেখানে শতাব্দী প্রাচীন ও বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী লেখার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে- তাঁদের এই কর্মতৎপরতার সুফল স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা ঐ সকল বিরল ও বিশ্বয়কর লেখনীর কথা উল্লেখ করছি না যা ভারতের ইসলামী যুগে লিখিত হয়েছিল এবং আরবের জ্ঞানী-গুণীজন ও শাস্ত্রীয় ইমামগণ পর্যন্ত যেগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও নজীরহীনতার স্বীকৃতি দান করেছেন।

মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবীর অবদান

তন্মধ্যে হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) [মৃত্যু ১৮৯১ ঈসায়ী ১৩০৮ হিজরী] এর লিখিত অনবদ্য কিতাব 'ইজহারে হক'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই কিতাবে তিনি গণিতের ফলাফলের ন্যায় (যেমন দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, চারে চারে আটই হয়) অকাট্যভাবে বর্তমান বাইবেলের বর্ণনাদিতে স্ব-বিরোধিতা ও পারস্পরিক সাংঘর্ষিকতা প্রমাণ করেছেন। তার এই কিতাবের জবাব আজ পর্যন্ত খ্রিস্টান জগত ও গীর্জার পাদ্রী পুরোহিতরা দিতে পারেনি। আমি নিজে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় লেখা দেখেছি যে, যত দিন পর্যন্ত এই কিতাবের প্রকাশনা ও প্রচার কার্য চালু থাকবে, তত দিন খ্রিস্টবাদের প্রচার কার্য সফল হতে পারবে না।

দ্বিতীয় কীর্তি হযরত মাওলানা শিবলী নুমানী (রহ.)-এর। মিসরের প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান আলেম, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক 'তারীখুত তামাদুনিল ইসলামী' নামে

একটি কিতাব লিখে প্রকাশ করেছিল। লেখক এই কিতাবে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুনিপুণভাবে তীব্র আক্রমণ করেছিল। কিতাবটি পড়লে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে পাঠকের মস্তিষ্কে অনিবার্যভাবে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হত। জীবনের এক উত্তম আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা ইসলামের মধ্যে অনুপস্থিত বলে ধারণা হত। মাওলানা শিবলী নুমানী মরহুম এই কিতাবের উপযুক্ত ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে যেয়ে লিখলেন—

الانتقاد على التاريخ التمدن الاسلامى

আরবের উলামা সমাজ এমনকি আল্লামা সাইয়েদ রশীদ রেজা মরহুম কিতাবটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এরূপ একটি কিতাব লেখার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

এইসব প্রতিরোধ ও জবাবমূলক লেখনী প্রচেষ্টা ছাড়াও ভারতের আলেম ও গবেষকগণের আরও কিছু লেখনী ও রচনামূলক কীর্তি রয়েছে, আরও কিছু গবেষণামূলক ও তুলনাধর্মী রচনা রয়েছে। আরব দেশসমূহেও যার দৃষ্টান্ত মেলা কঠিন। এখানে আমরা কয়েকটি লেখনী ও কিতাবের নাম উল্লেখ করছি।

মাওলানা শিবলী প্রণীত *الحزبة فى الاسلام* (ইসলামে কব ব্যবস্থা), মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর খুতবাতে মাদ্রাজ ও আরদুল কুরআন (*ارض القرآن*), মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর ইংরেজী ও উর্দু অনুবাদ ও তাফসীর। তাফসীরটিতে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার আলোকে কুরআনের অসাধারণত্ব এবং অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ অপেক্ষা কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর আরও একটি কিতাব আছে ‘মুশকিলাতুল কুরআন’ (*مشكلات القرآن*)। মাওলানা আবদুল বারী নদভী প্রণীত ‘মাহযাব ও আকীদাত’ ইত্যাদি।

আমাদের সামনে এই সত্যটি থাকা উচিত যে, ভারতের আলেম সমাজ কখনও ইসলামী বিশ্বের দেশসমূহের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখেননি। সেখানে উদ্ভূত ফেতনা, সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড এবং ধর্মহীনতা, আরব জাতীয়তাবাদের ন্যায় ভয়াবহ পরিণাম সৃষ্টিকারী ইসলামবিরোধী প্রচার-প্রচারণা ও দাওয়াতের ব্যাপারে কখনও উদাসীন থাকেননি। এই পর্যায়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার কৃতি সন্তান ও এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমগণ ঐ সকল বর্হিদেশীয় ফেতনাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঐ সকল ফেতনা ছিল ইসলামের কেন্দ্রভূমি আরব বিশ্বে সন্দেহ ও সংশয় ও

দোদুল্যমানতা সৃষ্টিকারী, খ্রিষ্টবাদ, ইয়াহুদীবাদ ও ধর্মহীনতার পথ উন্মুক্তকারী। এক্ষেত্রে নদওয়া থেকে প্রকাশিত البعث الاسلامى এবং الرائد পত্রিকা দুইটির ভূমিকা উল্লেখ না করলেই নয়। পত্রিকা দুটি দ্বারা সুস্থ প্রকৃতির অধিকারী ও ইসলাম অনুরাগী আরবীয় ব্যক্তিবর্গ অতিশয় প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এছাড়াও মুহাম্মাদ আল হাসানীর রাসায়েল ও কিতাবাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কোন কোন কিতাব পাঠ করে আরব বিশ্বের আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে অশ্রু প্রবাহিত করতে দেখেছি। এই লক্ষ্যেই ১৯৯৫ ইস্যবী সনের মে মাসে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায় গবেষণা পরিষদ ও ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিভাগটি আরবী, উর্দু, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় ইসলামী সাহিত্য পত্র বের করেছে, যা অত্যন্ত কার্যকর এবং অমুসলিমদের মধ্যেও ইসলামের মর্যাদা, সম্মান ও মূল্য প্রতিষ্ঠাকারী রূপে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি আমি এসব দাওয়াতমূলক রিসালা, ভাষণসমূহের সংকলনের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখলাম, সেগুলোর সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের এইসব বিবরণ এবং মাদরাসাসমূহের উলামা-ফুযালার ব্যাপক দায়িত্ব পালন এবং সংগ্রামের আলোকে ও প্রেক্ষাপটে এখন মাদরাসার কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গের খেদমতে কতিপয় ধর্মহীনতা ও ধর্মচ্যুতিমূলক প্রচেষ্টার উল্লেখ করছি। ইসলামী দেশসমূহকে, বিশেষত আরব দেশসমূহকে ইসলামী চেতনা ও মর্যাদাবোধ শূন্য করতে এবং ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততাকে অস্বীকার করাতে, ইসলামকে তাদের হাতে লাঞ্চিত ও অপমানিত করাতে পশ্চিমা দেশসমূহে যে প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল।

বাস্তবতা হল— ইয়াহুদী কূটকৌশল ও ধূর্ততা এবং খ্রিষ্টান জগতের ক্ষমতা ও সামরিক শক্তি ইসলামকে মূলোৎপাটিত করতে, চিরদিনের জন্য ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এক সূত্রে প্রোথিত হয়েছে।

ইয়াহুদী পরিকল্পনা

বহু শত বৎসর যাবৎ ইয়াহুদীদের পরিকল্পনা হল গোটা বিশ্বকে দাবার কোট বানানো। যে দাবার কোটটিও থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। যে গুটিকে যেখানে চলতে চাইবে সেখানেই চলতে তারা সক্ষম হবে এইরূপ কোট। এই লক্ষ্য অর্জন করতে তারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর হতে এবং মানবতাকে পদদলন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

আর খ্রিষ্টান জগত ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইয়াহুদীদের সঙ্গে যৌথভাবে ঐ লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালন করছে। এখানে একজন আমেরিকান পণ্ডিত হ্যামুয়েল জ্যুয়েমার এর ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি। খ্রিষ্টবাদ প্রচারকদের একটি সম্মেলনে তিনি এই ভাষণ দিয়েছিলেন।

‘প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে আমাদের কর্মতৎপরতার লক্ষ্য হবে মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম। যারা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সক্ষম হবে। যাতে মুসলমানেরা নিজেদের পরিস্থিতি সামাল দিতেই ব্যস্ত থাকে, আর আমাদের প্রচেষ্টা তাদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও টুকরো-টুকরো করে দেয়। ইসলামী দেশসমূহকে আমাদের এই নির্দিষ্ট কর্মতৎপরতাকে অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ এই নতুন প্রজন্মের অন্তরে যদি ইসলাম-প্রীতি ও ইসলামের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে ইসলাম পুনরায় তার নতুন যৌবন ফিরে পাবে। অতএব এমতাবস্থায় জরুরী হল মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে তাদের বিশ্বাস ও চেতনা বিন্দু থেকে বিচ্যুত ও সম্পর্কচ্ছিন্ন করে বহু দূরে নিয়ে যাওয়া এবং এটা করতে হবে তাদের চেতনা ও বিশ্বাসগত উৎকর্ষ পূর্ণতায় পৌছার পূর্বেই।’

সুধী!

ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের যৌথ এই প্রচেষ্টার ফল ইতোমধ্যে উন্নত আরব দেশগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। চাক্ষুষ দৃষ্ট হচ্ছে। তাদের এই প্রচেষ্টার প্রাথমিক ফল এই হয়েছে যে, দ্বীনী মর্যাদাবোধ এবং ইসলামের উপর গর্ববোধ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের মাঝে দুর্বল ও বিরল হতে চলেছে এবং ক্ষমতাসীন ও শাসকবর্গের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ধর্মহীনতা, অবিশ্বাস, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা ও শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষা তো অনেক দূরের বিষয়, ঐ সকল বিষয়ের প্রতি আরব দেশগুলোতে তো বর্তমানে সামান্য ঘৃণার ও বীতশ্রদ্ধ মনোভাবও আর অবশিষ্ট নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য শক্তির নিগড় হতে মুক্ত হবার কোন চেষ্টা ও প্রচেষ্টাও আর তাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। আরব দেশসমূহের শাসকবর্গ তথাকথিত স্বাধীনতা ও ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ কুরআন মাজীদের কি অসাধারণ দৃষ্টি যে, তার প্রথম সূরাতেই— যে সূরাটি প্রতিটি নামাযে প্রতি রাকাতে পঠিত হয় তথা সূরা ফাতেহায়— ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতির কথা এক সাথে উল্লেখ করে তাদের থেকে আত্মরক্ষার দুআ করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাদের পথ আমাদেরকে প্রদর্শন কর যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ— ওদের পথ নয়, যারা ক্রোধ আপতিত এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

কোন কোন আরব দেশে (যার মধ্যে তিউনিস ও আল-জাযায়েরের নাম অগ্রে উল্লেখযোগ্য) দ্বীন ও আহলে দ্বীনের বিরুদ্ধে এরূপ কার্য তৎপরতা দেখেছি এবং অনান্য উন্নত আরব দেশসমূহে শাসক শ্রেণী ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দর্শন করেছি এবং তাদের এরূপ কথাবার্তা শুনেছি, যার ফলে ললাট ঘর্মাক্ত হয়েছে, চোখে পানি এসে গেছে। সম্প্রতি দারুল উলূমের একজন শিক্ষক আমার প্রতিনিধি হয়ে রাবেতায় জামেয়াতুল ইসলামিয়ার একটি শিক্ষা সমাবেশে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি তাঁর সফরের যে বিবরণী পেশ করেছেন তাতে যে কেউ, বিশেষত যিনি মিসরের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কিংবা মিসর সফর করেছেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থান করেছেন বিষণ্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে পারবেন না।

কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, সেখানে এবং অন্যান্য আরব দেশে আশাব্যঞ্জক কার্যাবলীও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। ঐসব দেশে বর্তমানে ইসলামী ও দাওয়াতমূলক পুস্তকাদির কদর বেড়েছে। নবী কাহিনী সম্বলিত পুস্তকাদি বিভিন্ন বাড়িতে পঠন-পাঠনের হার তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং হতাশাগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। তবে দাওয়াতী কার্যক্রম আরও জোরদার করার প্রয়োজন। প্রয়োজন চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টা। প্রয়োজন ইসলামের চিরন্তনতা, ইসলামের সর্বকালীন উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গবেষণামূলক দাওয়াতী সাময়িকী ও সাহিত্য সৃষ্টি ও তার প্রচার-প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ।

আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত জরুরী

লজ্জাকর ও হৃদয়বিদারক এই দূরাবস্থার বর্ণনা এত বিশদভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেছি এই জন্য যে, আপনারা মাদরাসার পরিচালকবৃন্দ ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন। আপনাদের এই বিষয়ে ধৈর্য সহকারে চিন্তা-ভাবনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মাদরাসাসমূহে আরবী ভাষা শিক্ষাদানের মানকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন; যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সমাপন শেষে আরব দেশসমূহে এবং উন্নত মুসলিম দেশসমূহে বয়ান ও

লেখনী দ্বারা দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে যথাযথভাবে সক্ষম হয়। তারা যেন তাদের ভাষা দক্ষতা ও দাওয়াতী দক্ষতা দ্বারা আরবের যুবক শ্রেণীকে, শিক্ষিত ও লেখক ও সাহিত্যিক শ্রেণীকে এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়। কারণ অনাকাজ্জিত ও অপ্রিয় এসব ইসলাম বিরোধী কু-প্রভাব উপসাগরীয় অঞ্চল- কুয়েত, বাহরাইন এমনকি সউদী আরবেও অনুপ্রবেশ করেছে।

দ্বিতীয় যে ফেতনার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হতে হবে এবং প্রস্তুত থাকতে হবে তাহল হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। স্বল্প ভাষায় বললে, যে আন্দোলনের লক্ষ্য হল এই দেশকে স্পেনে পরিণত করা। যেখানে মুসলমান শুধু বংশগতভাবে মুসলমান হিসেবে পরিচিত থাকবে। কিন্তু তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাপন প্রণালীকে, সম্ভব হলে তাদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে আমূল পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে। এমনকি মুসলমানেরা এক পর্যায়ে হিন্দু পুরান তত্ত্বকে গ্রহণ করে নেবে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পাঠ্যসূচি, প্রচার মাধ্যম ও রাজনৈতিক প্রভাবকে ইতোমধ্যে কাজে লাগানো শুরু হয়েছে। এর ফলও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

প্রথমে মুসলিম পার্সোনাল 'ল'তে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হয়েছিল। আদালতে কিছু কিছু ফায়সালা প্রদান করা হয়েছিল এরূপ যা শরীয়তের বিপরীত এবং শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু আমীরে শরীয়ত (বিহার) হযরত মাওলানা সাইয়েদ মিন্নাতুল্লাহ (রহ.) মুসলিম পার্সোনাল 'ল' বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে এবং সমগ্র ভারত জুড়ে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়ে ঐ ফেতনার দরজা সাময়িকভাবে হলেও বন্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। কিন্তু সম্প্রতি ইউনিফর্ম সোল কোড-এর ধুঁয়া তোলা হয়েছে। আল্লাহর শুকরিয়া, ভারতের মুসলিম জনগণ সম্মিলিতভাবে এর বিরোধিতা করেছে। আশা করি তা কার্যকর হবে না।

এইসব বাস্তবতা, ঘটনাবলী, শঙ্কা ও ফেতনাসমূহকে সামনে রেখে আমি অবশেষে আরজ করছি যে, আমাদের মাদরাসা শিক্ষার্থীদেরকে এই সকল ফেতনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং এগুলোর মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে জ্ঞানগতভাবে ও মানসিকভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা খুবই জরুরী।

وما النصر الا من عند الله

ইসলামী বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট

[মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ১৯৯৫ ঈসায়ী সনের ১৬ জুলাই দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার ছাত্র সংগঠন আঞ্জুমানে তালাবায়ে দারুল উলূমের আহ্বানে জামালিয়া হলে এই ভাষণটি প্রদান করেছিলেন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন আলেম, গবেষক এবং আধুনিক শিক্ষিতদের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ। চিন্তা জাগানিয়া এই ভাষণটিতে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعْوَتِهِمْ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَىٰ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

আমার সম্মানিত বন্ধুবর্গ, অতিথিবৃন্দ এবং প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আমি বর্তমানে শারীরিক কিছু সমস্যা, মানসিক ব্যস্ততা এবং কিছু অন্যান্য সমস্যায় নিপতিত থাকার কারণে এই মজলিসে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে ওজর পেশ করে বলতে পারতাম এটা তো আমার নিজের ঘর, অতএব অন্য কোন সময় কথা বলব। কিন্তু আমি যেহেতু পূর্বেই ওয়াদা করেছিলাম এবং আলোচ্য বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এইজন্য চলে এসেছি। আমি আপনাদের সামনে কোন রাখঢাক না রেখে খোলাখুলি কিছু বলতে চাচ্ছি। আমার সামনে যুবক শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ উপবিষ্ট আছে। আপনারা জানেন, আমার সমশ্রেণীর, আমার পরিবেশের এবং আশেপাশের লোকজনের মধ্য থেকে খুব কম লোকই ঐ সৌভাগ্য লাভ করেছে, যা আমি অধম লাভ করেছি। আর তা হল বিশ্ব ভ্রমণের বিশেষত মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণের

সৌভাগ্য। মরক্কো ভ্রমণ করেছি। যে দেশ অতীতে ইসলামী সভ্যতার বিশাল এক কেন্দ্র ছিল সেই স্পেনও ভ্রমণ করেছি। স্পেন থেকে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেও আমার ভ্রমণ হয়েছে। আরব দেশসমূহের কোন গুরুত্বপূর্ণ দেশই আমার সফরের বাইরে থাকেনি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইউরোপ সফরের সকল উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইউরোপ সফর এবং ইউরোপকে খুব কাছ থেকে দেখার এবং সেখানে বার বার যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানী, তুরস্ক এবং সুইজারল্যান্ডেও গিয়েছি। অবশেষে রাশিয়া সফরেরও সুযোগ হয়েছে। আরব ও ইসলামী দেশসমূহের শুধু সফরই নয়; বরং সেসব দেশে কিছুদিন, কোথাও কোথাও কয়েক মাস অবস্থানের সুযোগ হয়েছে। সফর ও অবস্থানের কারণে সেখানকার জীবনযাত্রার প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার সুযোগ হয়েছে এবং সর্ব শ্রেণী ও সর্ব পেশার মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। তাদের মধ্যে বড় বড় বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, লেখক ও গবেষক, সাংবাদিক ও দেশের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। বিশেষত মিসরে আমি কয়েক মাস থেকেছি। এই সেই মিসর যা এক সময় আরব দেশসমূহের বিলেত বলে গণ্য হত। হিন্দুস্তানে যখন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আফগানিস্তান ও ইরানকে বিলেত বলা হত। ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েমের পর ইংল্যান্ডকে বলা হত বিলেত। তো এই মিসর আরব দেশসমূহের জন্য বিলেত তথা পথপ্রদর্শক, শিক্ষক, চিন্তাশীল মুরব্বীরূপে গণ্য হত। মিসরে কয়েক সপ্তাহ নয় কয়েক মাস অবস্থানের সুযোগ আমার হয়েছে।

আমি আপনাদেরকে বলছি, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সর্বাধিক নাজুক সমস্যা যা মুসলিম বিশ্বকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছে, মুসলিম বিশ্বকে দ্বিধা ও সংশয় এমনকি কুফরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে সঙ্কট সর্বাধিক মনোযোগ নিবন্ধের দাবি রাখে তা হল ইসলামী বিশ্বের আদর্শিক নেতৃত্ব, চিন্তা ও চেতনাগত নেতৃত্ব, সাহিত্য ও লেখনী নেতৃত্ব, অবশেষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এমন এক শ্রেণীর হাতে চলে গেছে, যারা ইসলামের চিরন্তনতা ও সর্বকালীনতার অস্বীকারকারী। এরা ইসলাম সম্পর্কে হীনমন্যতারই শিকার শুধু নয় বরং তারা হতাশাগ্রস্ত। তাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তাদের ধারণা একটি দর্শন ও আন্দোলন, একটি দাওয়াতের রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, বর্তমান যুগে, এই আধুনিক ও উন্নত যুগে ইসলাম নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা রাখে না। ইসলাম এক প্রাচীন আদর্শ, যা এককালে উপযোগী ও কার্যকর ছিল কিন্তু এখন তা অচল। তাদের ভাষায় ‘দ্বীনদার শ্রেণী কর্তৃক শরয়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের

জোরালো দাবি এবং তাদের কর্তৃক আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর সমালোচনা, তাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখা নিতান্তই গৌড়ামী ও অন্ধ রক্ষণশীলতা ছাড়া আর কিছু নয়।' তাদের ভাষায়- 'বাস্তবতা হল ইসলাম এখন প্রাণহীন এক মতবাদ। ইসলামের ইতিহাস যারা পাঠ করেছেন তাঁদের নিকট এটা এক স্পষ্ট সত্য যে, ইসলামের আবির্ভাব যে যুগে ঘটেছিল সেই যুগের পৃথিবী ছিল অতিমাত্রায় পশ্চাদপদ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে যুগকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে, জাহেলিয়াতের যুগ এবং যথার্থই বলা হয়েছে। ঐ যুগের জন্য এতদপেক্ষা যথার্থ শব্দ আর কিছুই হতে পারে না। তো জাহেলী যুগে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তখন তা কল্যাণকর সব কাজ করেছিল। ইসলাম তখন মানবতার উৎকর্ষ সাধন করেছিল। মানবতাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করেছিল। কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবরস্থ করার রীতি থেকে, জাহেলী সব রীতি থেকে সমাজকে রক্ষা করেছিল। ইসলাম তখন নারীদেরকে কিছু অধিকার দান করেছিল। ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের শিক্ষাদান করেছিল। কিছু উন্নত চরিত্রের শিক্ষাদান করেছিল। তাওহীদের পয়গাম এনেছিল। মানুষকে তাওহীদে বিশ্বাসী বানিয়েছিল। ইসলামের যতটুকু করার ছিল তা করে শেষ করেছে এবং যা করেছে তা ইতিহাসের দৃষ্টিতে এবং সত্যপ্রিয়দের দৃষ্টিতে অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির দাবিদার। কিন্তু এই উন্নত যুগে- যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, রাজনীতি, বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, সেই সঙ্গে মানুষের মেধা ও যন্ত্রপাতি মানুষকে নবতর বিশ্বাসে উন্নীত করছে তখন- নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার এবং এই উন্নত যুগের পথ প্রদর্শনের কোন অধিকার ইসলামের নেই।' এই হল বর্তমান যুগের শিক্ষিত শ্রেণী ও শাসক শ্রেণীর ধারণা ও বিশ্বাস এবং বলতে গেলে তাদের দাবি।

আমি আপনাদের সামনে বলছি যে, এটা অপ্রকাশ্য কোন বিষয় নয় বরং প্রায় সর্বজনবিদিত প্রকাশ্য বিষয় যে, বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব ঐ সকল মুসলমানের হতে চলে গেছে যারা ইসলামের ভবিষ্যত প্রশ্নে হতাশ এবং ইসলামকে যারা বর্তমান যুগের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে যোগ্য বলে বিবেচনা করতে নারাজ। তারা ইউরোপের জাগতিক উন্নতি, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইউরোপীয় লেখকদের গ্রন্থাদি, তাদের লেখনী ও গবেষণা দ্বারা এবং প্রচার মাধ্যমগুলো দ্বারা এতটাই প্রভাবান্বিত, যেন মনে হয় যে, তারা এগুলোর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের সেই ঈমানে কোন সংশয় নেই। এগুলোর প্রতি তাদের ঈমান ও বিশ্বাস অটল ও অবিচল।

ইউরোপ যখন প্রাচ্যে নিজেদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল এবং বিভিন্ন দেশ জয় করতে লাগল তখন তাদের বুদ্ধিজীবী ও নীতি নির্ধারকরা বিজিত দেশগুলোতে এরূপ কিছু লোক তৈরি করাকে জরুরী মনে করল, যারা তাদের অগ্রবাহিনীরূপে কাজ করবে। যারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, যারা সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম, সমাজের মন-মানসকে যারা নিজেদের মত গড়ে দুলতে সক্ষম। বিজিত দেশের এইরূপ বুদ্ধিজীবী (Intellectual class) শ্রেণী যেন নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে, দ্বীনের উৎস সম্পর্কে সন্দেহের শিকার হয়ে যায়, তারা যেন নিজেদেরকে পশ্চাদপদ বলে মনে করতে থাকে, নিজেদের সম্পর্কে হীনমন্যতার শিকার হয়ে যায়— এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করাকে জয়ী দেশগুলোর নীতি নির্ধারকরা আবশ্যিক ও অত্যন্ত জরুরী বলে সাব্যস্ত করল। আর এর জন্য তারা সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের এই লক্ষ্য পূরণে তারা নানা রকম কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল। আমাদের অনেকেই তাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের সেই প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। তারা যা করেছে তা নিছক দৈব কোন ঘটনা নয়। বরং তা তারা করেছে একটা স্কীমের আওতায়, সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মাফিক। অত্যন্ত সুচতুর পরিকল্পনা, দৃঢ় পরিকল্পনা মাফিক। একদিকে তো তাদের সেনাবাহিনী পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং দেশ জয় করছিল, অপর দিকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐ পরিকল্পনাও তারা বাস্তবায়ন করছিল। কারণ তারা খুব ভালভাবেই জানত যে, দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করা না যায়, তবে নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখা কঠিন হবে। সামরিক বিজয়ের উপর ততদিন আস্থাশীল হওয়া যায় না যতদিন না বিজিত দেশের জনগণের চিন্তা-চেতনাকে পরাভূত করা যায়। মানুষের যে বিবেক ও বুদ্ধি কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্য করতে সক্ষম, কোনটা মর্যাদাকর, কোনটা অপমানকর, কোনটা প্রাচীন, কোনটা আধুনিক, কোনটা করণীয় এবং কোনটা বর্জনীয় ইত্যাদি বিচারের যে যোগ্যতা মানুষের রয়েছে যতদিন তা বিজয়ীদের চিন্তা-চেতনা ও বিবেক-বুদ্ধির অনুগত ও সমর্থক না হবে ততদিন কোন সামরিক বিজয় পূর্ণ সফল হতে পারে না। তারা প্রাচ্যবিদ ও নিজেদের হাতে গড়া লেখকদের মাধ্যমে এমন পুস্তকাদি লিখিয়েছে যা পাঠ করলে মুসলিম জনসাধারণের অন্তরে ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে, ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে, কুরআন মাজীদেবর অসাধারণত্ব সম্পর্কে, কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম এবং ইলাহী ওহী -এ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতে বাধ্য। কমপক্ষে তাদের মধ্যে দ্বীন ও কুরআনের সাথে নিজের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে লজ্জাবোধ ও সঙ্কোচ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

অতএব, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য যেটা মৌলিক সমস্যা, যে সমস্যা অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে, আমি ক্ষমা চেয়ে বলছি, যে সমস্যার বিপজ্জনকতা ও ভয়াবহতা আমাদের দ্বীনী ও দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান এবং দ্বীনী আন্দোলন ও কর্মসূচীগুলোও যথাযথ উপলব্ধি করছে না, যে সমস্যাটি জনগণের ইরতিদাদ ও দ্বীন ত্যাগের মহা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হল উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্ব ঐ শ্রেণীর হাতে চলে যাওয়া, যারা ইসলামের নেতৃত্ব-যোগ্যতা সম্পর্কে হতাশ বরং বিরূপ ধারণা পোষণ করে। যারা মনে করে, ইসলাম আধুনিক যুগের সমস্যা সমাধানে যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। যারা বিশ্বাস করে যে, যে নেতৃত্ব ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তিশীল এবং যে নেতৃত্ব ইসলামী বিধি-বিধান ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে এবং যে নেতৃত্ব ইসলামী চেতনা ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই নেতৃত্ব এই যুগে অচল।

পৃষ্ঠপোষক শক্তি

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসরাঈল ও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা। এত দিন আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা ও তাদের হীনমন্যতা ছিল সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে আমেরিকা ও ইসরাঈল নামক রাষ্ট্র দুটির শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকতা। এটা সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট। আমি আরব দেশের বিভিন্ন সমাবেশে, বিশেষত রাবেতায় আলমে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহে স্পষ্ট করে বলেছি যে, বর্তমান যুগে ইসলামী বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় সঙ্কট হল আমেরিকা ও ইসরাঈলের ইসলাম-বিরোধী ঐক্য। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের দিক থেকে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ অত্যন্ত প্রকট। কারণ এক দেশ তো হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে আর অপর দেশ তাঁর জন্ম ও জাতকেই অবৈধ বলে প্রচার করে। কিন্তু উভয় দেশ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনায় ঐক্যবদ্ধ। কারণ ইসলাম পৃথিবীর নতুন প্রজন্মকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপেও ইসলামের প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়ছে এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিচ্ছে। দিন দিন ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অতএব যে প্রকারেই হোক ইসলামকে খতম করতে হবে।

ইহুদীদের বিশ্বাস- বর্তমানে পাশ্চাত্য শক্তির জন্য একমাত্র হুমকি মুসলমানদের নব উত্থান, ইসলাম ও মুসলমানদের নব জাগরণ। তাদের পত্র-পত্রিকাগুলো আমি সরাসরি পাঠ করেছি। ঐ সকল পত্র-পত্রিকায় স্পষ্ট বলা

হয়েছে যে, পৃথিবীকে চারিত্রিক দিক থেকে চরম অধঃপতনে নিপতিত করতে হবে, চারিত্রিকভাবে দেউলিয়া করে দিতে হবে। নভেল, উপন্যাস, সিনেমা, নাটক, টেলিভিশন ও গান-বাদ্যের মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলীকে, মানুষের চরিত্র ও ক্যারেক্টরকে এবং আল্লাহ প্রদত্ত মানব-মেধা ও মানব স্বভাবকে— যা কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্য করতে সক্ষম তাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। পুরো পৃথিবীকে দাবার কোটে পরিণত করতে হবে। যা থাকবে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। যে গুটি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেন আমরা সেই গুটিকে চালতে পারি। আর এ ব্যাপারে আমেরিকা ও ইসরাইলের পরিকল্পিত ঐক্য এখন আর গোপন কোন বিষয় নয় বরং দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ্য বিষয়।

তো আমি বলছিলাম— ইসলামী বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট ও সমস্যা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের রয়েছে এমন সব প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতা, এমন সব উৎপাদনকারী শক্তি যা অন্য কিছুতে নেই। এই কারণে বিভিন্ন ধর্ম ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। ইসলাম শুধু রাজনীতিকে গুরুত্বই দেয়নি বরং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রের রূপরেখা কী হবে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন মানবগোষ্ঠীর পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূল প্রদর্শিত পথে মানবগোষ্ঠীকে পরিচালিত করে। ‘রাজনৈতিক নেতৃত্ব’ দুটি শব্দ মাত্র নয়, এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিমিত। যে কথা বারবার বলা হয় তার গুরুত্ব কমে যায়। শব্দ দুটি সেরূপ নয়। শব্দ দুটি সব সময়ই তাৎপর্য ও গুরুত্ববহ। তো আমি বলছিলাম যে, বর্তমান যুগে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতা যাদের হাতে, সেই সঙ্গে সমাজের চিন্তা ও মনন সৃষ্টির নেতৃত্ব যাদের হাতে, সমাজের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি, তাদের বিশ্বাস ও মনন গড়ার উপকরণ যাদের হাতে সেই সকল ব্যক্তিদের, আমি বলছি মুসলমানদের কথা— সেই সকল মুসলমানদের নব্বই, পঁচানব্বই শতাংশ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্বাস করে না যে, ইসলামই একমাত্র সত্য দীন, বিশুদ্ধ দীন। জীবনের নিরাপত্তা দান করতে, ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে, সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে একমাত্র অবলম্বন ইসলামী অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা—এ কথায় তারা বিশ্বাস করে না। হতে পারে এটা তাদের স্বোপার্জিত জ্ঞান। কিন্তু আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, আপনি যদি গভীরে প্রবেশ করেন, তবে আপনি জানবেন যে, আমেরিকা ও ইউরোপের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদা এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত যে, কি করে নবশিক্ষিত

মুসলমানদের হাতে ঐ সকল সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা তুলে দেওয়া যায়, যার কারণে তারা ইসলাম সম্পর্কে হতাশ হতে বাধ্য হয়; বিশেষত ইসলামের চিরন্তনতা সম্পর্কে তারা সন্দেহান্বিত হয়ে যায় এবং তাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, বর্তমান যুগে ইসলাম মানবতাকে পথ প্রদর্শন করতে অক্ষম। কোন রাষ্ট্র, কোন সমাজ শুধু ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তিশীল হয়ে টিকে থাকতে পারে না।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সঙ্কট, সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খুব কম লোকই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখছে। বর্তমানে মুসলমান যে মেহনত ও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা অবশ্যই কল্যাণকর ও কার্যকর। আমি তাদের মেহনতকে খাটো করে দেখছি না। এই জাতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে আমি নিজেও চিন্তাগত ও কার্যগতভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে, বহু মুসলমানের মস্তিষ্কেই এই কথাটি নেই যে, আমাদের সকল মেহনত ও প্রচেষ্টা ঐ প্রভাব ও ফল সৃষ্টি করতে পারছে না, যা পূর্ব যুগের দাওয়াতী কর্মকাণ্ড দ্বারা সৃষ্টি হত। এর কারণ হল— পূর্ব যুগের দাওয়াতী কার্যক্রমকে বর্তমান যুগের ন্যায় কোন লেখনীর মোকাবেলা করতে হয়নি। বুদ্ধিভিত্তিক দলিল-প্রমাণাদি ও যুক্তির মোকাবেলা করতে হয়নি। পূর্ব যুগের দাওয়াতী কার্যক্রমের জন্য পথ ছিল পরিষ্কার। এজন্য তখনকার দাওয়াত শুধু মানুষের মস্তিষ্ক নয় বরং মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন সেরূপ হচ্ছে না। এর বড় কারণ বর্তমান যুগের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী। তারা শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বই দখল করেনি বরং চিন্তাগত নেতৃত্বও তাদের দখলে চলে গেছে। আর এর কারণ হল তাদের ব্যাপক পড়াশোনা। নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাইরে স্বাধীন অধ্যয়ন। পাঠ্যসূচির অন্তর্গত পুস্তকাদি পাঠ ও স্বাধীন পাঠের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। স্বাধীন অধ্যয়ন যতখানি মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এবং করতে পারে পাঠ্যবই তা পারে না। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যবই পড়ার ক্ষেত্রে পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্ঠানের এবং পাঠ্যবই নির্ধারণকারীদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে। কাজেই তার প্রভাব গ্রহণ করতে তাদের মন-মস্তিষ্ক কিছুটা হলেও দ্বিধাবিহীন হয়। কিন্তু স্বাধীন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এরূপ কোন কিছুই সংশ্লিষ্টতা থাকে না বিধায় অন্তর তা সহজেই গ্রহণ করে নেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দীন ইসলামের মূল্যায়ন করার সৌভাগ্য দান করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

জাতির অস্তিত্ব রক্ষা, শরীয়ত বাস্তবায়ন আন্দোলন ও ইসলামের বিজয় : কর্মধারা ও জাতীয় দায়িত্ব

[১৯৮৭ ইংরেজী সনের ১৭ মার্চ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত 'দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী দাওয়াত' বিষয়ক সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا
يَدْعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

সুধী!

আমাকে এই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত করে আমাকে যে সম্মান আপনারা দান করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ নয় এবং আত্মপ্রত্যারণারও শিকার নয় এইরূপ সত্যপ্রিয় ব্যক্তির জন্য এই জাতীয় সম্মেলনের মূল্য ও মর্যাদা অনেক। এর মাধ্যমে এমন এক পরিবেশে সে নিজের হৃদয়ের আকৃতি প্রকাশ করার এবং নিজের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলাফল বর্ণনার সুযোগ পায় যেখানে ধৈর্য সহকারে তার কথা শোনার মত শ্রোতা থাকে। অনেক সময় অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তারা তার কথা শুনে থাকে। আমার আশা করা উচিত যে, আমার সম্পর্কে আপনাদের অভিমত শুধু লৌকিক সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে নয় বরং তা আমার প্রতি আপনাদের আস্থার বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেকটি সূচনা অত্যন্ত নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে এবং সূচনার প্রভাব পড়ে গোটা বিষয়টির উপর। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাদের আস্থার উপযোগী এবং দায়িত্ব পালনের উপযোগী বলে প্রমাণ করুন। আমীন।

প্রিয় ও সম্মানিত সুধী!

আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে, তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদা অনুযায়ী আমাদের ও আপনাদের জন্য যে যুগ ও পরিবেশ নির্বাচিত করেছেন তা অত্যন্ত নাজুক, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতা হল, এই যুগ, এই পরিবেশ, এই দেশ ও এই

সমস্যা সঙ্কুল সময়ের জন্য প্রয়োজন ছিল কোন বড় মাপের যুগ সংস্কারকের। সংস্কার ও পুনর্গঠনের ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবেই শুধু নয়, একজন নগণ্য লেখক হিসাবেও আমি আপনাদের সামনে বলছি যে, বাস্তবিক আপনারা ও আমরা যে যুগ ও পরিবেশ পেয়েছি, আমরা যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি, এ যুগের যে সূক্ষ্ম অথচ নির্ভুর সঙ্কেত উপলব্ধি করা আমাদের জন্য জরুরী সে সবার জন্য প্রয়োজন ছিল আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ও দৃঢ়চেতা কোন যুগ সংস্কারকের। এটা আমার অতিশয়োক্তি নয়। সত্যই এই যুগ ছিল হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর উপযোগী। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহর সৃজনশীল যোগ্যতা ও তাঁর সংস্কারমূলক দৃঢ়তার উপযোগী। হযরত সাইয়েদ আহমদ ও হযরত ইসমাঈল শহীদদ্বয়ের আত্মমর্যাদাবোধের, তাঁদের দৃঢ়তার, তাঁদের দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার উপযোগী। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় বর্তমান যুগ ও তার চ্যালেঞ্জের জন্য, বর্তমান যুগের সমূহ সমস্যার মোকাবেলার জন্য আমাদেরকেই নির্বাচিত করা হয়েছে।

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

এটা প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্বাচন।

তবে পরীক্ষায় একজন পরিশ্রমী ছাত্রের সামনে যদি কঠিন প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, আর সে যদি তার মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে তাহলে প্রশ্নপত্রের উপর তার কোন আপত্তি উত্থাপন করার কথা নয়। সে বরং শোকর আদায় করবে এই ভেবে যে, তাকে এইরূপ সুকঠিন প্রশ্নের উত্তর দানের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলাকে কেউ পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ

তিনি যা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা তাঁর একক সিদ্ধান্ত। তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা তাঁর কুদরত প্রকাশ করে, তাঁর হেকমত ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটায়। যদি বলি তাঁর রহমত ও দয়ারও প্রকাশ ঘটায় তাহলে অত্যাুক্তি হবে না। এই যুগ ও পরিবেশের জন্য আমাদেরকে নির্বাচন করণের ফায়সালা তাঁর কুদরত ও তাঁর হেকমত ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। আমি আরও বিশ্বাস করি এটা আমাদের প্রতি তাঁর অপার রহমতের প্রকাশ। হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা যা করছ শেষ যুগে কেউ যদি এর দশভাগের একভাগও করে তবে সে নাজাত পেয়ে যাবে।

বাস্তবিক আমাদের জন্য যদি সেই স্বর্ণ যুগে হত, আর আমরা আমাদের বর্তমান যোগ্যতা ও মাপ অনুযায়ী কোন আমল করতাম তাহলে সেই আমলের উল্লেখযোগ্য কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব আমরা পেতাম না। অবস্থা ও পরিবেশের পার্থক্য অনুযায়ী আমলের মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যখন যে ফলের মওসুম নয় তখন সে ফল অত্যন্ত চড়া মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু মওসুমে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হয়।

আপনারা জানেন, শত্রুপক্ষের তীব্র আক্রমণের মুখে যখন আক্রমণ প্রতিহতকারীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে, পরাজয় বরণের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন যে মুসলিম সৈনিক দুর্বল, অসুস্থ কিংবা বয়সের ভারে ন্যূন হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে সে যে সওয়াব লাভ করবে তা একজন যুবক ও দক্ষ সৈনিক লাভ করবে না যখন শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের সৈন্যবল থাকে দ্বিগুণ এবং বিজয়ের সম্ভাবনা থাকে প্রায় শত ভাগ। অতএব আল্লাহ তাআলা যে আমাদের দুর্বলতা ও নিঃস্বতা সত্ত্বেও আমাদেরকে এই সঙ্কটময় ও সমস্যা সঙ্কুল যুগের জন্য নির্বাচন করে সৃষ্টি করেছেন তা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন এক যুগে প্রেরণ করেছেন যে যুগে অল্প আমলও আল্লাহর নিকট অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে।

সুধী!

কোন দেশে মুসলমানদের বসবাস এবং তাদের অবস্থান ও মর্যাদা ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারে দুটি নমুনা আমরা দেখতে পাই।

এক. মুসলমান থাকবে শাসকের মর্যাদা নিয়ে এবং দেশ থাকবে ইসলামী শাসনের শাসনাধীন। যেমনটা ছিল খেলাফতে রাশেদার পরে। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের শাসনাধীন হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটেছিল আরব উপদ্বীপ থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত। তাঁরা আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দেশসমূহ জয় করেছিল। এরপর সাগরের ওপারে ইউরোপের স্পেনকেও নিজেদের শাসনাধীন করে নিয়েছিল। মুসলমান যখন কোন দেশে শাসকের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করে তখন মুসলমানদের কী করা উচিত, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তাদের দাঁষ্ট ও সংস্কারকদের ভূমিকা কীরূপ হওয়া উচিত, তাদের আলেম সমাজের কর্মধারা কীরূপ হবে, ফকীহ ও মুফতীগণ কিভাবে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান দান করবেন, তাদের লেখক, গবেষক ও চিন্তাশীলদের কর্মধারা, চিন্তাধারা কীরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে স্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে, কুরআন মাজীদে সে

সম্পর্কে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে, বিবেক ও বুদ্ধির বিচার-বিবেচনা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে ইসলামী ইতিহাসের পর্যাপ্ত ও সুবিস্তৃত রেকর্ড।

দ্বিতীয় নমুনা- কোথাও মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাঁরা দেশের শাসক নয় বরং শাসিত হিসেবে জীবন যাপন করে। দেশের পরিচালন ব্যবস্থায় ও আইন প্রণয়নে তাদের কোন ভূমিকা ও অংশীদারিত্ব থাকে না। তাদের জন্যও ফিকহের কিতাবাদিতে শরীয়তের বিধিমালা বর্ণিত রয়েছে।

কিন্তু আমরা যারা হিন্দুস্তানে বসবাস করছি, আমাদের অবস্থা বর্ণিত উভয় প্রকার থেকে কিছুটা ভিন্নতর। এই দেশে আমাদের অবস্থা ও অবস্থান আমাদের নিকট দাবি করে চিন্তাশীলতা, বিচক্ষণতা, সত্যপ্রিয়তা এবং কঠোর পরিশ্রম। আমরা হিন্দুস্তানে সংখ্যালঘু অবশ্যই। তবে আমাদের সেই সংখ্যালঘিষ্ঠতা সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে। আমাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা এখানে এমন এক পর্যায়ের যে, তাকে সংখ্যালঘিষ্ঠতা বলা শত ভাগ যথার্থ নয়। কারণ আমাদের সংখ্যা কমপক্ষে পনের কোটি। অনেক মুসলিম দেশেও আপনি এই সংখ্যা পাবেন না। কোন কোন মুসলিম দেশের লোক সংখ্যা ত্রিশ চল্লিশ লাখ। কোথাও পঞ্চাশ লাখ। কোথাও দুই কোটি। কোথাও চার-পাঁচ কোটি। সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার লোক সংখ্যাও আমাদের চেয়ে কম। সেখানকার লোক সংখ্যা বড় জোর তের কি সাড়ে তেরো কোটি। অথচ আমরা পনের কোটির চেয়েও বেশি।

দ্বিতীয়ত আমাদের এই দেশটি গণতান্ত্রিক দেশ। অতএব এই দেশের রাজনীতিতে আমাদের অংশীদারিত্ব আছে। দেশের আইন প্রণয়নে আমাদের অংশীদারিত্বের সুযোগ আছে। দেশের শাসন ব্যবস্থাকে শুধু প্রভাবান্বিত করাই নয়, বরং শাসন ব্যবস্থাকে নতুন রূপে ঢেলে সাজানোর, দেশকে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালনের বরং কখনও কখনও মূল নিয়ামক হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ আমাদের জন্য রয়েছে। এই দেশে আমাদেরকে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যদি মুসলমানরা তাদের নাগরিক অধিকারকে স্বাধীনভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে ব্যবহার করে তবে আইন প্রণয়নকারী পার্লামেন্ট এবং সরকারী দল কোনভাবেই মুসলমানদেরকে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন ও দেশ শাসন করতে পারবে না। তারা মুসলমানদেরকে তোয়াক্কা না করে চলতে পারবে না। যদি মুসলমানরা চায় তাহলে দেশের আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের চিত্র পাল্টে দিতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে, এই দেশে আমরাই একমাত্র জাতি যাদের নিকট রয়েছে সংরক্ষিত শেষ আসমানী গ্রন্থ, আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট বার্তা। রয়েছে নববী

সীরাতের মহা সম্পদ। রয়েছে গোটা মানবজাতির জন্য রহমত ও হেদায়েতের মহা সম্পদ। রয়েছে নববী আদর্শ, হায়াতে সাহাবা এবং অনুকরণীয় ও আদর্শ বহু মনীষীর জীবন ও কর্মের ঐতিহাসিক রেকর্ড। মুসলমানরা নিজেদের কর্মে এসবের বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে। মুসলমান তো ঐ জাতি যাদের নিকট সর্বযুগে কোন নিমজ্জমান সমাজকে রক্ষা করার, কোন ম্রিয়মান প্রদীপকে প্রদীপ্ত করার, কোন ধ্বংসোন্মুখ দেশকে, কোন ওষ্ঠাগতপ্রাণ সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করার পর্যাণ্ড উপাদান রয়েছে।

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে (খ্রিস্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দী) মুসলমানেরা রোমান ও ইরানীদেরকে এবং মধ্য এশিয়ার শাসক তুর্কিস্তানী সমাজকে (যারা আরও অধিক কাল অবধি টিকে থাকার এবং শাসন ক্ষমতা চালিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল, যাদের বাহ্যিক শান-শওকত ও জাঁকজমক শরীরের অস্বাভাবিক স্থূলতা রোগের নিদর্শন ছিল) এবং হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে হিংস্র ও বর্বর চীনা ও তুর্কী বংশোদ্ভূত তাতারীদের দান করেছিল এক নতুন দীন ও বিশ্বাস। চিনিয়েছিল জীবনের লক্ষ্য। মুসলমানেরা তাদেরকে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সুসংহত ও পরিপূর্ণ সামাজিক ও নাগরিক নিয়ম-কানুন এবং নতুন নতুন জ্ঞান ও জীবনাচারে পরিপুষ্ট করে এক নতুন জীবনের সন্ধান দান করেছিল। ফলে এই তাতারীদেরই একটি শাখা উসমানী তুর্কীরা পরবর্তীতে (যারা হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যাদের মধ্যে নব জাগরণ, নব জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল) এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল যাকে বলা হত উসমানী সাম্রাজ্য। যারা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব সামাল দিয়েছিল এবং হারামাইন শরীফাইন সহ পবিত্র ইসলামী স্থানসমূহের সংরক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়েছিল এবং যারা ইসলামের মান-মর্যাদা ও শান-শওকতের প্রতিভূরূপে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছিল।

মুসলমান ঐ জাতি যারা নিমজ্জমান জাহাজকে সাগরের তীরে নিরাপদে নোঙ্গর করাতে সক্ষম। পতনোন্মুখ সমাজকে, নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাতে উদ্যত সমাজকে রক্ষা করতে সক্ষম। কারণ তাদের নিকট আছে ঐ ইলাহী গ্রন্থ, ঐ নববী আদর্শ, ঐ ঈমান ও বিশ্বাস, যা তাদেরকে সম্পদ-পূজারী, ক্ষমতা-পূজারী, শক্তি-পূজারী ও বস্তুপূজারী হতে দেয় না। মুসলমানরাই একমাত্র ঐ জাতি মৃত্যুর পরে অন্য এক জীবনের যথার্থ বিশ্বাস যাদের অন্তরে বিদ্যমান। উদাসীনতার যত পুরু আবরণই মুসলমানকে আচ্ছাদিত করুক, যতই সে আত্মবিশ্বস্ত হোক তার অন্তরে এতটুকু চেতনা ও উপলব্ধি অবশিষ্ট থাকে যে, তাকে একদিন আল্লাহর

সামনে দাঁড়াতে হবে, রাসূলকে মুখ দেখাতে হবে এবং নিজের ইহ জীবনের হিসাব প্রদান করতে হবে। সেখানে না সম্পদ কোন কাজে আসবে, না মান-মর্যাদা, না ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। সেখানে শুধু কাজে আসবে বিশুদ্ধ ঈমান ও আমল এবং নির্মোহ খেদমতে খালক।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এই জাতির জীবন ও অভিযাত্রার দীর্ঘ ইতিহাসে ভারতে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আমরা এখানে সংখ্যালঘু। কিন্তু আমাদের এই সংখ্যালঘিষ্ঠতা এত বিপুল আকারের যে, আমরা যদি আমাদের স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারি, সংখ্যাগুরুদের তুলনায় অধিক পরিশ্রম করতে পারি এবং দেশের জন্য নিজেদেরকে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করতে পারি, আমাদের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার প্রমাণ রাখতে পারি তবে আমরা নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারব, দেশের শাসন ও পরিচালনায় আমাদের অবস্থান তৈরি করে নিতে পারব। কমপক্ষে দেশের গতি-প্রকৃতি পাল্টে দিতে পারব। ক্ষমতাসীনদেরকে আমাদের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা স্বীকার করাতে পারব।

এমতাবস্থায় এই দেশে এই জাতির আলেম সমাজের, চিন্তাশীল ও গবেষক সমাজের এবং যারা পরিচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এত বিশাল, এত নাজুক ও জটিল যে, এর পূর্বে কোন দেশে তা কল্পনাও করা যায়নি। পনের কোটি মুসলমান এমন এক দেশে বসবাস করে, যে দেশ নানাবিধ বিপদ ও জটিল সমস্যায় জর্জরিত। যেখানে বহুকাল যাবৎ মানুষ তৈরির, চরিত্র ও নৈতিকতা সৃষ্টির কারখানা রয়েছে বন্ধ। সম্পদের মোহ ও বস্তুপূজার বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী ও আত্মিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির কারখানা রয়েছে বন্ধ। এর কারণ যাই হোক বাস্তবতা এটাই যে, ভারতীয় সমাজ বর্তমানে চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই চারিত্রিক অবনতির নিদর্শন স্পষ্ট। এইরূপ পরিস্থিতিতে এখানে এক জাতি বাস করে যাদের সংখ্যা বলা হয় পনের কোটি। তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব, আসমানী গ্রন্থ। রয়েছে নববী সুল্লাহর সুসংরক্ষিত সংকলন। আইনশাস্ত্রের এরূপ বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে, যাতে বিধৃত রয়েছে ইবাদত থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, কায়-কারবার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক সমস্যাাদি সম্পর্কিত জীবন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধি-বিধান। যার নজীর পৃথিবীর কোন জাতির নিকট পাওয়া যাবে না।

সবচেয়ে বড় কথা হল- আমরা আখেরী উম্মত । আমরা কুরআন বাহক, আমরা দাঈ ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী । আমরা সমগ্র জগতের প্রতি দৃষ্টি দানকারী ।

আল্লামা ইকবাল এই উম্মতের এই রূপটিরই চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায় । রূপকভাবে ইবলিসের ভাষায় । ইবলিসের সামনে একবার তার পারিষদবর্গের সদস্যরা বিভিন্ন জাতির অবস্থাাদি নিয়ে আলোচনা করছিল । তারা তাদের জন্য কোন কোন বিষয় হুমকি স্বরূপ সে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করছিল । কেউ বলল, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ও হুমকি হচ্ছে কমিউনিজম । কেউ বলল, গণতন্ত্র আমাদের জন্য হুমকি । কেউ বলল, রাজতন্ত্র আমাদের জন্য হুমকি । কেউ বলল,

فتنہ فردا کی ہیئت کا یہ عالم ہے کہ آج
کا بیچتے ہیں کوہسار و مرغزار و جوئے بار
میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے
جس جہاں کا ہے نقطہ تیری سیاست پر مدار

‘ভবিষ্যতের ফেতনার অবস্থা তো এই যে,
পাহাড়-পর্বত, সাগর ও নদীনালা বর্তমানে তজ্জন্য কম্পিত ।
জাঁহাপনা, ঐ জগত ওলট-পালট হতে বাধ্য
আপনার শাসন যেখানে নিরঙ্কুশ ।’

ইবলিস এ সকল হুমকিকে কোন গুরুত্ব দিল না । সে বলল,
ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات

‘প্রতি দমে আমি ঐ উম্মতের জাগরণকে ভয় করি
যে উম্মতের দ্বীনের মূল বিষয় হল সর্ব জগতের প্রতি দৃষ্টি দান ।
সে আরও বলল-

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے
جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو

خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ
کرتے ہیں اشکِ سحر گاہی سے جو ظالم وضو

আমার আশঙ্কা শুধু এই উম্মতের ব্যাপারে
যে উম্মতের ভস্মস্তূপেও বিদ্যমান থাকে প্রত্যাশার জ্বলন্ত অঙ্গার।
এই উম্মতের মধ্যে দুই একজনকে এখনও দেখি এরূপ
শেষ রাতের কান্নার অশ্রু দিয়ে যে জালেম সম্পন্ন করে অযু।

সুধী!

মুসলিম জাতির এই বৈশিষ্ট্য এবং এ দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, এতদ্ব্যতীত পনের কোটির ন্যায় বিশাল সংখ্যক মুসলমানের বসতি— এইসব কিছু এই দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করতে আমাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টিকারী। এখানকার আইন প্রণয়নে আমাদের অংশীদারিত্ব থাকতে পারে। আমরা যদি চারিত্রিক, আদর্শিক, চিন্তাগত ও কার্যগতভাবে নিজেদেরকে উচ্চমান সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে প্রমাণ করতে পারি, তাহলে এই দেশের নেতৃত্ব আমাদের চাইতে হবে না বরং দেশের নেতৃত্বই আমাদেরকে খুঁজে ফিরবে। সূর্যসম প্রদীপ্ত প্রদীপ নিয়ে আমাদেরকে তালাশ করে বেড়াবে। মাটির প্রতিটি ধূলিকণা, গাছের প্রতিটি পাতা থেকে উচ্চারিত হবে যে, এই দেশকে রক্ষাকারী কে? তাকে খুঁজে বের কর। সে আসুক দেশকে রক্ষা করুক। আপনাদের স্বকীয়তা ও মর্যাদা অনায়াস ও ক্লেশহীনতার দাবী করে না। আপনারা দেশের মুক্তি দানকারী। এই দেশের জন্য আপনারা শেষ ভরসা। এই দেশের অধিবাসীদেরকে পারম্পরিক ইনসারফ ও ন্যায়পরায়ণতার আহ্বান জানান। সুস্থ বিবেক সৃষ্টির আহ্বান জানান। খোদাভীতি ও মানবপ্রীতির পয়গাম শোনান। তবে লক্ষ্য রাখুন যে, সেই আহ্বান ও পয়গামের সাথে যেন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের এবং ঈমানী প্রেরণার মিশ্রণ থাকে। এমনকি আল্লাহ প্রদত্ত আত্মাণ শক্তির অধিকারী মেধাবী লোকেরা যেন আমাদের মানবতাবাদী ব্যাপক দাওয়াতের মধ্যেও আমাদের ঈমানের সুরভি ও সুগন্ধ অনুভব করে। তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, এই পয়গাম ও দাওয়াত আত্মস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত নয়, কোন লোভ ও মোহ দ্বারা পরিচালিত নয়। এই দাওয়াত ও পয়গামের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। তারা যেন বুঝতে পারে যে, এই দাওয়াত ও পয়গাম আমাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ইসলামের শিক্ষা থেকে উৎসারিত, তা থেকেই আলো ও শক্তিপ্রাপ্ত। তারা

যেন বুঝতে পারে যে, এই দাওয়াত ও পয়গামের উদ্দীপক ও উৎস আমাদের আল্লাহ, যিনি রাক্বুল আলামীন এবং আমাদের রাসূল, যাকে শেষ নবী ও রাহমাতুল লিল আলামীন রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল।

আমরা যদি আমাদের কাজ করি এবং আমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করি তবে এই দেশে আমরা শুধু সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারব তাই নয়, বরং এই দেশের নেতৃত্ব আমাদেরকে খুঁজে ফিরবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)কে কারাগারে প্রেরণ করা হল। এমন এক অভিযোগে তিনি কারাগারে প্রেরিত হলেন, যে অভিযোগের পরে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ভবিষ্যত থাকে না। লোক সমাজে সে মুখ দেখানোর উপযুক্ত থাকে না। কিন্তু তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কর্মগত যোগ্যতা দ্বারা, তাঁর অসাধারণ ঈমানী শক্তি দ্বারা কারাগারে থেকেই প্রমাণ করে দিলেন যে, সমগ্র মিসরে তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একক ব্যক্তিত্ব, তাঁর কাছে ঈমানের সম্পদ আছে, সত্যতার স্বর্ণখনি আছে, আমলী যোগ্যতা আছে। আছে মানবপ্রীতি, সত্যতা ও বিশ্বস্ততা। অবশেষে মিসরের বাদশাহ তাঁকে কারাগার থেকে ডেকে পাঠান। কিন্তু অত্যন্ত আত্মমর্যাদার সাথে তিনি দূতকে বলেন,

ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

‘তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের খবর কী? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।’ (সূরা ইউসুফ ৫০)

বাদশাহ পুনরায় তদন্ত করলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। নারীরা বলল-

حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ

‘অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য; আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।’

(সূরা ইউসুফ ৫১)

মূল অভিযোগকারিণী বলল, আমিই তাকে ফুসলিয়ে ছিলাম। অতঃপর আমার ষড়যন্ত্রেই সে কারাগারে প্রেরিত হয়েছিল। যখন হযরত ইউসুফ (আ.) জেল থেকে বের হয়ে এলেন তখন মিসরের বাদশাহ তাঁকে কোন পদ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন-

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

‘আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের কর্তৃত্বে নিয়োজিত করুন। কারণ আমি রক্ষণাবেক্ষণ উত্তমরূপে করতে পারি এবং এতদসম্পর্কে আমার জ্ঞানও রয়েছে।’

কুরআনুল কারীম ইতিহাসের কোন গ্রন্থ নয়। তাই তাতে কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়নি। তবে কাহিনীর বর্ণিত অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ সাত বৎসর মিসরে অবস্থান করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই দেশের পরিচালন ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা দুর্বল বিভাগ হচ্ছে খাদ্য ও অর্থ-সম্পদ বিভাগ। এটা এমন এক বিভাগ যার সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকে সর্বাধিক। এই বিভাগের মাধ্যমেই সর্বসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সবচেয়ে সহজ। এই বিভাগ পরিচালনার মাধ্যমেই সর্বসাধারণের নিঃস্বার্থ সেবা করে তাদেরকে আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত করা যেতে পারে। তাদেরকে বিশ্বস্ত বিশ্বাস ও সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তাই তিনি বললেন—

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

সুধী!

এদেশে বড় বড় রাজনৈতিক দল আছে। হাজার হাজার কলেজ-ইউনিভার্সিটি রয়েছে। শিক্ষার যথোচিত উপকরণ রয়েছে। শিক্ষার মানও উচ্চ পর্যায়ে। এইসব সত্ত্বেও সৎ নেতৃত্বের, ন্যায়নিষ্ঠের নেতৃত্বের, খোদাভীরু ও মানববান্ধব নেতৃত্বের পদ এখনও রয়েছে শূন্য। আপনারা নিজেদেরকে চিনুন, নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হোন, নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করুন এবং দেশের সেবায়, দেশে এক কল্যাণমুখী বিপ্লব ঘটাতে, দেশকে একটি সুন্দর গতি-প্রকৃতি দান করতে, দেশকে পরিচালনা করতে নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগান। দেশ ও জাতি কোনটার ব্যাপারেই আমাদের চোখ বন্ধ করে রাখা চলবে না। তবে সব সময়ই আমাদের দাঁড় সুলভ কর্মকাণ্ডের, আমাদের নির্মল ও খোদাভীরু স্বভাবের এবং যে কারণে আমাদেরকে ‘খায়রে উম্মাত’ অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে তার প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে বজায় থাকতে হবে। এই লাভ-ক্ষতির জগতে, রাজনীতির এই জুয়াখানায় আমাদের আদর্শপ্রীতি, আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী, আমাদের ঈমানী চেতনা যেন সবকিছুর উপরে সমুন্নত থাকে। ঐ সকল রাজনৈতিক দলগুলোর নীচ ও হীন মানসিকতা আমাদেরকে যেন স্পর্শ না করে। কারণ তারা অন্যের ধ্বংসের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও অন্যের দুর্গতির মধ্যে নিজেদের উন্নতির স্বপ্ন দেখে এবং

তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়। এই দেশ ও জাতি উভয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মানসিকতাকে নির্মাণ করতে হবে আসমানী ও নববী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে।

সুধী!

সেই সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা সৃষ্টি করা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দ্বীনহারা হওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল। ইতোমধ্যে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত এরতেদাদের শিকার হয়ে গেছে। আকীদা ও বিশ্বাসগত এরতেদাদের আশঙ্কাও একদম মাথার উপর। আপনারা নিজেদের পাড়া-মহল্লায়, নিজেদের ঘরে ও আত্মীয়-স্বজনের ঘরে শিশুদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি সৃষ্টি করুন। মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করুন। মসজিদ ও মাদরাসার জাল বিছিয়ে দিন। এই পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে আমার একটি বক্তৃতার কিছু অংশ পেশ করছি। কিছুদিন পূর্বে একটি দ্বীনী কাউন্সিলের প্লাটফর্মেরে আমি ঐ বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

‘যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, জাতির জন্য একটি পোষ্টার তৈরি করতে হবে এবং সেখানে একটি মাত্র বাক্য থাকবে, বলুন তো কোন বাক্যটি লেখা যায়? আমি বলব- ما تعبدون من بعدى (আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে?) লিখে দাও এবং পোষ্টারের নিচে লিখে দাও যে, দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে প্রতিটি মুসলমান যেন নিজ সন্তানদেরকে এই প্রশ্নটি করে এবং যত দিন জীবন থাকে তত দিন যেন নিজে চিন্তা করে দেখে যে, তার নিকট এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আছে কি না? সে নিজের সন্তানদের ব্যাপারে নিজের পরবর্তী বংশধরদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী ভাবে কিনা যে, তারা তাওহীদের বিশ্বাসে অটল থাকবে, শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত থাকবে। আমাদের আপনাদের সকলেরই উচিত নিজেদের বুকে হাত রেখে অনুভব করা যে, বাস্তবিক আমাদের অন্তরে এই প্রশ্নটির গুরুত্ব কতটুকু বিদ্যমান? ব্যক্তির ব্যাপারে, পরিবারের ব্যাপারে, সমাজ ও জাতি, বিশেষত ভারতীয় মুসলিম জাতির ব্যাপারে আমাদের অন্তরে প্রশ্নটি জাগ্রত হয় কিনা? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কোন পথে চলবে? তারা কোন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে? কার ইবাদত ও উপাসনা করবে? কোন বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করবে? এখানে কি এক আল্লাহর উপাসনা হবে, না হাজার ও লক্ষ-কোটি দেব-দেবীর পূজা হবে?’

সেই সঙ্গে মুসলমানদের নিজেদের জাতিসত্ত্বার স্বকীয়তা ও স্বাভাবিক বজায় রাখতে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সেই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখুন। কোন দেশে

সাগরের মাছের ন্যায় নাম-পরিচয়হীনভাবে বসবাস করার বৈধতা আমাদের নেই। ‘শাহবানু’-র মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদেরকে চরম আঘাত করেছে। ফলে ‘অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড’ বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই জাতীয় সমস্যাগুলোকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি ১৯৮৬ ঈসাব্দী সনের ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ‘অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের’ অধিবেশনে আমার প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। আমি সেই অধিবেশনে বলেছিলাম, ‘মুসলমানরা যদি মুসলিম পার্সোনাল ‘ল’ তথা মুসলিম পারিবারিক আইনে কোনরূপ পরিবর্তনকে বরদাশত করে নেয়, তবে তারা তাদের অর্ধেক মুসলমানিত্ব হারাবে। এরপর যে অর্ধেক অবশিষ্ট থাকবে তাও টিকে থাকবে কিনা সেই আশঙ্কা সৃষ্টি হবে। চরিত্র দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দর্শন, সমাজ দর্শন ও ধর্মদর্শন চর্চাকারীরা অবগত আছেন যে, ধর্মকে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে পৃথক করা যায় না। উভয়ের মাঝে প্রকৃতিজাত ও স্বভাবজাত সম্পর্ক বিদ্যমান। ধর্মকে বাদ দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা ও স্বাভাবিকতা টিকে থাকতে পারে না। অপর দিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিকতা ব্যতীত ধর্ম তার প্রকৃত রূপ নিয়ে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। এর ফল এই দাঁড়াবে যে, বেশীর চেয়ে বেশি আপনি মসজিদে মুসলমান থাকবেন, ঘরে ও সমাজে মুসলমান থাকবেন না। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আপনি মুসলমান থাকবেন না। এই কারণে আমাদের উপর অন্য কোন সংস্কৃতি, সমাজনীতি ও পারিবারিক আইন চাপিয়ে দেওয়াকে আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা এটাকে ধর্মত্যাগের আহ্বান বলে মনে করি, ইরতিদাদের সমার্থক বলে মনে করি। ধর্মত্যাগের আহ্বানের বিরুদ্ধে মোকাবেলার ন্যায় তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের মোকাবেলা করা উচিত। এটা আমাদের নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় অধিকার। ভারতীয় সংবিধান এবং এই দেশের গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান আমাদের এই সংগ্রামকে শুধু সমর্থন করে তাই নয়, বরং এই সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে। কারণ প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় বিশেষত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও শান্তি বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে গণতন্ত্রের সুরক্ষা।’

সুধী!

কয়েক বছর পূর্বে ইনডোরে ঠাকুর হলে ‘মানবতার পয়গাম’ বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলাম। সেখানে R. S. S-এর লোকজন উপস্থিত ছিল। পরের দিন আমার অবস্থান স্থলে একটি প্রতিনিধি দল আসল। আমি জানতে পারলাম, প্রতিনিধি

দলের মধ্যে R. S. S -এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রয়েছেন এবং তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

তারা আমাকে বলল, “জনাব! আপনার গতকালের বক্তৃতা শুনে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আপনার মধ্যে এই দেশের কল্যাণচিন্তা আমাদের চেয়েও বেশি।’

সুধী!

আপনাদের প্রত্যেকের কথা থেকেই এই বিষয়টির প্রকাশ ঘটা উচিত যে, অন্যদের তুলনায় দেশের কল্যাণ চিন্তা আপনাদের মধ্যে বেশি। এখানকার প্রতিটি নাগরিক যেন এ কথাই বোঝে যে, তাদের তুলনায় আপনাদের মধ্যে দেশের কল্যাণ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। ধন-সম্পদ অপেক্ষাও দেশ আপনাদের নিকট অধিক প্রিয়। এই সমাজ আপনাদের নিকট প্রিয়। এই দেশপ্রেম এমনই এক মূল্যবান ও মহৎ গুণ যা মানুষের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। অনুমিত হচ্ছে যে, উচ্চশ্রেণীর লোকজনের মধ্যেও এই দেশপ্রেমের গুণটি অনুপস্থিত। তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির চিন্তায় এতটাই বিভোর যে, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তারা এরূপ সব কর্ম করে বসে যার কারণে দেশ হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। সমাজ ধীরে ধীরে চরম অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অথচ এই অবস্থা দর্শনে কাউকে পেরেশান ও ব্যাকুল হতে দেখা যাচ্ছে না। কাউকে এরূপ দেখা যাচ্ছে না যে নিজের দল ও মতাবলম্বীদের তিরস্কার ও সমালোচনাকে তোয়াক্কা না করে সমাজকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

সুধী!

আপনাদের এই সমাবেশে আলেম, ফায়েল, লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ ও সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত রয়েছেন। আমি আমার এই আলোচনাকে শেষ করছি ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক দৃষ্টান্তমূলক ও অতি শিক্ষণীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করে। ঘটনাটি আমাদের জন্য বিশেষ পয়গামবাহী।

আরব উপদ্বীপে যখন ইরতেদাদ ও ধর্ম ত্যাগের আগুন ছড়িয়ে পড়ল তখন এই ইরতিদাদের মোকাবেলা করার দায়িত্ব ছিল সকলের। কিন্তু সকল মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ সমান থাকে না। দায়িত্ববোধের এই পার্থক্যই কোন কোন মানুষকে মহান ও অমর করে তোলে। হযরত আবু বকর (রাযি.) ছিলেন তখন খেলাফতের আসনে আসীন। তিনি বললেন,

اینقص الدین وناحی

আমি জীবিত থাকতে দ্বীনে কাটছাঁট হবে?

আমার জীবনের জন্য হবে ন্যাঙ্কারজনক ঘটনা, যদি আমাদের সামনে ইসলামী শরীয়তে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কোন পরিবর্তন ঘটে এবং ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানগুলোর মধ্যে বাছাই প্রক্রিয়া চলে। নামায তো ঠিক, রোযাও ঠিক কিন্তু যাকাত নেই। কিংবা যাকাত ঠিক আছে কিন্তু রোযা নেই। আমি জীবিত থাকব আর আমার সামনে এই বিকৃতি ঘটবে? তা হতেই পারে না। এটা ছিল তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ। যে আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তাঁর মুখ থেকে ঐ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে। বাক্যটি নিছক একটি বাক্য নয়। তা ছিল ঈমানী শক্তির স্ফুরণ। বাক্যটি যুগের গতি পাল্টে দিয়েছে। ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করে দিয়েছে।

আল্লাহ জালা জালালুহ আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথরূপে আনজাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ভিন্ন মেরুর দুটি দল

[হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ২৭ মহররম ১৩৯৩ হিজরী মোতাবেক ২ মার্চ ১৯৭৩ ইং জামেয়া রাহমানিয়ার দারুল হাদীসে ঈমান বর্ধক এই ভাষণটি দান করেছিলেন। ‘জামেয়া রাহমানিয়া’ আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি হিন্দুস্তানের বিহার প্রদেশে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রাখে। প্রতিষ্ঠানটিকে বিহারের আযহার বলা হয়ে থাকে।]

হযরত আমীরে শরীয়ত, শিক্ষকবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আজ আমার একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আকাজক্ষা পূর্ণ হল। আর তা হল এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটিতে উপস্থিত হওয়া। আমার উপস্থিতি আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে কি না বা আমার উপস্থিতি দ্বারা আপনাদের কোন খেদমত হবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, আমি আপনাদের কোন খেদমত আঞ্জাম দিতে পারব এবং মানপত্রে আপনারা আমার ব্যাপারে যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তা পূর্ণ করতে পারব। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার এখানে উপস্থিতি আমার নিজের সৌভাগ্যের ও সফলতার কারণ হবে। আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি খাদেমরূপে। আমার উপস্থিতি বন্ধুরূপে ও ভাইরূপেও, তবে সবচেয়ে বেশি খাদেমরূপে। আমার বিশ্বাস, আমার মরহুম পিতা যদি এখানে উপস্থিত হতেন তাহলে তিনিও এখানে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন এবং যাঁর খেদমতে তিনি আসতেন তিনিও খুব আনন্দিত হতেন।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এই জায়গার সঙ্গে এবং এই জায়গা যে ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে পরিচিত তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অতি পুরাতন ও গভীর। মানপত্রেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্পর্কের কারণে আমি গর্বও বোধ করে থাকি, কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করি এবং আল্লাহর নিকট দুআও করি, যেন তিনি এই সম্পর্ককে অটুট রাখেন। আমার একটুও মনে হচ্ছে না যে, আমি নতুন এই জায়গায় নতুন এসেছি এবং অপরিচিত ছাত্রদের সামনে, কোন মাদরাসার শিক্ষার্থীদের সামনে

কথা বলছি। আমার মনে হচ্ছে যে, আমি নিজের পরিবারের সদস্যদের সামনে, পরিবারের স্নেহভাজন ও প্রিয়দের সামনে কথা বলছি। আমার যতদূর বিশ্বাস আমি শরীয়ত হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেবও আমার ব্যাপারে অনুরূপ ভাবছেন। তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধিও একই রকম। আমার বিশ্বাস, তিনি আমাকে দাওয়াত দিয়ে এখানে এনে একথা ভাবছেন না যে, তিনি কোন দূর সম্পর্কীয় কাউকে দাওয়াত দিয়ে এনেছেন। বরং তিনি ভাবছেন, পরিবারের একজন স্নেহভাজন সদস্যকে ডেকে এনে পরিবারের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে, এই ফুল বাগিচার আদরের বাচ্চাদের সঙ্গে তার মিলন ও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন। এই কারণে আপনাদের সামনে না আমার বিনয় প্রকাশের কিছু আছে, না কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের। তবে মানপত্র সম্পর্কে একটু অবশ্যই বলব। মানপত্র তো এমন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, যার সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা থাকে না, কিছুটা দূরত্ব থাকে অথবা যিনি অতিথি হয়ে আসেন। এটা তো আমার ঘর। আমি এখানে ঘরের একজন সদস্য হিসাবে উপস্থিত হয়েছি। অথচ আপনারা এই লৌকিকতামূলক শিষ্টাচার প্রদর্শনের কষ্ট স্বীকার করলেন। কিন্তু যেহেতু আপনাদের এই আচার আমার প্রতি আপনাদের ভালবাসা থেকে উৎসারিত, আপনাদের ভালবাসা প্রকাশের জন্য প্রচলিত রীতিকে উপায় বলে মনে করেছেন সেহেতু এর বিরুদ্ধে বেশি কিছু অভিযোগ উত্থাপন করছি না। তবে একথা অবশ্যই বলব যে, এর কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনারা যদি ইখলাসের সাথে মানপত্রটি প্রদান করে থাকেন তাহলে আমি তা শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ করছি এবং আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বলার মত অনেক কথাই আছে

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

এই আলোচনা সভায় আপনাদের উদ্দেশ্যে বলার মত অনেক কথা আছে। আপনারা ও আমরা সকলেই একই নৌকার আরোহী। বরং আমি মনে করি পৃথিবীতে যতগুলো দ্বীনী প্রতিষ্ঠান আছে, তা ভারতে হোক কিংবা মিসর ও সিরিয়ায়, মরক্কোতে হোক কিংবা আল-জাজাইর ও তিউনেশিয়ায় সকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ একই নৌকার আরোহী। নৌকাটি বর্তমানে উত্তাল সাগরে পতিত। পানির ভয়াবহ চক্রাবর্তে নিপতিত। সাগরে তুফান উঠেছে। যে সকল বড় বড় জাহাজে জাহাজ রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থাদি বিদ্যমান এবং যেগুলো সাগরের স্রোতের অনুকূলে চলছে, সেসব জাহাজও বর্তমানে সাগরের উত্তাল তরঙ্গে

হাবুড়বু খাচ্ছে, সেগুলোও নিমজ্জনের আশঙ্কায় নিপতিত। সুতরাং আমাদের ও আপনাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ আমরা চলছি বর্তমান স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। আমাদের জাহাজকে আমরা নিয়ে চলেছি স্রোতের উল্টো দিকে। অতএব আমাদের উচিত অত্যন্ত ধীর-স্থিরতার সাথে নিজেদের অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা।

দুইটি দল

আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে। এক শ্রেণী মাদরাসা ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে হতাশ। তারা মাদরাসার কল্যাণকামিতাকে অস্বীকার করে। এই মাদরাসাগুলো কোন উদ্দেশ্যে চলছে এবং এগুলো সমাজের কী খেদমত ও সেবা করবে, এসব মাদরাসার দ্বারা আদৌ কোন লাভ হচ্ছে কিনা, বর্তমান যুগের উদ্দেশ্যে এসব মাদরাসার কোন বার্তা আছে কিনা, সমাজের কল্যাণ সাধনের কোন উপাদান এসব মাদরাসা ধারণ করে কিনা, এসব মাদরাসা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মত যোগ্যতা রাখে কিনা, এ ব্যাপারে তারা সন্দেহান।

অপর শ্রেণী উদাসীনতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তারা বাস্তবতা নিয়ে আদৌ ভাবে না। তারা এই যুগকে চারশত এবং ছয়শত বৎসর পূর্বের যুগ বলে মনে করে। মনে করে, এখনও জামেয়া নিয়ামিয়া বাগদাদের যুগ চলছে। তারা যুগের পরিবর্তন সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। ধারণা রাখলেও নিজেকে যুগ হতে, যুগের চাহিদা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ব্যাপারটা ঠিক উট পাখীর ন্যায়। উটপাখী বালুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে। এরপর তার আশেপাশে কী ঘটে যাচ্ছে তা সে দেখে না। যেহেতু সে কিছুই দেখে না তাই মনে করে, কিছুই ঘটছে না। এই উভয় শ্রেণী দুই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে। উভয়েই প্রান্তিকতার শিকার। আমাদের দরসী ভাষায় যাকে বলা যায়—

على طرفي الاخير

এদের কোন শ্রেণীই বাস্তবতা উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী কাজ করছে না। এদের কারও পথই সরল পথ নয়।

যুগ দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে

আপনাদের সামনে কোন রাখ-টাকের কথা নয় এবং এর জন্য কোন গবেষণা ও মেধা খরচের প্রয়োজন পড়ে না। কথাটি হল যুগ অত্যন্ত সংবেদনশীল, যুগ দ্রুত

পরিবর্তন হচ্ছে, বরং বলা যায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে যতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ততটুকুতে যুগ স্থির নাই বরং অবিরাম পরিবর্তন হয়েই চলেছে। অতএব মাদরাসার ছাত্রদের উল্লেখিত শ্রেণীদ্বয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, তাদের করণীয় কী, তাদের ভবিষ্যত কোন পর্যায়ে, তারা কিরূপ খেদমত আগ্রাম দিতে পারবে?

দ্বীন কোন মিউজিয়াম বা যাদুঘর নয়

প্রিয় ছান্দবন্দ!

আপনারা বড় বড় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করার যোগ্যতা রাখেন। হয়তো সেগুলো অধ্যয়ন করে থাকবেন অথবা ভবিষ্যতে অধ্যয়ন করবেন। এই বিষয়ে বড় বড় উন্নত মানের গ্রন্থাদি রয়েছে, লেখকগণ শাস্ত্র আকারে গবেষণামূলক এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন যে, কোন মতাদর্শ শুধু তার অতীত ইতিহাস, শুধু শক্তি, শুধু জিদ ও অস্বীকৃতি নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। যত উপযুক্ত মতাদর্শই হোক, তাকে শুধু ইতিহাসের মর্যাদা দিয়ে, পবিত্র উত্তরাধিকার রূপে কিংবা প্রাচীন নিদর্শনরূপে টিকিয়ে রাখা যায় না। বড় বড় শহরে আপনারা প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষণ কেন্দ্র দেখে থাকবেন, জীবজন্তুর যাদুঘর যেমন আছে, তেমনি জড় পদার্থের যাদুঘরও আছে। আপনারা প্রদেশের রাজধানী পাটনাতেও এরূপ যাদুঘর থেকে থাকবে। এইসব প্রাচীন নিদর্শনগুলোকে শুধু সংরক্ষণই নয়, বরং এগুলোকে হৃদয় দিয়ে আগলে রাখা হয় আর এর জন্য বিশাল ও বিস্তীর্ণ জায়গা-জমি বরাদ্দ করা হয়, সরকারের অর্থ বাজেটের এক বিরাট অংশ এর পিছনে ব্যয় করা হয়। এইসবই যথাস্থানে যথার্থ। কিন্তু এর মূল্য কতটুকু? দর্শনযোগ্য, জীবনসংশ্লিষ্টতাবর্জিত বিনোদনের একটি লাভ-লোকসানহীন মাধ্যম ব্যতীত এগুলো আর কিছু নয়। জীবনের জন্য অপরিহার্য কোন অনুষ্ঙ্গরূপে এগুলোকে সংরক্ষণ করা হয় তা নয়। এসব যাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ কোন সেবা, পরিষেবা আগ্রাম দিচ্ছে এজন্য এগুলোকে সংরক্ষণ করা হয় তাও নয়। বরং শুধু এজন্য যে, মানুষের ব্যস্ত জীবনে কখনও কখনও বিনোদনের প্রয়োজন পড়ে, আর এগুলো বিনোদনের একটি মাধ্যম। তাছাড়া এসব প্রাচীন নিদর্শনাবলী নিয়ে গর্ব করার সুযোগ পাওয়া যায়। কারণ তা প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক। কোন জাতির, কোন দেশের অতীত সভ্যতার এগুলো একটি বড় নিদর্শন। শুধু এসব কারণেই এগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়। যদি এসব নিদর্শনাবলীর মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান থাকত অথবা এসব নিদর্শনাবলী যে সকল অতীত মানুষগুলোর সাথে

সম্পৃক্ত তারা যদি জীবিত থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তারা এই সংরক্ষণ কর্মকে সাধুবাদ জানাত না।

এই পজিশনকে কোন জীবন্ত জাতি, কোন বার্তাবাহক জাতি গ্রহণ করে নিতে পারে না

কোন জীবন্ত জাতি- যারা কোন মতাদর্শের ধারক, যাদের একটি অবস্থান ও মর্যাদা আছে, যারা কোন সত্যকে দৃঢ়ভাবে লালন করে থাকে এবং কোন অসত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, যাদের একটি সুনির্দিষ্ট পথ আছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা আলো ও চক্ষু দান করেছেন, যারা কিছু বিষয়কে ভ্রান্ত এবং কিছু বিষয়কে সঠিক বলে মনে করে- এই পজিশনকে গ্রহণ করে নিতে পারে না। তারা তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার সীমাবদ্ধতাকে এবং যেমন করে প্রাচীন ফারাও সম্রাটদের লাশকে মমি করে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে ক্ষতিকর নয় মনে করে কোন জায়গায় নিরাপদে থাকতে দেওয়ার সুযোগ দানকে মেনে নিতে পারে না।

ইংরেজ জাতির কাছে মিউজিয়ামের যত অধিক গুরুত্ব রয়েছে তত গুরুত্ব অন্য জাতির কাছে নাই। এই কারণে পৃথিবীর অন্য কোথাও এত সংখ্যক মিউজিয়াম নেই যত সংখ্যক আছে লণ্ডন শহরে। তো যারা দ্বীনী মাদরাসাগুলোর পক্ষে এই বলে ওকালতি ও সুপারিশ করে যে, এই মাদরাসাগুলোকে প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন স্বরূপ মিউজিয়ামরূপে টিকিয়ে রাখা দরকার তাদের এই কথাকে অন্ততপক্ষে আমি গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত নই। আমি মনে করি, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব মুঙ্গেরী যে মতাদর্শের ওকালতি করেছিলেন এবং যে জন্য নাদওয়াতুল উলামা এবং দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যে মতাদর্শের সাথে আমাদের সকলেই সম্পৃক্ত তার ভিত্তি কখনই এর উপর ছিল না। এটা দয়া কিংবা অনুকম্পা ভিক্ষা নয়। কোনরূপ করুণা প্রার্থনা নয়। এরূপ নয় যে, শহরে জনবসতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে স্থান সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করা সত্ত্বেও, গৃহ নির্মাণের জন্য স্থানাভাব প্রকট হওয়া সত্ত্বেও কিছু স্থান তো কবরস্থানের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। তদ্রূপ মাদরাসার জন্যও কিছু জায়গা না হয় ছেড়ে দেওয়া হল, তাতে আপনাদের ও শহরবাসীদের কিইবা আসে-যায়। মাদরাসা সম্পর্কে এইরূপ ধারণা পোষণ এবং মাদরাসাকে এইরূপ পর্যায়ে অবনমনকে অন্ততপক্ষে আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি না।

মোটকথা, একদল তো ধারণা পোষণ করে যে, এই মাদরাসাগুলো তাদের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার যোগ্যতা তাদের অবশিষ্ট নেই। এখন শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে এগুলোকে টিকিয়ে রাখা যায়।

আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে, প্রথমত আমি মাদরাসার এই পজিশনকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। দ্বিতীয়ত পৃথিবীতে কোন কিছু যদি এই পজিশনে চলে আসে, কোন কিছু যদি নিজের জন্য এই পজিশনকে গ্রহণ করে নেয়, তবে তার অস্তিত্ব রক্ষার সুযোগ বেশি একটা থাকে না। কবরস্থানকে বর্তমানে কিছু লোক যদি টিকিয়ে রাখেও, তবে ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখবে না। আপনারা দেখুন, দিল্লীতে খাজা বাকী বিল্লাহর কবরস্থান কত বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ছিল। যারা তাঁর কবরস্থান দেখেছেন তাঁদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। আমি যখন প্রথম দিল্লী যাই তখন তাঁর কবরস্থানটিকে দেখেছিলাম বিস্তীর্ণ এক ময়দানরূপে। হাজার হাজার কবর সেখানে ছিল। কিন্তু এখন সেসব কবরের কোন চিহ্ন নেই। এখন শুধু খাজা বাকী বিল্লাহর মাজার এবং তৎসংলগ্ন সামান্য কিছু জায়গা অবশিষ্ট রয়েছে। অবশিষ্ট সব জায়গায়ই আবাদ হয়ে গেছে। এর কারণ হল, শহরের প্রয়োজন। শহরের বিভিন্ন প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পায়। শহরের প্রয়োজনকে জীবন জগতের অতি বাস্তবতা বলে মনে করা হয়। আর কবরস্থানজাতীয় বিষয়গুলোকে নিছক বিবেচনাযোগ্য বিষয় বলে মনে করা হয়, যা বাস্তবতার মোকাবেলা করতে পারে না। অতএব প্রথমত মাদরাসাগুলোর বর্ণিত পজিশন যথাযথ নয়। দ্বিতীয়ত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এইসব বিষয়গুলোকে চলমান ও বাস্তবমুখী জীবন—যে জীবন কোন কিছুকে গ্রহণ করে নিতে এবং নিজের অংশ থেকে তাকে কোন অংশ দিতে প্রস্তুত নয়—খুব বেশি দিন বরদাশত করে না, বেশি দিন টিকে থাকতে দেয় না।

শুধু প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভর করে

কোন প্রতিষ্ঠান জীবিত থাকতে পারে না

পৃথিবীতে কোন প্রতিষ্ঠানই শুধু এই কারণে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না যে, তা আজ থেকে শত বা দ্বিশত বর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর তা এই এই কল্যাণকর কাজ করেছে। শুধু ইতিহাসের উপর ভর করে, শুধু ইতিহাস চর্চণ করে কোন প্রতিষ্ঠান, কোন দর্শন, কোন মতাদর্শ না টিকে থেকেছে, না টিকে থাকবে। আপনি যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তার প্রতি মানুষের সুদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানটির শুধু অতীত ইতিহাস তুলে ধরেন আর বলেন যে, প্রতিষ্ঠানটি অতীতে এই এই কল্যাণমূলক সেবা প্রদান করেছে, তাহলে মানুষ তাতে

আদৌ কর্ণপাত করবে না। আজ যদি কেউ নীরবও থাকে তবে ভবিষ্যতে কোনদিন তার ভিতর থেকে জোরালো ও শক্তিশালী দাবি উত্থাপিত হবে যে, প্রতিষ্ঠানটিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া উচিত।

মহাজগতের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় আল্লাহ তাআলার যে চিরন্তন রীতি অব্যাহতভাবে কার্যকর রয়েছে তা আমরা কুরআন কারীম ও ইতিহাস অধ্যয়ন করে জানতে পারি। সে রীতি হল— অধিকতর কল্যাণকর বস্তুর বিদ্যমানতা ও অব্যাহত অস্তিত্বের রীতি। অর্থাৎ যা অধিকতর কল্যাণময় তাই অব্যাহতভাবে অস্তিত্বশীল থাকে। অবশ্য বর্তমান পৃথিবী যে নিয়ম ও রীতির কথা বলে তা হল যোগ্যতর বস্তুর অস্তিত্বশীলতার রীতি। অর্থাৎ যে বস্তু অধিকতর যোগ্য তাই অব্যাহতভাবে অস্তিত্বশীল থাকে। এই রীতিকে বলা হয় Survival of the fittest। কিন্তু বস্তুতপক্ষে কুরআন কারীম দ্বারা যা জানা যায় তা হল ‘কল্যাণকর বস্তুর অব্যাহত অস্তিত্বশীলতা’ রীতি। স্পষ্ট ভাষায় কুরআন কারীমে রীতিটির কথা ব্যক্ত হয়েছে। আপনারা আয়াতটি বহুবার পড়ে থাকবেন এবং তার তাফসীরও দেখে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

‘যা ফেনা ও জঞ্জাল তা ভেসে চলে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে তা জমিতে থেকে যায়।’ (সূরা রাদ ১৭)

যে বস্তুতে কোন কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা নেই, যার মধ্যে কোন পয়গাম ও বার্তা নেই, যা কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে না, মানুষের অস্তিত্ব, উৎকর্ষ লাভ, মানুষের উন্নতি যার উপর নির্ভরশীল নয় কুরআন মাজীদ তাকে زبد (ফেনা ও জঞ্জাল) বলে আখ্যায়িত করেছে। শব্দটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও গভীর তাৎপর্যবহ। زبد বলা হয় ফেনাকে। অর্থাৎ সাগরের ঐ ফেনা যার মধ্যে অস্তিত্বের কোন উপাদান নাই, স্থিরতা ও দৃঢ়তার কোন যোগ্যতা নাই। তা সাগরের উত্তালতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, উত্তালতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যা সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে স্থায়িত্ব থাকে না। ফুলে ফেঁপে ওঠা এক বস্তু, যার মধ্যে শুধু বাতাস পূর্ণ থাকে অথবা বলা যায়, ফেনা হল নিচের জঞ্জাল ও আবর্জনা যা বৃষ্টির পানির উপর ভেসে ওঠে। অতঃপর ভেসে যায় কিংবা কোন জায়গায় যেয়ে কোন কিছুতে আটকে যায়। তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ সাধনের কোন উপাদান বিদ্যমান থাকে

না। তার অস্তিত্ব স্থায়ী হয় না। কারণ তার মধ্যে অস্তিত্বের স্থায়িত্বের কোন যোগ্যতা নাই। আল্লাহ তাআলার প্রতিপালন নীতি তার অস্তিত্বের স্থায়িত্বকে অনুমোদন দেয় না। কারণ এই জগতের ঠিক ততটুকু ব্যাপ্তি ও উদারতা নেই যতটুকু থাকলে যাবাদ বা ফেনার অস্তিত্ব বহাল থাকার সুযোগ হতে পারত। যদি সাগরের ফেনা বা পতিত বৃষ্টির সঞ্চিত পানির উপরিভাগের জঞ্জালের অস্তিত্বও বহাল থাকত, তাহলে কল্যাণকর অনেক কিছুর অস্তিত্ব বহাল থাকা মুশকিল হয়ে যেত। কল্যাণকর বস্তুর অস্তিত্ব বহাল থাকার সুযোগ হতো না।

তো আমাদের মাদরাসাগুলো যদি নিজেদের অস্তিত্বকে বহাল রাখতে চায়, জীবন জগতে নিজের জন্য স্থান সৃষ্টি করে নিতে চায়, জীবনের অধিকার প্রমাণ করতে চায় তাহলে তার নিজের মধ্যে মানুষের কল্যাণ সাধনের উপযোগিতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে, জীবন জগতের জন্য মাদরাসা নামক প্রতিষ্ঠানও অপরিহার্য, মাদরাসা ব্যতীত মনুষ্য জীবন অকার্যকর, অচল। কারণ যুগ যে ভাষাকে বোঝে এবং প্রত্যেক যুগেই যে ভাষা বুঝে এসেছে সে ভাষার জন্য ভাষাকারের দরকার নেই। আপনি যদি আরবীতে বলেন, তাও যুগ বুঝে নেবে, ইংরেজীতে বললেও বুঝে নেবে, নীরব ভাষাতে বললেও বুঝে নেবে। একজন বোবাও যদি তা বলে এবং প্রকাশ করে যুগ তাও বুঝে নেবে। যুগ যে ভাষাকে বোঝে তা হল কল্যাণের ভাষা, উপকারীর উপকারিতার ভাষা, জীবন-অধিকারের ভাষা। ইকবাল যেমনটা বলেছেন, জীবন হল অধিকারের নাম। উপযোগিতার নাম। জীবন কারও অনুকম্পা নয়, জীবন অর্জনের বিষয়। তা অর্জন করে নিতে হয়। আপনি জীবন-অধিকার, জীবন-উপযোগিতা সৃষ্টি করুন। সমগ্র জগত তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে। দুই দুইটি বৃহৎ যুদ্ধের পরও জার্মানী তার অস্তিত্ব হারায়নি, কারণ সে তার উপযোগিতার প্রমাণ দিয়েছে। ফলে কেউ তাকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি। অনেক জাতিই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক জাতিই বার বার পরাজিত হয়েও টিকে আছে। মুসলমানরা তাতারীদের বর্বর হামলার শিকার হয়েছিল। তাতারীরা মুসলমানদের মধ্যে যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল, বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই ঐরূপ গণহত্যার শিকার কখনও হয়নি। কিন্তু যেহেতু মুসলিম জাতির মধ্যে ما ينفع الناس (যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে)-এর উপাদান মওজুদ ছিল, তারা একটি আদর্শের ধারক ছিল, তাদের মধ্যে ছিল জীবন জগতের জন্য প্রাণবন্ত পয়গাম ও বার্তা; তাই তারা পুনরায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিল। তাদের সামনে তাতারীরা অবশেষে অবনত হতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে মুসলমানরা তাতারীদের তরবারীর

নিচে শির দিয়েছে, তাদের কাছে পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের কল্যাণ-সাধন-গুণের সামনে, তাদের আদর্শ ও পয়গামের সামনে তাতারীদের তরবারীকে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে অবনত হতে হয়েছে।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আজ আমাদের দ্বীনী মাদরাসাসমূহের জন্য পথ একটিই। আর তা হল জীবনের অধিকার প্রমাণ করা। নিজেদের স্বাভাব্য প্রমাণ করা। এটা প্রমাণ করা যে, মাদরাসাগুলো না থাকলে মানবজীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে অথবা জীবন হবে ক্ষয়প্রাপ্ত কিংবা সৃষ্টি হবে বিশাল শূন্যতা, যে শূন্যতা আর কোন কিছু পূরণ করতে পারবে না। অনুকম্পা লাভের আবেদন পৃথিবীতে না কখনও গৃহীত হয়েছে, না তা গৃহীত হওয়ার মত বিষয়। যুগ তো সংখ্যাগরিষ্ঠদের। সংখ্যাগরিষ্ঠতাও এইরূপ যে, তা কমিউনিজমের মত অখাদ্যকে গলাধঃকরণ করেছে। সুতরাং এখন একথা বলার আদৌ কোন অবকাশ নেই যে, ভাই! আমাদেরকে তো অমুক শাসক উচ্ছেদ করেনি। আমাদেরকে রেখে দিয়েছিল, অমুক যুগে আমরা টিকে ছিলাম। অতএব আপনারাও আমাদেরকে রেখে দিন। তদ্রূপ একথা বলারও কোন সুযোগ নেই যে, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আমাদেরও টিকে থাকার অধিকার আছে। এই জাতীয় করুণা ভিক্ষাকে দুনিয়া এখন পাত্তা দিতে রাজী নয়।

বরং আপনারা প্রমাণ করুন যে, আপনারা এমন এক ময়দানে ও ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন, জীবন জগতের জন্য প্রয়োজনীয় এমন স্থানে আপনাদের অবস্থান যে স্থান আপনারা ত্যাগ করলে তাকে সামাল দেওয়ার মত আর কেউ নেই। আপনারা প্রমাণ করুন যে, চারিত্রিক গুণাবলীর ময়দানে আপনাদের বিচরণ। আপনারা জনসেবার ময়দানে অবস্থান করছেন, আপনারা জ্ঞানের উচ্চমার্গে অবস্থান করছেন, আপনারা জ্ঞান গবেষণার ময়দানে অবস্থান করছেন। প্রমাণ করুন, আপনারা যদি ঐ ক্ষেত্রগুলো থেকে সরে আসেন বা আপনাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে জীবন জগতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেই শূন্যতাকে না কোন বিশ্ববিদ্যালয়, না কোন জ্ঞানকেন্দ্র, না কোন একাডেমী পূরণ করতে পারবে, না অন্য কোন প্রচেষ্টা সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে। এটাই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সেই চিরন্তন রীতি, যা কুরআন কারীমে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—

فَإِذَا زُرِدَتْ فِئْزَهُبْ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ

يُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

‘যা ফেনা ও জঞ্জাল তা ভেসে চলে যায়, আর যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে তা থেকে যায়। এইভাবেই আল্লাহ উপমা বর্ণনা করেন।’ (সূরা রাদ ১৭)

প্রথম কথা তো এই যে, বর্তমানে আমাদের মাদরাসাগুলো শুধু মুসলমানদের আবেগ, তাদের দীনপ্রিয়তা, ইসলামের প্রতি তাদের ভালবাসা, দীন ও শরীয়তের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ অথবা কিছু আলেমের ত্যাগ ও কুরবানী বা কিছু আলেমের বুয়ুগী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে টিকে থাকতে পারবে না। একথা বলতে আমার অত্যন্ত যাতনা বোধ হচ্ছে, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি কথাটা বলছি, কিন্তু তবুও কথাটি এই প্রতিষ্ঠানের প্রিয় ছাত্রদের সামনে প্রকাশ হওয়া উচিত বলে মনে করছি। কারণ, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা যুগের গতিবিধি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনিই তাঁর যুগে সর্বপ্রথম এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন যে, যুগ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, যুগের বৈধ পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত এবং যুগের জন্য নিজেদের কল্যাণকর বলে প্রমাণ করা উচিত।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুন্সেরীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুন্সেরী (রহ.)কে আপনারা তরীকতের একজন শায়খ বলে জানেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন উঁচুস্তরের একজন শায়েখে তরীকত ছিলেন। ছিলেন বড় মাপের ছাহেবে নিসবত একজন বুয়ুর্গ। তাঁর সমকালীন বুয়ুর্গগণও একথার সাক্ষ্য দান করেছেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব (রহ.) যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত উচ্চমানসম্পন্ন। তিনি বলেছেন, তাঁর উচ্চতা পর্যন্ত পৌছা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তার সঙ্গে আমি আরেকটু যোগ করে বলতে চাই, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দান করেছিলেন, যে বিশুদ্ধ চেতনা ও উপলব্ধি দান করেছিলেন, যে নূর দান করেছিলেন তা লাভ করার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। আল্লাহ তাআলা যাকে দিয়ে কাজ নিতে চান কেবল তাঁকেই এই জাতীয় গুণাবলী দান করেন। ইকবাল যা বলেছেন আমি তাঁকেই তার মূর্তপ্রতীক বলে মনে করি।

و صد دانادرین مخفی سخن گفت

سخن نازک تر از برگ سخن گفت

ولے با من بگو آں دیدہ در کیست

کہ خارے دیدہ و احوال چمن گفت

এই মাহফিলে (তথা দুনিয়ার এই আসরে) দু'শ জ্ঞানীপণ্ডিত বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁরা চামেলীর পাপড়ির চেয়ে অধিক কোমল বক্তব্য পেশ করেছেন কিন্তু আমাকে বল, সেই চক্ষুস্থান ব্যক্তি কে, যিনি কাঁটা দেখে বাগানের অবস্থা বলে দিয়েছেন?

নাদওয়াতুল উলামার আন্দোলন

চূড়ান্ত ধ্বীনী দূরদর্শিতার পরিচায়ক

নাদওয়াতুল উলামার আন্দোলন কোন সাধারণ আন্দোলন নয়। এটা ছিল ঐ যুগে ধ্বীনী দূরদর্শিতার নিদর্শন। আমি আপনাদেরকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুন্সেরী (রহ.)-এর ছাত্র গণ্য করে আপনাদের সামনে কথা বলছি। জামেয়া রাহমানিয়া বা নাদওয়াতুল উলামা নয়, আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুন্সেরী (রহ.)-এর শিক্ষাশালার ছাত্র মনে করে আপনাদের সামনে এবং নাদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের সামনে কথা বলি। দুই তিন দিন পূর্বে আমি নাদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের সামনে কথা বলেছি আর আজ আপনাদের সামনে বলার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

করার মত দুটি কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী ভাইয়েরা!

আপনারা দুইভাবে আপন উপযোগিতা প্রমাণ করতে পারেন এবং নিজেদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারেন, জীবনের অধিকার সৃষ্টি করতে পারেন।

এক. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মাধ্যমে।

দুই. বহির্জগতে কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমে।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র হল- আপনারা জ্ঞান-গরিমায় পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা অর্জন করুন। কথাটি আমি একজন এরূপ বিশ্ব পর্যটক হিসাবে বলছি যার বিশ্ব পর্যটন সম্পর্কে মানপত্রও ইঙ্গিত করা হয়েছে, হযরত আমীরে শরীয়তও বলেছেন। এটা আত্মপ্রশংসা নয়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বার বার বহির্দেশে গমনের সুযোগ আমার হয়েছে। শুধু গমন নয় বরং সেসব দেশের ঐসব মজলিসেও অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য যেসব মজলিস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বহির্দেশের এই জাতীয় কোন কোন

প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কথাটি আমি এজন্য বললাম, যাতে আপনারা আমার এই আহ্বান ও অনুরোধকে মূল্যায়ন করেন। এটা কোন পথচারীর কথা নয় বরং এটা এমন এক ব্যক্তির কথা, যে ব্যক্তি ঐ সকল মজলিসে অংশগ্রহণ করেছে এবং পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে ঘুরে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আপনারা ইলম ও জ্ঞানে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করুন। যে কোন জ্ঞানই হোক তাতে পূর্ণাঙ্গতা অর্জনই কেবল আপনাদের জন্য কল্যাণকর। আপনারা যদি হতাশার শিকার হন এবং মনে করেন যে, আমরা যদি আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করি, দ্বীনী ইলমে যোগ্যতা অর্জন করি তাতে আমাদের কী লাভ হবে? জঙ্গলে ময়ূরের নাচ কে দেখতে যায়? আমাদের এই দক্ষতার মূল্যায়ন কে করবে? আমি বলব, আপনাদের এইজাতীয় চিন্তা আপনাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। আমি আপনাদেরকে বলছি, এখান থেকে নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্ত, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র আপনাদের এই ইলমের কদর ও মর্যাদা আছে। সর্বত্র এর মূল্যায়ন আছে। তবে শর্ত একটাই। তা হল পূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা কাকে বলে? কয়েকটি শব্দ শিখে নেওয়ার নাম পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা নয়। **بد** আর **شد** এবং **كان** আর **يكون**-এর নাম নয়। আপনি আরবী পড়তে পারেন এবং তা বুঝতে পারেন এতটুকুকে কেউ পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা বলে না। পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা তো বলে তাকে, যা অন্যের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারে, শত্রুও যে যোগ্যতার স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য হয়।

আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে বলতে পারি, যুগ-পরিবর্তনের ধূয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যারা বলে, 'যুগ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, আর তোমরা সেই পিছনেই পড়ে আছ, তোমরা কোথায় তোমাদের সময়ের অপচয় করছ? আরে ভাই! কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়তে, বিজ্ঞান পড়তে, ইংরেজী পড়তে, অর্থনীতি নিয়ে পড়তে, ফিজিক্স পড়তে, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করতে ইত্যাদি ইত্যাদি; তারা প্রকৃতপক্ষে ধোকা দিচ্ছে। এসব কথা খাম-খেয়ালিমূলক ও নির্বুদ্ধিতাসুলভ বৈ নয়। আপনি যে কোন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা অর্জন করুন, নিজেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে গড়ে তুলুন। দেখবেন, অতঃপর আপনার এই অভিযোগ থাকবে না যে, যুগ আমাদেরকে পাস্তা দিচ্ছে না, আমাদের জন্য কোন জায়গা নেই। দ্বীনী শিক্ষার যে অবমূল্যায়ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তা অযোগ্যতার কারণেই।

ইউনানী চিকিৎসা ধারার অবলুপ্তি ঘটেছে যোগ্য চিকিৎসকের অভাবে

অন্য কোন উদাহরণ পেশ করলে বুঝতে হয়তো সমস্যা হত। দেখুন, এক কালে সারা ভারতবর্ষে ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থার জয়-জয়কার ছিল। জায়গায় জায়গায় হেকিমখানা ছিল। হিন্দু, মুসলমান, মুর্খ, জ্ঞানী নির্বিশেষে সকলেই হেকিম সাহেবদের শরণাপন্ন হত। তাদের হেকিমখানাগুলোতে সব সময় ভীড় লেগে থাকত। আপনারা কি বলবেন, সেই ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থার পতন ঘটেছে এ্যালোপ্যাথি এসেছে বলে? হোমিওপ্যাথি এসেছে বলে? নতুন নতুন মেডিসিন এসেছে বলে? আমি এটা মানি না। প্রকৃতপক্ষে হেকিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার পতন ঘটেছে পূর্বের ন্যায় যোগ্য হেকিম সৃষ্টি হচ্ছে না বলে। বর্তমানে স্বভাবজাত মেধাবী, প্রতিভাবান ও সৃজনশীল মেধার অধিকারী চিকিৎসক সৃষ্টি হচ্ছে না। যদি সেই রকম হেকিম ও চিকিৎসক তৈরি হয়, তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, তাদের নিকট এ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা পর্যন্ত যাবে। এটা অতিশয়োক্তি নয়। আপনাদের শহরের সিভিল সার্জন তার কাছে যাবে। যখন তার নিজের চিকিৎসা ব্যবস্থায় তার রোগমুক্তি ঘটছে না তখন বেচারার কী করবে? আমি জালিনুস ও বাকরাতের ন্যায় ব্যক্তির কথা বলছি না। আমি হেকিম আবদুল আলী, হেকিম আজমল খান সাহেবের নাম উল্লেখ করতে চাই। হেকিম মাহমুদ খানের নাম উল্লেখ করতে চাই। তাদের সমপর্যায়ের না হলেও অন্তত যদি তাদের অর্ধেক যোগ্যতার অধিকারী হেকিম এই যুগে জন্ম নেয় তবে ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থার অবলুপ্তির কিসসা খতম হয়ে যাবে। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা পুনরায় তার জৌলুস ফিরে পাবে। বোঝা যাবে যে, চিকিৎসা ব্যবস্থাটি এখনও জীবিত আছে। আসল ব্যাপার হল আগেকার যুগে দরসে নেজামীতে লেখাপড়া শেষ করে মানুষ হেকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে যেত। যত বড় বড় আলেম ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করেছেন। অবশ্য হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কথা আমার জানা নেই। তাঁদের কেউ কেউ এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এরূপ মেধাবী ও যোগ্য ছিলেন যে, হাতের নাড়িতে হাত রেখেই রোগীর সকল রোগের সন্ধান পেয়ে যেতেন।

মাদরাসার অবস্থাও তদ্রূপ

আমাদের দ্বীনী ইলমের অবস্থাও তদ্রূপ। আপনি কোন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করুন, স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। পৃথিবী আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলে

মেনে নেবে। জীবন-জীবিকার সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। মাদরাসাগুলোর যে সঙ্কট বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা দূরীভূত হবে। আমাদের হীনমন্যতা, অলসতা এবং কাজে ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতার ফলেই আজ যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমাদের মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেবের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকবে নিশ্চয়ই। তিনি নাদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলুম দেওবন্দ উভয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ রোকন। তিনি দেখে থাকবেন, কী ধরনের আলেম এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় থেকে বের হচ্ছে। দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষার্থী, অথচ ইবারত বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে না।

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى ما نوى

এই প্রথম হাদীসটিই বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারে না। তরজমা করে ভুল। এই জাতীয় আলেমই কয়েক বৎসর যাবৎ বের হচ্ছে। আমার ধারণায় গত বিশ বৎসর যাবৎ এই অবক্ষয় স্পষ্টভাবে দৃশ্যগোচর হচ্ছে। অথচ এই জাতীয় আলেমরাই অভিযোগ করে যে, যুগ এখন আমাদের নেই। আমাদের পিতা-মাতা মাদরাসায় পড়িয়ে আমাদের জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। আমি বলছি যে, আজও এরূপ ব্যক্তি আছেন যিনি কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন আর যেখানে আছেন সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে আছেন। অতএব যদি কেউ কোন বিষয়ে যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করে নেয় তবে অর্থনৈতিক সঙ্কট সহ তার সব ধরনের পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। যদি কারও ক্ষেত্রে এরপরও অর্থনৈতিক সঙ্কট ও পেরেশানীর বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় তবে বুঝতে হবে তার মধ্যে অন্য কোন পারিপার্শ্বিক দুর্বলতা বিদ্যমান। কিছুক্ষণ পূর্বে মাওলানার মজলিসে আমি বলছিলাম যে, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে আমি দারুল উলুম মাজাহিরুল উলুমে বয়ান করেছি। সেখানে আমি বলেছিলাম যে, কোন যোগ্য ও পণ্ডিত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি তোমরা শোন অথবা ইতিহাসে পাঠ কর যে, তিনি জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর মূল্যায়ন কেউ করেনি, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস কর যে, তাঁর মধ্যে কোন দুর্বলতা ছিল, তাঁর মধ্যে কোন ধরনের পাগলামী ছিল, তাঁর নাক উঁচু ছিল, তাঁর মধ্যে অহংকার ছিল, গালিগালাজ করত, দুর্ব্যবহার করত ইত্যাদি কোন না কোন মন্দ স্বভাব তাঁর মধ্যে ছিল। ফলে মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। নতুবা আমি এটা মানি না যে, কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি— যিনি সু-স্বভাবের অধিকারী, সঙ্গতিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের অধিকারী— ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছেন, তাঁর কেউ মূল্যায়ন করেনি।

প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রমের অভাব

আমি আরও একটা কথা বলতে চাই। কথাটা আমার মত ব্যক্তির মুখ থেকে শুনলে আপনারা অবাক হবেন বৈ কি! আপনারা জানেন, আমাদের নাদওয়াতুল উলামার ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে পাঠ্যসূচি সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে। এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব (রহ.) প্রাচীন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করেই বিশাল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। প্রাচীন পাঠ্যসূচিও যে পণ্ডিত ও যোগ্য আলেম তৈরি করতে পারে তিনি ছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনিই ছিলেন পাঠ্যসূচি সংস্কারের প্রবক্তা ও উদ্যোক্তা। আমরা পাঠ্যসূচি সংস্কারের পক্ষপাতি। মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেবও এর সমর্থক। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই— আসল বিষয় পাঠ্যসূচি নয়। বরং আসল বিষয় হচ্ছে মেহনত ও সাধনা এবং শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদান। প্রাচীন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করেও এসব ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছেন নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করে যাদের ন্যায় ব্যক্তিত্ব এখন তৈরি হচ্ছে না। তাহলে বিষয়টা কী? সমস্যা কোথায়? অথচ এটা যথোচিত সত্য যে, প্রাচীন পাঠ্যসূচির তুলনায় নতুন পাঠ্যসূচি অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ।

যে যুগে نفحة اليمن এবং مقامات حریری পড়ানো হত এবং এতদপেক্ষা গদ্য সাহিত্যের আর কোন উত্তম কিতাব ছিল না, যার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের বিশুদ্ধ ও উন্নত রুচি সৃষ্টি হতে পারত, মনের ভাব প্রকাশের যথোপযুক্ত যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারত তখন তো এইরূপ বড় বড় ব্যক্তি তৈরি হয়েছেন যাঁরা অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আল্লামা যাবিদী সৃষ্টি হয়েছেন, মাওলানা গোলাম আলী বুলগেরামী সৃষ্টি হয়েছেন, শায়খ মুহসিন বিন ইয়াহইয়া সৃষ্টি হয়েছেন, নবাব সিদ্দীক হাসান খান সৃষ্টি হয়েছেন, মাওলানা সদরুদ্দীন আযুরদাহ সৃষ্টি হয়েছেন। আর আজ গদ্য সাহিত্যের চমৎকার সব কিতাব পড়ানো হচ্ছে কিন্তু সেই রকম ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না। পাঠ্যসূচিই যদি এক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করত তাহলে ঐরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য ছিল। আমাদেরকেই দেখুন। মাওলানা মাসউদ আলম নদভী সাহেব আমাদের সঙ্গী ছিলেন, বন্ধু ছিলেন। তিনি আরবী সাহিত্যে অত্যন্ত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি পড়েছিলেন কী? এই মাকামাতে হারীরী ইত্যাদি গ্রন্থই পড়েছিলেন। আমিও ছাত্র জীবনে মাকামাতে হারীরী পড়েছি। অন্যান্য কিতাবও পড়েছি। আসলে এক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দের মেহনতের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। সঙ্গে ছিল ছাত্রদের মেহনত ও অক্লান্ত পরিশ্রম। পাঠ্যগ্রন্থ শুধু সহায়ক ছিল মাত্র। আমি এখনও পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের পক্ষে। তবে শুধু পাঠ্যসূচি পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের পরিশ্রম অত্যাवश्यक।

আসল কথা

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! আসল ব্যাপার হল আপনারা মেহনত ও পরিশ্রম ত্যাগ করেছেন। আপনাদের মধ্যে তীব্র আকাজ্জকা নেই, প্রতিযোগিতার স্পৃহা নেই। আপনারা কোন কিছুতে যোগ্যতা অর্জন এবং নিজের মধ্যে শিক্ষকতার শক্তি সৃষ্টি করণকে গর্বের বিষয় বলে মনে করেন না। অথচ আমাদের পূর্বসূরীগণ মুদাররেসী ও শিক্ষকতার মোকাবেলায় বাদশাহী গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। শিক্ষকতাকে তাঁরা এরূপ সম্মানজনক পেশা বলে গণ্য করতেন যে, মন্ত্রীত্বকেও পায়ে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। কেউ কেউ এরূপ ছিলেন যে, তিনি মন্ত্রী অথচ শিক্ষকতাও করতেন। লান্স্লেটে মন্ত্রী আসাফদৌল্লার যুগে, সাআদত আলী খানের যুগে দিনে তাঁরা মন্ত্রণালয়ের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, রাতে শিক্ষকতা করতেন। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আপনারা পাবেন। আল্লামা তাফাজ্জুল হুসাইন নামে ইলমে রিয়াজীর (গণিতশাস্ত্র) একজন পণ্ডিত আলেম ছিলেন। তিনি মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদান কার্য এরূপভাবে করতেন, মনে হত তিনি শুধুই শিক্ষক। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অথচ আমাদের ও আপনাদের দৃষ্টিতে শিক্ষক হওয়া গর্বের বিষয় থাকেনি। বরং আমরা শিক্ষক হতে লজ্জাবোধ করি। যা হোক প্রথম কথা হল, আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করুন, যোগ্যতা সৃষ্টি করুন, কোন এক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করুন।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আজ মাদরাসাসমূহে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা, যাকে ক্রাইসিস বা সঙ্কট বলা চলে তা হল মুদাররিস সমস্যা। আজ মুদাররিস বা শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বসে আছি, কয়েকটি বিষয়ের দুই-তিনজন শিক্ষক আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু আমরা শিক্ষক পাচ্ছি না। দারুল উলূম দেওবন্দ শায়খুল হাদীস পাচ্ছে না। এটা এখন আর গোপন বিষয় নয় যে, দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস সমস্যার যথোপযুক্ত সমাধান হয়নি। হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের একজন শক্তিশালী রোকন। শায়খুল হাদীস সমস্যার সমাধানকল্পে গঠিত বিশেষ কমিটির তিনি একজন সদস্য। সমস্যাটির যে সমাধান করা হয়েছে তিনি তাতে সন্তুষ্ট নন। আমিও সন্তুষ্ট নই। কেউই সন্তুষ্ট নয়। অর্থাৎ দারুল উলূমের মান অনুযায়ী সমস্যাটির সমাধান হয়নি। কোন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এইজন্য আমি বলছি এই কাজটি আপনারা করুন। আপনারা আদৌ এটা ভাববেন না যে, আপনারা অখ্যাত এক কোণে পড়ে আছেন। দেওবন্দে পড়ছেন না বা নাদওয়াতুল উলামায় পড়ছেন না— এই সঙ্কোচবোধ যেন

আপনাদের না থাকে। এখানে থেকেই আপনারা যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করুন। দেওবন্দ আপনার মুখাপেক্ষী হবে। নাদওয়াতুল উলামা আপনাকে তালাশ করবে, আপনাকে পেতে চাইবে। আমি আপনাদেরকে লিখে দিতে পারি, আপনারা কোন বিষয়ে যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করলে দেওবন্দে আপনারদের জন্য স্থান সংরক্ষিত, নাদওয়াতুল উলামায় আপনারদের জন্য জায়গা সংরক্ষিত।

দ্বীনী যোগ্যতাও অর্জন করুন

আরেকটি কথা হল, জ্ঞান-গরিমায় যোগ্যতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে দ্বীনী যোগ্যতাও সৃষ্টি করুন। আপনার মধ্যে উলামায়ে রব্বানীর কিছু গুণাবলী সৃষ্টি হোক। ঐ সকল বুয়ুর্গের চারিত্রিক গুণাবলীর ঝলক আপনার মধ্যে সৃষ্টি হোক। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.) ও তাঁর সমকালীন সঙ্গী বুয়ুর্গগণের মধ্যে যে চারিত্রিক গুণাবলী ছিল। আপনার মধ্যে সৃষ্টি হোক আত্মমর্যাদাবোধ, সৃষ্টি হোক আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক। ইবাদতে কিছুটা রঙ ধরুক। সাধারণের তুলনায় আপনার সার্বিক মান কিছুটা উন্নত হোক। অতএব বিষয় দুইটি।

এক. জ্ঞানগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন।

দুই. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক। অর্থাৎ উলামায়ে রব্বানীর যে বৈশিষ্ট্য তা আপনার মাঝেও সৃষ্টি হোক। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হত। আখেরাতের কথা নতুন করে স্মরণ হত এবং অন্তর বিগলিত হত, হৃদয়ে এক প্রকার উত্তাপ ও দাহ সৃষ্টি হত। আল্লাহর প্রেম জাগরিত হত। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যেও কিছুটা থাকা উচিত।

অতঃপর কর্মজীবনে দুইটি কাজ আপনাদেরকে করতে হবে। প্রথম করণীয় সম্পর্কে আমি যা বলব তা এইজন্য নয় যে, এখানে আমীরে শরীয়ত এবং শরয়ী আইন-কানুন বাস্তবায়ন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত আছেন। আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই কথাটি বলছি। المستشار مؤتمن যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তার দায়িত্ব হয় বিশ্বস্ততার সাথে পরামর্শ দান। আপনারা যখন আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন, আমার প্রতি আপনারা আস্থা রেখেছেন তখন যা বলব তা আন্তরিকতার সাথেই বলা উচিত। তাই আমি বলছি, আপনারা কমপক্ষে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে শরয়ী বিধি-বিধান ব্যবস্থার প্রসার ঘটান। প্রদেশের সর্বত্র এর জাল বিছিয়ে দিন। কোন গ্রাম, কোন পাড়া, মহল্লা যেন এই ব্যবস্থার আওতাবহির্ভূত না থাকে। এটা আপনাদের এই প্রদেশের জন্য বিরাট নেয়ামত।

বিহারবাসীদের কোন বিষয়ে আমার যদি ঈর্ষা হয় তাহলে তা এই বিষয়ের উপরই। এখানে ঈর্ষাযোগ্য অনেক বৈশিষ্ট্যই যে আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঈর্ষা হয় এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিরাট নেয়ামত দান করেছেন। এখানে শরয়ী আইন-কানুন বাস্তবায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকেরা এর মূল্য বুঝতে পারছে না। আবার কিছু লোক এই ব্যবস্থাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছে। আমি আজ ট্রেনে বলছিলাম, আমি বুঝতে পারি না আমাদের এই অবহেলা কেন? আমাদের বড়দেরকে কিয়ামতের ময়দানে শরয়ী শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত জীবন যাপনের বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কোন শাসনব্যবস্থা ছিল না। এতদসম্পর্কে যেসব হুঁশিয়ারী হাদীসে উদ্ধারিত হয়েছে তাতে ভীত কম্পিত হতে হয়। তো আপনাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলছি, আপনারা মাওলানা না হলেও বলতাম যে, আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হল, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ সমাপণান্তে এই ইমারতে শরঈয়াহর কাজকে দৃঢ় করা, একে বিস্তৃত করা, প্রদেশের সর্বত্র এর শাখা গঠন করা। উড়িষ্যার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার খুব বেশি জানা নেই। তবে সেখানকার ছাত্রও যদি এখানে থাকে তাহলে বিহার ও উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের ছাত্রদেরকে আমি বলব, উভয় প্রদেশকে এই ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করুন এবং উভয় প্রদেশকে একরূপভাবে এই ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করুন, যাতে প্রদেশ দুটির সর্বত্র সম্পূর্ণ শরয়ী বিধানাবলী অনুযায়ী জীবন যাপিত হয়। এটা আপনাদের প্রথম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর অন্য কোন কর্তব্যকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি না। আপনারা যদি এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারেন তাহলে আপনাদের প্রতি এই মাদরাসার ও জামেয়া রাহমানিয়ার অবদানের ঋণ আপনাদের দ্বারা কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে। সেই সঙ্গে আপনারা জামেয়া রাহমানিয়ার কৃতজ্ঞ ও কৃতি সন্তানরূপে প্রমাণিত হবেন। মাদরাসাসমূহের সন্তানদের মধ্য থেকে আপনারা এক বিশেষ স্থানের অধিকারী হয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় দায়িত্ব হল মজুব প্রতিষ্ঠা। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রতিটি গ্রামে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন বড় বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা এত বেশি দেখছি না। আমি এটাকে সমর্থনও করি না। বরং বড় বেশি প্রয়োজন প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায় মজুব প্রতিষ্ঠাকরণ। যাতে মুসলমানের সন্তানরা দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। তারা যেন হালাল-হারাম, কুফর ও ঈমান, শিরক ও তাওহীদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। আমাদের দেশে বর্তমানে দ্রুতগতিতে কমিউনিজমের প্রসার ঘটছে। আমরা বসে

আছি অথচ সমগ্র ভারত দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। সব কিছুকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা এসেছে। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা এসেছে। ভবিষ্যতে মাদরাসার পালা আসতে পারে। অতএব মক্তবের জাল বিস্তার করুন। মসজিদকে মুসলমানদের জীবনের কেন্দ্রে পরিণত করুন। পরিবর্তনের হাওয়া যেখানে সর্বশেষে এসে পৌঁছবে তা হল মসজিদ। অতএব মসজিদকেই জীবনের কেন্দ্রে পরিণত করুন। কারণ সেখানে পরিবর্তনের বাতাস বিলম্বে পৌঁছবে। হয়তোবা মসজিদ পর্যন্ত এই দূষিত বাতাস পৌঁছতে পৌঁছতে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। অতএব মসজিদকে কেন্দ্র বানান এবং অধিক হারে মক্তব প্রতিষ্ঠা করুন। মক্তব পরিচালনা করুন। এই চিন্তা যেন আপনাকে কখনও পেয়ে না বসে যে, আপনি মাদরাসায় পড়েছেন, উঁচু স্তরের জ্ঞান অর্জন করেছেন আর এখন মক্তবে শিশুদেরকে পড়াচ্ছেন, সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথে আপনাকে মেলামেশা করতে হচ্ছে, আপনার অর্জিত ইলম বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসবের চিন্তা করবেন না। উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজী-খুশি করা এবং ইসলামকে রক্ষা করা। এই দুটি ক্ষেত্রের কথা বললাম।

এক. এখানে লেখাপড়ায় মেহনত করে যোগ্যতা সৃষ্টি করা, জ্ঞান-গরিমায় পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করা। আর বাইরে ইমারতে শরঈয়াহর ব্যবস্থা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা। এই দুটি কাজ আপনি যদি করতে পারেন তাহলে আপনি

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

‘আর যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে তা পৃথিবীর বুকে টিকে থাকে’-এর বাস্তব দৃষ্টান্তে পরিণত হবেন। কোন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হাত, কোন বিপ্লব ও পরিবর্তন আপনাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না, আপনাকে আপনার স্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। সত্য কথা বলতে, আপনার জন্য কোন ইনকিলাব নেই, কোন পরিবর্তন নেই। কারণ আপনি আপনার কল্যাণসাধন যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের মাধ্যমে, দ্বীনের রাস্তায় নিজের কল্যাণকারিতা প্রমাণ করতে পারে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

ان تهلك هذه العصابة لن تعبد

‘এই দলকে যদি তুমি ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত আর কখনও হবে না।’

আপনিও প্রমাণ করে দিন যে, আয় আল্লাহ! তুমি যদি এই শ্রেণীকে ধ্বংস করে দাও তবে পৃথিবীর বুক থেকে তোমার ইবাদতের ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কমপক্ষে হিন্দুস্তান সম্পর্কেই এই কথাটা বলে দিন এবং এর যথার্থতা প্রমাণ করুন; দেখবেন আপনার একটি পশমও কেউ হেলাতে পারবে না।

আমার আবেদন

ভ্রাতৃবৃন্দ! আর কথা নয়। এতক্ষণ যা বললাম আপনারা যদি তা স্মরণে রাখেন তবেই যথেষ্ট। হতে পারে আমার বক্তব্যে আপনারা কোন আবেগ ও উত্তাপের কিছু পেলেন না, গবেষণামূলক জ্ঞানের কোন কথা পেলেন না কিন্তু যা বললাম তা করার মত দুটি কাজ। কাজ দুটি যদি করতে পারেন তবে ইনশাআল্লাহ আজ থেকে দশ বৎসর পরে বুঝতে পারবেন যে, আপনারা এক মহা দুর্গ তৈরি করে ফেলেছেন। দুর্গটি শুধু নিজের জন্য নয় বরং সকল মাদরাসার জন্য এবং দ্বীনী দাওয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের জন্য। পক্ষান্তরে এই কাজ দুটি যদি না হয় তাহলে আমি এই সকল মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। আশঙ্কা করছি, এই সকল মাদরাসার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও এর ব্যবস্থাপনা অদূর ভবিষ্যতে সরকারী ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হয়ে যাওয়ার। আমরা তখন এর মোকাবেলা করতে সক্ষম হব না। কিন্তু আপনারা যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন, এখানে জীবিত থাকার অধিকার আপনাদেরও আছে প্রমাণ করতে পারেন তবে ইনশাআল্লাহ কোন পরিবর্তনের খাবাই আপনাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না, নিশ্চিহ্ন করতে সফল হবে না।

অনুকম্পা লাভের আবেদনের উপর ভিত্তি করে

কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না

এইরূপ কর্মতৎপরতা যদি না থাকে তাহলে শুধু অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দোহাই দিয়ে, শুধু অনুকম্পা ও দয়া লাভের প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে না কোন দল টিকে থাকতে পারে, না কোন জাতি, না কোন প্রতিষ্ঠান, না কোন সংস্থা টিকে থাকতে পারে। আপনারা যদি কোন আহ্বান ও দাওয়াতের প্রতীক্ষায় থেকে থাকেন তাহলে আমার আহ্বান ও দাওয়াত এটাই। আপনারা কোন পরামর্শ লাভের অপেক্ষায় থাকলে আমার পরামর্শ এটাই। এছাড়া আর আমার কিছু বলার নেই।

আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদের যোগ্যতাকে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত করেন। আপনারা বড় সৌভাগ্যবান। আপনারা একজন বড় ব্যক্তিত্বের

আশ্রয়ে আছেন। একটি বড় কেন্দ্রের সাথে আপনারা সম্পৃক্ত। কেন্দ্রটি ইলম ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র, সঙ্গে সঙ্গে ইমারতের সাথেও কেন্দ্রটি সম্পৃক্ত। আমি দুআ করি, আপনারা যেন কেন্দ্রটির তত্ত্বাবধানে পূর্ণ তারবিয়াত লাভ করতে পারেন, উন্নতি করতে পারেন, নিজের যোগ্যতাকে সফলতার চূড়ান্তে উপনীত করতে পারেন এবং নিজের জ্ঞান-গরিমা দ্বারা সমাজ ও জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারেন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

[আজুমান আল ইসলাম খোর্দ, রওয়াকে সুলাইমানীর উদ্বোধনী অধিবেশন ১৪১৩ হিজরীর ২১ শে জিলকদ তারিখে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর সভাপতিত্বে সুলাইমানিয়া হলে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা (রহ.) এই ভাষণটি প্রদান করেন। ভাষণে ছাত্রদেরকে নিজেদের মধ্যে বক্তৃতা ও বয়ানের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করেন।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا
بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও দারুল উলূমের ছাত্রবৃন্দ!

আজুমানে আল-ইসলাহের এই দ্বিতীয় শাখায় আসতে পেরে এবং প্রিয় ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত। আল-ইসলাহ প্রকৃতপক্ষে মনের কথা প্রকাশের যোগ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্র। যে যোগ্যতা বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে যুগ ও দ্বীনের চাহিদা পূরণ করতে পারে। দ্বীনের উপর যে আক্রমণ চলছে তার জবাব দিতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্কে ইসলামের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় করতে পারে। কারণ শিক্ষিত শ্রেণী ক্রমশ ইসলামের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। গতকাল ‘আন-নাদী আল আরাবী’র মজলিসে আমি বলেছিলাম যে, আব্বাহ তাআলা স্বয়ম্বর, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। না তার কোন উপকরণাদির প্রয়োজন আছে, না অন্য কোন শক্তির। শরীরী, অশরীরী কোন বস্তুর তিনি মুখাপেক্ষী নন।

কুরআনের একাধিক জায়গায় আব্বাহ তাআলা ভাব প্রকাশের যোগ্যতাকে মহা নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এই যোগ্যতার প্রভাব বিস্তারী শক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ : আব্বাহ তাআলা বলেছেন—

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

‘বিশ্বস্ত আত্মা (তথা জিবরাঈল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।’ (সূরা শুআরা ১৯৩)

আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাত- সত্ত্বা ও গুণাবলীর মর্যাদা হিসেবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, ‘যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এরপর বলেছেন-

بَلِّسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। অর্থাৎ এমন ভাষায় যা হবে চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী এবং হৃদয় ও মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তারকারী, মানুষের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টিকারী।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

‘আমিই এটাকে আরবী ভাষায় কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি।’ (সূরা ইউসুফ ২)

عَرَبِيًّا শব্দটি যুক্ত করার হেতু কী? শুধু إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেহেতু কুরআনের প্রথম সন্ধান আরবদের উদ্দেশ্যে এবং তাঁরাই হবেন দ্বীনের প্রতি প্রথম আহ্বানকারী দল এই কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জন্য শুধু আরবী ভাষাই চয়ন করেননি বরং বলেছেন عَرَبِيٍّ مُبِينٍ। মানব সৃষ্টির নেয়ামতের কথা যেখানে উল্লেখ করেছেন সেখানেও আল্লাহ তাআলা এই ভাব-প্রকাশ-যোগ্যতার নেয়ামতের কথা বলতে ভোলেননি। এরূপ বলা তো বেয়াদবী। বরং বলা উচিত, ঐ নেয়ামতের উল্লেখ পরিহার করেননি। বলেছেন-

الرَّحْمَنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

‘দয়াময় আল্লাহ। তিনিই কুরআন শিক্ষাদান করেছেন। তিনিই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই শিক্ষাদান করেছেন ভাব প্রকাশের।’

প্রথমে মানুষ সৃষ্টির কথা বলেছেন। অতঃপর বললেন, তিনিই মানুষকে ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা দান করেছেন। মানুষ যাতে নিজের কথাকে হৃদয়গ্রাহী করে, স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারে তার যোগ্যতা দান করেছেন। তো এটা একটা শক্তি, একটা যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ও শক্তিকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। নিজে গোমরাহ এবং অপরকে গোমরাহীর পথে আহ্বানকারী ব্যক্তি যদি এই যোগ্যতা ও শক্তি লাভ করে তাহলে সে অপরকে

গোমরাহকরণের কাজে এই যোগ্যতা ও শক্তি ব্যবহার করে, জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বানের জন্য সে এই যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। আকীদা ও বিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, চরিত্র ও আচার-আচরণ সহ মানব-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সে এই যোগ্যতার দ্বারা প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্ব-ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা ও এইরূপ যুগ বারবার এসেছে। শক্তিশালী লেখনী চলে গিয়েছে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের হাতেই। লেখনী তো সকলেই ধারণ করতে পারে কিন্তু প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিশালী লেখনী তাদের হাতে চলে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা লাভ করেছে যাদুকরি ভাষা, সম্বোধনী বক্তৃতাশক্তি। ফলে এরূপ সাহিত্য জন্মলাভ করেছে, যা গোটা সমাজকে করেছে সম্বোধিত, প্রভাবিত। গ্রীক ইতিহাস পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন, গ্রীক সাহিত্যের ভূমিকা ছিল সেক্ষেত্রে সর্বাধিক।

যে সাহিত্য ছিল ধর্মহীনতা সৃষ্টিকারী সাহিত্য। সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টিকারী সাহিত্য। প্রবৃত্তিপূজার সাহিত্য। সেগুলোকে রযমনামা (যুদ্ধগাথা) বা শাহনামা বলে। গ্রীক শাহনামা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। স্বয়ং খ্রিষ্টানরা এর অনুবাদ করেছে। আপনি যদি গ্রীক শাহনামা পাঠ করেন তাহলে জানতে পারবেন, সেখানকার ধর্মহীনতার একটি বড় কারণ ছিল এই যে, ভাষা ও লেখনী তাদের হাতে চলে গিয়েছিল যাদের মধ্যে ছিল না কোন আল্লাহ-ভীতি। ছিল না মানব-প্রেম, ছিল না পরকালের হিসাব-নিকাশের ভয়। তারা ছিল প্রবৃত্তি-পূজারী। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আপনারা জানেন, গোটা ইউরোপ তাদের জালে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের পাতা ফাঁদে ফেঁসে গেছে। ‘গীবন’-এর প্রসিদ্ধ ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ For Open Empire পাঠ করুন অথবা ডরপিয়ারের Conflict Between Religion and science (ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত) পাঠ করুন। প্রসঙ্গত বলছি যে, আমি আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ-র নিকট ঋণী। আমি ‘আল-ইসলাহ’র প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ আমি যখন এখানে লেখাপড়া করতাম এবং শিক্ষা সমাপনের শেষের দিকে আমার উপযোগিতা অনুযায়ী এখানে শিক্ষাদানেরও কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হল তখন গ্রন্থটির আমার প্রয়োজন পড়েছিল। আমি ইংরেজী জানতাম। বেশ পরিশ্রম করে ইংরেজী শিখেছিলাম। ফলে ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পড়তে পারতাম এবং বুঝতাম। অবশ্য গ্রন্থখানির অনুবাদও হয়েছে। মাওলানা যফর আলী খান গ্রন্থখানির চমৎকার অনুবাদ করেছেন। অনূদিত গ্রন্থখানি ‘মারেকায়ে মাযহাব ও সায়েঙ্গ’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থখানিও আমি আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ থেকে পেয়েছিলাম। তদ্রূপ History of European Morals (ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস) গ্রন্থখানিও আমার প্রয়োজন ছিল। সেটিও আমি

পেয়েছিলাম আল ইসলাহ থেকে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين
 গ্রন্থখানি লিখতে যেয়ে এই উভয় গ্রন্থ থেকে আমি পর্যাপ্ত সহায়তা লাভ করেছি।
 উভয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা
 যফর আলী খান সাহেব, আর দ্বিতীয়টির মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী
 সাহেব। দুইজনই অত্যন্ত যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদক। আমি ‘আল-ইসলাহ’র
 প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি চাই ‘আল-ইসলাহ’র এই বৈশিষ্ট্য অটুট থাকুক। মানুষ যেন
 রচনা, সংকলন ও গবেষণাকর্মে আল-ইসলাহ দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এই
 পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আপনারা সর্বদা গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি
 রাখবেন। লক্ষ্য রাখবেন, সাম্প্রতিককালে কোন কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হল,
 কোনগুলো শুধু ছাত্র নয় শিক্ষকবৃন্দেরও অধ্যয়ন করা উচিত। আমি স্বীকার না করে
 পারছি না যে, আল-ইসলাহ’র সংগৃহীত গ্রন্থাদি দ্বারা শিক্ষকবৃন্দও উপকৃত হতেন।
 আল-ইসলাহ বিনোদনের কোন ক্ষেত্র নয়। সংবাদপত্র পাঠের জন্য আল-ইসলাহ
 নয়। সংবাদপত্র তো সর্বত্রই পাওয়া যায়। আল-ইসলাহ অগভীর ও ভাষা ভাষা
 জাতীয় পুস্তিকা পাঠেরও জায়গা নয়। এরূপ পুস্তিকা বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশের প্রায়
 প্রতিটি মাদরাসা, প্রতিটি আঞ্জুমান ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।
 আল-ইসলাহের গ্রন্থাগারে ঐ জাতীয় গ্রন্থ থাকা উচিত, যা দ্বারা মন-মস্তিষ্ক ও
 চিন্তার গঠন হতে পারে। যা দ্বারা লেখক, গবেষক ও দ্বীনের দাঈগণ উপকৃত হতে
 পারেন। যে গ্রন্থগুলো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতজনদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে।
 এই জাতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ দ্বারা আল-ইসলাহের কল্যাণকারিতা বৃদ্ধি পাবে,
 আল-ইসলাহের পরিসেবা হবে ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। প্রসঙ্গত আমি দায়িত্বশীল ও
 নাদওয়াতুল উলামার নাজেম হিসাবে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, এর জন্য নাদওয়াতুল
 উলামার ইহতিমাম ও নিয়ামত উভয়েই আপনাদেরকে সহায়তা ও সহযোগিতা
 করতে প্রস্তুত। আপনারা গভীর দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তিদের পরামর্শে চিন্তা
 জাগানিয়া, তথ্য সমৃদ্ধ, পথনির্দেশক গ্রন্থাদির তালিকা প্রস্তুত করুন। অতঃপর
 আপনাদের বাজেট না কুলালে আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি যে, দারুল উলুম
 আপনাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। যা বলছিলাম যে, বর্তমান কালে
 বলার যোগ্যতা- চাই তা লেখনীর মাধ্যমে হোক কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে- আরও
 অধিকতর ধারালো হয়েছে। শুধু ধারালো হয়েছে বললে ভুল হবে, বরং
 আল-ইসলাহের নাজেম সাহেব যেমনটা কিছুক্ষণ পূর্বে বললেন এবং যা বহু পূর্বে
 আমি বলেছি যে, বর্তমানে ইয়াহুদীদের মেধা আর খ্রিস্টানদের শক্তি এক সাথে
 গাঁটছড়া বেঁধেছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। অথচ পৃথিবীতে যে দুটি

ধর্মের মধ্যে সর্বাধিক বিরোধ ও সংঘাত হতে পারে তাহল খ্রিষ্টধর্ম ও ইয়াহুদীধর্ম। কারণ খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হল, হযরত ঈসা মসীহ (আ.) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। আর ইয়াহুদী ধর্মে বিশ্বাসীরা তাঁকে অবৈধ সন্তান রূপে তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করে। যা খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য বরদাশত করা কঠিন। কিন্তু খ্রিষ্টান জাতি বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেছে। এমনকি ইয়াহুদীদের এই জঘন্য অপরাধকে খ্রিষ্টানদের প্রধান পোপ ক্ষমা করে দিয়েছে। তো বর্তমানে এই ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আর এর জন্য তারা Fundamentalism শব্দটি ব্যবহার করছে।

বস্তুত সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকা ও ব্রিটেনের ন্যায় পরাশক্তিগুলো এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা ধারণা করেছে যে, এখন তাদের জন্য যদি কোন হুমকি থেকে থাকে এবং তাদের প্রচণ্ড বিরোধী যদি কেউ থাকে, তাহল ইসলাম ও মুসলমান। এজন্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিমোদগারের উদ্দেশ্যে একটি শব্দ ব্যবহার করছে তা হল Fundamentalism বা মৌলবাদ। এক্ষেত্রে ইয়াহুদী মেধা ক্রিয়াশীল। প্রাচীন আদর্শবাদী, সত্যপন্থী ইত্যাদি পরিভাষাই মুসলমানদের জন্য যথার্থ ছিল। কিন্তু তারা এক্ষেত্রে Fundamentalist-এর পরিভাষা ব্যবহার করছে। তারা শব্দটিকে একরূপভাবে চিত্রিত করছে যে, এখন কোন মুসলমানের জন্য নিজেকে Fundamentalist বা মৌলবাদী বলে দাবি করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ একজন প্রকৃত ধার্মিকের জন্য Fundamentalist বা মূলের অনুসারী হওয়া অতি জরুরী। কারণ প্রকৃত ধার্মিকের অর্থই হল, যে ব্যক্তি স্বীনের মৌলিক বিষয়াদি ও আদি অকাট্য নির্দেশাবলীতে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী। খ্রিষ্টান হলে ইনজিলে, মুসলমান হলে আল্লাহ তাআলার আখেরী কালাম কুরআন মাজীদে যাবতীয় বক্তব্যাদিতে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হবে। কিন্তু বর্তমানে Fundamentalist শব্দটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং নিন্দার্থে শব্দটিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আরব দেশসমূহেও শব্দটিকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহ কি দু' সপ্তাহ পূর্বে আমার নিকট একটি পত্র এসেছে। যেখান থেকে এসেছে সেখানকার আমীরের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। লগুনে তাঁর ও আমার এক সঙ্গে অবস্থানের সুযোগ ঘটেছিল। তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় তাঁর দেশের কিছু সড়কের নামকরণ আমার নামে করেছেন বলে বলেছেন। আন্তর্জাতিক বড় এক সংস্থায় আমরা দুইজন

একত্রে কাজও করেছে। তো তাঁর পক্ষ থেকে আমার নামে এই মর্মে পত্র এসেছে যে, ‘মুতাশাদ্দীন বা কটুরপন্থীদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? আমরা আরও কিছু আলেম, গবেষক ও চিন্তাবিদেদের নিকটে তাঁদের অভিমত জানার জন্য পত্র প্রেরণ করেছি। কটুরপন্থীদের ব্যাপারে অভিমত। আরবী ভাষায় এদেরকে বলা হয়—مُتَطَرِّفِينَ বা চরমপন্থী। আসলে Fundamentalist-এর অর্থ হল مَبْدِئِينَ বা মৌলবাদী। দ্বীনের মৌলিক ও আদি বিশ্বাসসমূহে যারা বিশ্বাসী এবং মূলের অনুশীলনের ক্ষেত্রে যারা আপোসহীন। তো দ্বীনের মৌলিক ও আদি বিশ্বাসকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। অথচ বর্তমান বিশ্বের সমস্ত বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও নষ্টের মূল কারণ হল, কোন মৌলিক নীতি-নৈতিকতায় বিশ্বাস না থাকা। সর্বত্র শুধু প্রবৃত্তি-পূজার জয়-জয়কার। সকলেই চায় শুধু প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে, শুধু স্বার্থ উদ্ধার করতে। তাতে যদি স্বতঃসিদ্ধ চারিত্রিক ও আদর্শিক নীতিমালা লঙ্ঘিত হয় তবুও কিছু যায় আসে না। যদি সমগ্র মানবতা পিষ্ট হয়, গোটা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও কিছু যায় আসে না, নিজের স্বার্থ উদ্ধার হলেই হল। এটাকেই বলে নীতি-নৈতিকতাহীনতা। এটাই আজ গোটা বিশ্বকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, যে কোন সময় কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে। আসল কিয়ামত তো আল্লাহ তাআলাই সংঘটিত করবেন। আমি বলছি তার পূর্বে অন্য এক কিয়ামতের কথা। এই কিয়ামত যে কোন সময় এবং বারবার আসতে পারে। দেখুন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক ধরনের কিয়ামত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও এক ধরনের কিয়ামত ছিল। বিশ্বযুদ্ধ আবার হতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের তুলনায় অধিকতর ভয়াবহতা নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ও জার্মান একে অপরের প্রতিপক্ষ ছিল। পরে উভয় দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল অপরাপর কিছু শক্তি। তখন পারমাণবিক বোমা ছিল না। এখন পারমাণবিক বোমা অস্তিত্ব লাভ করেছে। সুতরাং ভয়াবহতা ও ব্যাপকতায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম দুটি বিশ্ব যুদ্ধকে ছাড়িয়ে যাবে। আর তা হবে নীতি-নৈতিকতাহীনতা, প্রবৃত্তিপূজা ও অবাধ স্বাধীনতার কুফলজনিত কারণে। ওদের লজ্জা করে না। ওরা মৌলবাদ নামে নতুন পরিভাষার জন্ম দিয়েছে। অথচ সারা বিশ্বের বর্তমান অস্থিরতা ও নষ্টের কারণ তা-ই যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

‘জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষেরই কৃতকর্মের দরুন। যাতে তাদেরকে তিনি তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করাতে পারেন, যাতে তারা ফিরে আসে।’ (সূরা রুম ৪১)

কুরআন মাজীদে এই আয়াতটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে, সেই কৃতকর্ম আর কিছু নয়। তাদের কৃতকর্ম হল কোন নীতি ও আদর্শের তোয়াফা না করা, প্রবৃত্তির দাসত্ব অবলম্বন, অবাধ স্বাধীনতা ভোগ এবং যে কোন মূল্যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের অভ্যাস।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা যাকে ভোগ সম্পদের দষ্ট বলে আখ্যাতি করেছেন। বলেছেন,

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا

‘কত জনপদের বাসিন্দাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা তাদের ভোগ সম্পদের দষ্ট করত।’ (সূরা কাসাস ৫৮)

আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, বর্তমান যুগ ও বর্তমান যুগের বিশ্ব মহা সঙ্কটে নিপতিত। এই সময়ে আপনাদের জন্য যেটা প্রয়োজন তা হল পারস্পরিক মত বিনিময়ের যোগ্যতা অর্জন, লেখালেখির যোগ্যতা অর্জন, বিভিন্ন ধরনের জনসমাবেশে সমাবেশ উপযোগী বক্তৃতা প্রদানের যোগ্যতা অর্জন। যোগ্যতা বলতে এতটুকু নয়, যতটুকু আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যথেষ্ট ছিল। শুধু এতটুকু নয় যে, আপনি কোন মিলাদ-মাহফিল কিংবা সীরাত মাহফিলে কিছু বলে দিলেন, কোন আঞ্জুমানের প্র্যাটফর্ম থেকে কিছু বলে দিলেন, নেক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কোন জলসায় কিছু কথা রাখলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে বর্তমানকালের ষড়যন্ত্র তো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রটি যতটা ব্যাপ্ত ততটাই গভীর ও সূক্ষ্ম। এর কুফল সুদূরপ্রসারী। রেডিও, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ সকল গণ-প্রচার মাধ্যমগুলোর কুৎসিত ঐক্য এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সকলের বক্তব্য একটাই। তাহল Fundamentalist এর মোকাবেলা করতে হবে। অর্থাৎ কোন মৌলিক আদর্শ বলতে কিছু থাকবে না। কোন বাধা-বন্ধন থাকবে না। মন যা চায় তাই করা যাবে।

গ্রীক একটি দর্শনের নাম ছিল লজ্জাতিয়াত। এর অর্থ ভোগবাদিতা। সেই দর্শনের মূল বক্তব্য ছিল, যাতে আনন্দ লাভ হয় তাই করা উচিত। বর্তমান ইউরোপ ঐ একই মানসিকতা লালন করে। গোটা ইউরোপের চিন্তা-চেতনা ভোগবাদী চিন্তা-চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ভোগ ও আনন্দকে তারা আরও ব্যাপকতর বলে চিন্তা করে। শুধু রসনাতৃপ্তি ও উদরপূর্তির আনন্দ নয়, শুধু যৌন লালসা চরিতার্থের আনন্দ নয়, বরং চিন্তের আনন্দ। হীন রাজনৈতিক আনন্দ, হিংস্র বিজয়ের

আনন্দও এই চিন্তের আনন্দের অন্তর্ভুক্ত। ফলে তা আরও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। গ্রীক ভোগবাদী দর্শন এই পর্যায় পর্যন্ত উপনীত হতে পারেনি। সেই সুযোগই তার হয়নি। ইউরোপের ভোগবাদী দর্শন অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

Fundamentalism নিয়ে কথা বলছিলাম। আরব ও উপসাগরীয় দেশসমূহেও এই আওয়াজ উঠছে যে, চরমপন্থীদের মোকাবেলা করতে হবে। তাদেরকে দমন করতে হবে। চরমপন্থী বলে তারা ঐ সকল ব্যক্তিকে বোঝায় যারা সমাজকে ইসলামী অনুশাসনের আদলে গড়ে তুলতে চায়। যারা চায়, মানুষের মধ্যে আল্লাহীতি, পরকালীতি ও হিসাব-নিকাশের ভীতি সৃষ্টি হোক। সমাজের প্রতিটি সদস্য একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোক, প্রত্যেকেই অপরের অধিকার রক্ষা করুক।' শরীয়তের ফৌজদারী দণ্ডবিধি যেমন রজম, বেত্রাঘাত, চোরের হস্তকর্তন ইত্যাদি তো অনেক দূরের বিষয়। যেসব বিধি-বিধান দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নযোগ্য সেই সব বিধি-বিধান যারা বাস্তবায়ন করতে চায় তাদেরকেই বলা হচ্ছে চরমপন্থী। দেশের সরকার তাদের ব্যাপারে ভীত। ঐসব দেশের পত্র-পত্রিকায় সরকারের এই অহেতুক ভীতি প্রকাশ পাচ্ছে। যেমনটা আমার নিকট প্রেরিত পত্র দ্বারাও তা পরিস্ফুট। আমার নিকট প্রেরিত পত্রের ভাষার ধরণ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তারা ঐসব লোকের বিরুদ্ধে আমার দ্বারা কিছু লিখিয়ে নিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমার ফতওয়া চায়। যেন তারা প্রচার করতে পারে যে, প্রসিদ্ধ আলেম, গবেষক, লেখক, অমুক ও তমুক গুণের অধিকারী শায়খ আবুল হাসান আলী নদভীও চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে বলেছেন।

আমেরিকা ও ব্রিটেনেও Fundamentalist বলে ঐ সকল লোককেই বোঝানো হচ্ছে যারা ধর্মের দৈনন্দিন অনুশাসনগুলোকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এইসব সঙ্কটকে সামনে রেখে আপনাদের এগুতে হবে। সিনেমা দেখা, অবৈধ খেলাধুলা, অপব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলো মন্দ ও গুনাহের কাজ। কিন্তু এইসব গুনাহের কাজ পরিহার করতে উপদেশ দিলেন আর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল তা নয়। গোটা সমাজের সংস্কার প্রয়োজন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে ঘুণ ধরেছে তা বিনাশ করতে হবে। 'অল-ইগিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের একজন রোকন হিসেবে আমি আপনাদেরকে বলব যে, সমাজ-সংস্কারের কাজ আপনাদেরকে করতে হবে। সমাজকে সংশোধনের দাওয়াত দিতে হবে। জায়গায় জায়গায় মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মসজিদে মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পূর্ব কালের ন্যায় কোন কোন বাড়িতেও শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা

গ্রহণ করতে হবে। শিশুরা আসবে। কুরআন মাজীদ পড়তে শিখবে। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কালিমা পড়তে শিখবে। শিরক ও তাওহীদের মাঝে পার্থক্য কী তা জানবে। নববী সীরাতে সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিফহাল হবে। এই দায়িত্ব আপনাদেরকেই পালন করতে হবে। আরও একটি বড় দায়িত্ব আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। তাহল ইসলামের বিরুদ্ধে আধুনিক ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা। এর জন্য আপনাদেরকে বাস্তবানুগ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে আমেরিকা বিশেষভাবে মরিয়া হয়ে লেগেছে, যে ষড়যন্ত্রের পিছনে ইয়াহুদী মেধা ও খ্রিস্টানদের অর্থ ও অস্ত্রশক্তি একযোগে কাজ করে যাচ্ছে, তাহল সারা বিশ্ব থেকে আকীদা-বিশ্বাসকে, ঈমানকে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে, দ্বীনের কঠোর অনুশীলনকে, পরকাল ভীতিকে উচ্ছেদ করা। এসব বিষয়কে তারা Fundamentalism নামে আখ্যায়িত করে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, এসব প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, বস্তাপচা বাসি মতাদর্শ। এগুলোকে পরিহার করতে হবে। তাদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আপনাদেরকে সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমি আজুমানে আল-ইসলাহকে শুধু বক্তৃতা প্রশিক্ষণ ও লেখনী প্রশিক্ষণের বিভাগ বলে মনে করি না। আমি মনে করি এটি নাদওয়াতুল উলামার লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আর তা হল আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীকে সংশয়মুক্ত করা, তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত আরব দেশগুলোতে ইসলাম অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। আল-জাযাইরে কী হচ্ছে? সেখানে সরকার ও দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে।

সরকারের অভিযান না ইসরাঈলের বিরুদ্ধে, না ইউরোপিয়ান কোন শক্তির বিরুদ্ধে, না দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযান চলছে নেহায়েত দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে, দ্বীন-প্রিয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। যারা চায়, সেখানে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত হোক, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ হোক সর্বাধিক পালনীয়, গুনাহ সমূহ থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করুক, ফরযসমূহ আদায় করুক। আল-জাযাইরে এসব বিষয়ের উচ্চারণও অপরাধ বলে বিবেচিত হচ্ছে। অনবরত সংবাদ আসছে যে, আজ সেখানে এতজন দ্বীনদার শহীদ হয়েছে। অমুক দিন এতজন শহীদ হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের টেউ পূর্ব দিকেও অগ্রসর হচ্ছে। পাকিস্তান এই ষড়যন্ত্রে নিপতিত হবে বলে আমাদের আশঙ্কা। সম্প্রতি পাকিস্তানে যে পরিবর্তন হয়েছে, নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করা হয়েছে, এর পিছনে আমেরিকার হাত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের

নিহত হওয়ার ঘটনায় এবং বাদশাহ ফয়সালের নিহত হওয়ার ঘটনাতেও আমেরিকার হাত ছিল।

তাদেরকে হত্যার কারণ হল, মুসলিম কোন দেশে এমন কোন ব্যক্তি যেন ক্ষমতায় না থাকে যে ব্যক্তি দেশের উন্নয়ন ও ভবিষ্যত নির্মাণে স্বাধীনচেতা, দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী, ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী, দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীকে সংশয়মুক্ত করতে হবে, ইসলামের চিরন্তনতা ও সর্বকালীনতার প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিতে হবে যে, ইসলাম সর্ব যুগকে সাথে নিয়ে চলতে পারে, সর্ব যুগেই ইসলাম নেতৃত্ব দান করতে পারে।

আধুনিক পাঠ্যক্রম ও ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, তা ইসলামের প্রতি আস্থাকে বিনষ্ট করে দেয়। তা মানুষের মাঝে এই ধারণার জন্ম দেয় যে, ইসলাম এক সময়ে কল্যাণকর কিছু কাজ করেছে, কিছু ভাল অবদান রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ নারীদেরকে কিছুটা অধিকার দিয়েছে, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করার রীতিকে উচ্ছেদ করেছে, মদ নিষিদ্ধ করেছে ইত্যাদি। কিন্তু সে যুগ ছিল অনুন্নত। বর্তমান বিশ্বের উন্নত যুগে ইসলাম অচল। ইসলাম এই যুগকে সঙ্গ দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এটাই এই ফেতনার মূল কথা যে, ইসলাম বর্তমান যুগকে সঙ্গ দেওয়ার যোগ্যতা ধারণ করে না। আপনাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, ইসলাম শুধু সঙ্গ দিতে পারার যোগ্যতা রাখে তাই নয় বরং এই অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার এই যুগকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই পারে এই যুগকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে, এই যুগকে শান্তিময় করে তুলতে। আপনাদেরকে এজন্য জ্ঞান-গরিমাসহ সর্বদিক দিয়ে পূর্ণ প্রস্তুত হতে হবে। এক্ষেত্রে অধ্যয়নের জন্য শিক্ষকবৃন্দ কিছু গ্রন্থ নির্বাচন করে দিতে পারেন। আমরা মাওলানা মাসউদ আলম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। কোন কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কোন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম। একজন দায়িত্বশীলকে আল-ইসলাহের গ্রন্থাগারে এক ঘণ্টার জন্য উপস্থিত থাকারও ব্যবস্থা করেছিলাম। যাতে ছাত্ররা তাঁর নিকট থেকে অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থ নির্বাচনের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। ছাত্ররা তাঁর নিকট যেয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আমি অমুক

শ্রেণীর ছাত্র, আমার জন্য কোন্ গ্রন্থটি প্রথমে উপযুক্ত বলে দিন। বলে দিন, ইতিহাসের অধ্যয়ন কোথা থেকে শুরু করা উচিত। সীরাতের কোন্ কিতাবটি পাঠ করব। এই দুইটি ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। আমরা মনে করি এই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আমি কথা না বলার জন্য ওজর পেশ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের ভালবাসা ও একগ্রহতার কারণে এবং আল্লাহ তাআলা আপনাদের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কাজ নেবেন বলেই হয়তো আপনাদের সামনে দীর্ঘ আলোচনা করে ফেললাম এবং আমার চিন্তাগুলো বিস্তারিত আকারে বললাম। অবশেষে আবার ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, আজ্ঞামানে আল-ইসলাহকে আপনারা নিছক বক্তৃতা প্রশিক্ষণ ও লেখনী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জায়গা বলে মনে করবেন না। এখান থেকে আপনারা ঐ সম্পদ ও শক্তি আহরণ করবেন, যা দ্বারা আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যারা মেধাবী, ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণীর তাদেরকে আপনারা সংশয়মুক্ত করতে পারেন। ইসলামের প্রতি তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামের প্রতি আস্থা বিনষ্টকারী জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আমেরিকা, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্র। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জীবন যাপনকারীদেরকে আখ্যায়িত করা হচ্ছে চরমপন্থী ও মৌলবাদী নামে। তাদেরকে বলা হচ্ছে পশ্চাদগামী। ফলে একজন শিক্ষিত ব্যক্তিও নিজেকে ইসলামের কঠোর অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করছে। আপনাদেরকে এই কাজ করতে হবে। সকলের সামনে বুক উঁচিয়ে, চোখে চোখ রেখে বলতে হবে হাঁ আমরা Fundamentalist এবং একজন Fundamentalist-ই পারে দুনিয়াকে মহা বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে। Fundamentalism নাই বলেই বিশ্বের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। কোন মূলনীতি নেই, কোন আদর্শ নেই, জীবনের কোন মাপকাঠি নেই, সীমারেখা নেই। আছে শুধু প্রবৃত্তি পূজা, স্বার্থ উদ্ধারের মানসিকতা, ক্ষমতার মোহ, রাজনৈতিক হানাহানি। অতএব আপনারা নিজেরা প্রস্তুত হোন অপরকেও প্রস্তুত করুন। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কারণ এই মাহফিলে কিছু বরকতময় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত আছেন। আমাদের প্রিয় মাওলানা আবদুল করীম সাহেব আছেন, যিনি হিন্দুস্তানে কুরআনের একজন বড় ভাষ্যকার। মাওলানা মুজিবুল্লাহ সাহেব নদভীও উপস্থিত আছেন, যিনি একটি বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন এবং

লেখালেখিও করে থাকেন। আপনাদের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দও উপস্থিত আছেন।
এইসব ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চয়ই বরকতজনক হবে।

আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে তাঁর সত্য দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল
করে নিন।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وما علينا الا البلاغ المبين

নিজেকে নিলামের বাজারে উঠাবেন না

[১৯৮৮ ইসলামী সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার জামালিয়া হলে অনুষ্ঠিত দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা লাক্ষৌ-এর শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের বিদায় অনুষ্ঠানে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) চিন্তা জাগানিয়া এই ভাষণ দান করেন। ভাষণটি যে কোন তালিবুল ইলমের জন্য একটি পথ-নির্দেশিকা।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَى
بَدْعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - أَمَّا بَعْدُ!

আমার সহকর্মীবৃন্দ, দারুল উলূমের শিক্ষকবৃন্দ ও আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

সর্বপ্রথম আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে চাই। শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্র ভাইদের উর্দু ও আরবী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি শুনে আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করেছে। আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই যে, আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষকবৃন্দের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি।

আমি আমার সহকর্মী ভাইদেরকে এবং দারুল উলূমের শিক্ষকবৃন্দকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কারণ ছাত্রদের লিখিত প্রবন্ধগুলোতে তাঁদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি বহু বৎসর যাবৎ এই জাতীয় বিদায়ী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছি। আল-ইসলাহের মজলিসগুলোতেও অংশগ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছে। চিন্তা ও জ্ঞানগত, প্রকাশ ও বর্ণনাশক্তি, রচনাশৈলী ও লেখনী শক্তি, ভাষা ও সাহিত্যমান ইত্যাদি সব দিকেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত সুখকর বিষয়। প্রিয় ছাত্রবৃন্দকে তাদের উন্নতি ও সাফল্যের জন্য তাদের ইখলাস ও ভালবাসার জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। দুঃখ প্রকাশ করছি তাদের জন্য, যারা তাদের লেখা পাঠ করে শুনাতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তাদের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। কারণ তারা যে পরিশ্রম করেছে, যে সময় ব্যয় করেছে তা তাদের জন্য সর্বাবস্থায় কল্যাণকর।

সুতরাং মন খারাপ করার কোন কারণ নেই। এই সকল প্রবন্ধগুলি ছাপার অক্ষরে আসলে ভাল। এগুলো তাদের জন্য স্মারক হয়ে থাকবে।

এখন আমি স্বল্প সময়ে কিছু জরুরী ও বিদায়ী কথা বলব। আপনাদের ভালবাসা ও আমার প্রতি আপনাদের দাবি আছে এই প্রেক্ষিতে আমার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আপনাদের জন্য যা কল্যাণকর বলে মনে করছি আপনাদের সামনে তা তুলে ধরছি।

আপনাদের উদ্দেশ্যে চারটি কথা বলব এরূপ যা বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট, আর চারটি কথা বলব আপনাদের নিজেদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট চার কথার প্রথম কথাটি অত্যন্ত বড় কথা, উচ্চস্তরের কথা। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির মুখে ঐরূপ কথা সাজে না। কিন্তু কথাটি বলার মধ্যে এক প্রকার বরকতও আছে, স্বাদও রয়েছে। একবার হযরত উমর ফারুক (রাযি.) বড় ও বিশিষ্ট কিছু সাহাবীর মজলিসে উপস্থিত হলেন। হযরত উমর (রাযি.) অনুভব করলেন যে, সময়টি দুআ করার সময়। আরেফগণের মাঝে যেরূপ বিশেষ সময়ে বিশেষ আমলের চাহিদা সৃষ্টি হয় তদ্রূপ তাঁর অন্তরেও দুআর আমলের চাহিদা সৃষ্টি হয়। তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আপনারা স্বাধীনভাবে প্রত্যেকেই নিজের জন্য দুআ করুন। তো কেউ বললেন, আয় আল্লাহ! আপনার রাস্তায় আমাকে বের হওয়ার তাওফীক দান করুন, যাতে আমার সম্পদ আপনার রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারি এবং আপনার বান্দাদের খেদমত করতে পারি। কেউ বললেন, হে আল্লাহ! আপনার রাস্তায় আমাকে বের হওয়ার তাওফীক দান করুন, যাতে আপনার রাস্তায় আমি নিজের রক্ত প্রবাহিত করতে পারি এবং শহীদ হয়ে যেতে পারি। এইরূপে একেকজন সাহাবী দুআ করতে থাকলেন। অবশেষে হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর পালা আসল। তিনি হযরত আবু উবাইদা, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা, খালেদ (রাযি.) সহ বেশ কিছু সাহাবীর নাম উল্লেখ করে বললেন, আমার প্রার্থনা হল এই সকল সাহাবী আমার সঙ্গে থাকুক। যাতে তাঁদের একেকজনকে আমি একেক দিকে প্রেরণ করতে পারি, আর সারা বিশ্বে তাঁদের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে পারি। বাস্তবেই ঐ সকল সাহাবী বড় বড় বিজয় লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

বর্তমান কালের পূর্বে ইসলামের ভবিষ্যত নির্ধারণকারী কর্ম এত নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ছিল না। তখন পরিস্থিতি ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন ও অন্ধকার। ফলে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল ছিল যে, এই চারটি কর্ম রয়েছে যা দ্বারা ইসলাম ও ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং ইসলাম তার পয়গাম ও যথারূপ নিয়ে বহাল থাকবে। আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে

বিশেষত ১৯৪৭ ইং সালের পূর্বে এই কর্ম এত নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু ১৯৪৭ ইং সনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বর্তমান কালের প্রোপাগান্ডা এবং আমাদের অভিজ্ঞতা ঐ দায়িত্ব ও কর্মগুলোকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ঐ জাতীয় চারটি দায়িত্ব ও সংগ্রামের কথাই আপনাদেরকে আমি বলব। আর এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ়চেতা কিছু সৈনিকের, যারা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেছে এবং যারা ইখলাস ও আন্তরিকতার অধিকারী।

চারটি দায়িত্বের মধ্য থেকে **সর্বপ্রধান দায়িত্ব হল, মুসলমানদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুসলমানরূপে বহাল রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ**। তারা যেন মুসলমান পরিচয়ে টিকে থাকে। শুধু সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাগত নয় বরং বিশ্বাসগত ইরতিদাদ ও ধর্মহীনতা থেকেও তারা যেন রক্ষা পায়। এখন সবচেয়ে বড় ফরয় হল, আমাদের মাদরাসায় শিক্ষা সমাপনকারীরা যেন এই দিকটাকে সামাল দেয়, এই দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় এবং এই কাজের জন্য নিজেদেরকে ওয়াকফ করে দিয়ে সর্বাত্মক মেহনত চালায়। তাদের চেষ্টা থাকবে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্মকে—যারা বর্তমানে আট-দশ বছর বয়সের অথবা পনেরো শোল বৎসরের যুবক তারা যেন মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আর এর জন্য প্রয়োজন শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে মাদরাসা, মজুব ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে সম্ভব সেখানে প্রভাতী ও বৈকালিক উভয় শাখা খোলা প্রয়োজন। যে সকল আধুনিক শিক্ষিত লোক তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হয় তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এদেরকে রক্ষা করার জন্য এখনই যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে ভবিষ্যত-আশঙ্কা সৃষ্টি হবে যে, নতুন প্রজন্মকে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান বলা যাবে কিনা। তারা তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে কিনা, রিসালাত এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করবে কিনা, তাঁকে শাফায়াতকারীরূপে বিশ্বাস করবে কি না—

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৯)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৮৫)

এই আয়াত দুটিতে তাদের বিশ্বাস থাকবে কি না।

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আপনাদের মানসিক দৃঢ়তা, আপনাদের উন্নত চিন্তা-চেতনা, আপনাদের ইলমী যোগ্যতার জন্য আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদেরকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু বর্তমান জিজ্ঞাসা হল, কে কোন্ দিক সামাল দেবে। আপনারা এখনই সংকল্পবদ্ধ হোন যে, আপনারা এই ভয়াবহ ও নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। আপনারা সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহ তাআলা আপনাদের মদদ করবেন। তিনিই যাবতীয় উপকরণাদির ব্যবস্থা করে দেবেন। পরবর্তী প্রজন্মকে, আমাদের, আপনাদের সন্তানদেরকে মুসলমানরূপে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখার জন্য যে প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজন তা গ্রহণ করুন, যতটুকু হাত-পা ছোঁড়া যায় ছুঁড়ুন, হৃদয়ের যতটুকু রক্ত ঢেলে দেওয়া যায় ঢেলে দিন।

দ্বিতীয় দায়িত্ব হল- ধীন ইসলাম যেন তার স্ব-রূপে বহাল থাকে। অর্থাৎ দেশের জনগণ যেন ইসলামের পারিবারিক আইন-কানুন, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার সহ কুরআনের অকাট্য বিধি-বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারে। অন্যথায় এ দেশে তাদের বসবাস নাজায়েজ ও হারাম হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“যারা নিজেদের উপর জুলুম করে (কাফেরদের দেশে বসবাস করত) তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?’ তারা বলে, ‘দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;’ তারা বলে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে পারতে? এদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।” (সূরা নিসা, আয়াত ৯৭)

অত্যন্ত কঠিন হুশিয়ারী। খোদা নাখাস্তা যদি এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মুসলমান নামায তো পড়তে পারে, কালিমা উচ্চারণ করতে পারে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারে, কিন্তু কুরআন মাজীদে বর্ণিত পারিবারিক আইন-কানুন মেনে চলতে পারে না তখন উলামায়ে কেরামকে হিজরতের ফতওয়া দানের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। প্রার্থনা করি- এরূপ পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না

হয়। এই দেশে বসবাসকে আমরা আমাদের অধিকার বলে মনে করি। দূর দৃষ্টিসম্পন্ন আরেফগণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত, স্ব-যুগের সর্বাধিক ইখলাসের অধিকারী ব্যক্তিগণ অবশ্য বলেছেন যে, এই দেশ থেকে ইসলাম কখনও নিশ্চিহ্ন হবার নয়। এই দেশের ভাগ্যে ইসলাম লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম এদেশের জন্য বরাদ্দ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার ফায়সালা, এই দেশে ইসলাম থাকবে। ইসলাম এই দেশকে পরিচালনা করতে পারে। ইসলাম এই দেশের জন্য রক্ষাকবচ। অসম্ভব নয়, এই দেশের শাসনক্ষমতা পুনরায় মুসলমানদের হাতে চলে আসতে পারে। অতএব আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপারে আমরা নিরাশ নই। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও বাস্তবতার নিরিখে আমাদের মেহনত ও প্রচেষ্টার গতিধারা কিরূপ হওয়া উচিত তা নির্ণয় করতে হবে। কারণ মুসলমানদের ধর্মীয় স্বকীয়তা ক্রমশ হুমকির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা শাহবানুর মামলার মাধ্যমে এক গায়েবী সাহায্য করেছেন। মামলাটি মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বস্বকটের অনুভূতি জাগ্রত করে দিয়েছিল। ফলে এ নিয়ে আন্দোলন হয়েছে এবং এক পর্যায়ে আন্দোলন সফলতাও লাভ করেছে। এতদ্বারা বোঝা গেছে যে, ইখলাসের সাথে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তা অবশ্যই সফল হয়।

তৃতীয় বিষয়— মানবতার পয়গাম। এই দেশে নিজেদের দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে, দ্বীনের উপর আমল করতে, দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলোকে সংরক্ষিত রাখতে, শিক্ষাদান ও রচনা সংকলনের কাজ করতে আমাদের ইজ্জত-সম্মান নিয়ে, নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসকে অটুট রেখে জীবন যাপন করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন পরিবেশ শান্ত থাকা। পরিবেশ যদি উত্তপ্ত হয়, অমুসলিমদের সাথে যদি আমাদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে থাকে তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব সকলের মধ্যে মানবতার পয়গাম ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা সকলেই মানুষ। আমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানবতা। এই উপলব্ধি সকলের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খুব কম মানুষই অনুভব করে। তারা মনে করে, এটা কিছু মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভট কথা, তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা।

আপনারা বিশ্বাস করুন, পরিস্থিতির বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং স্বরূপ সন্ধানী দৃষ্টি আমাকে এই পথনির্দেশ করেছে। এই অভিজ্ঞতাই আমার মত আরও কিছু ব্যক্তিকে ঐ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। যদিও আমাদের প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। যদিও এই সমাবেশ এরূপ নয় যেখানে বললে বিষয়টি এক

আন্দোলনে রূপ নেবে, কিন্তু বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদের দ্বারা ঐ কাজ করিয়ে নেবেন। অতএব আপনারা কথাটি মনে রাখবেন। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হওয়া জরুরী।

স্পেনে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার যে দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তার কারণ নির্ণয়ে বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য। স্পেনে দ্বীনের পর্যাপ্ত খেদমত হয়েছে। বড় বড় লেখক ও বুয়ুর্গ সৃষ্টি হয়েছে। শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর ন্যায় মাশায়েখ জন্ম লাভ করেছে। আল্লামা শাতেবী ও ইবনে আবদুল বার-এর ন্যায় লেখক জন্মলাভ করেছে। কিন্তু একটি বিষয় সেখানে উপেক্ষিত ছিল। তাহল সেখানকার আদিবাসীদেরকে— যাদের সংখ্যাগত পরিমাণ ছিল আটার মধ্যে লবণের পরিমাণের ন্যায়— ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে, তাদেরকে ইসলামের আওতাভুক্ত করতে চেষ্টা করা হয়নি। অথচ সেখানকার শাসনক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে। কিন্তু ক্ষমতায় আসীনরা মনে করে যে, এই দেশ তাদের নামে চির বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোঘল শাসকদের ফরমানগুলোতে ‘চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য’ কথাটির সন্ধান মেলে। অর্থাৎ তারা যেন মনে করত যে, তারা সরাসরি ইসরাফীলের হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করবে। এর পূর্বে তাদের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটা ছিল তাদের ভ্রান্ত ধারণা। যা হোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আদিবাসীদেরকে তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া, তাদের মেধা ও অনুভূতিগুলোকে ভ্রান্ত শিক্ষা দ্বারা, ভ্রান্ত ইতিহাস দ্বারা এবং নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতা দ্বারা বিকাশপ্রাপ্ত হওয়ার, তাদের চিন্তা-চেতনাকে উস্কে দেওয়ার সুযোগ দান করাটাই হয়েছে সমস্ত বিপর্যয়ের কারণ।

মুসলমানরা এই দেশ শাসন করেছে আটশত বৎসর। নানা কারণে অমুসলিমদের অন্তরে যে ক্ষোভ ও ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশমনের একমাত্র উপায় মানবতার পয়গাম।

চতুর্থ বিষয়— দ্বীনী ইলমের চর্চা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা এবং যুগের সঙ্গে দ্বীনী ইলমের সমন্বয় সাধন। সমন্বয় সাধনের অর্থ এই নয় যে, দ্বীনী ইলম যুগের অনুগামী হয়ে যাবে। বরং যুগের জায়েজ ও আবশ্যকীয় দাবি পূরণ করতে যুগের ভাষা ও সাহিত্য বিবেচনায় নিয়ে দ্বীনী ইলমকে এরূপ উপযোগী করে তুলতে হবে, যাতে দ্বীনী ইলম তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে, যুগকে সাথে নিয়ে চলতে পারে এবং যুগের নেতৃত্ব দান করতে পারে। আর এর জন্য মাদরাসাগুলো মেরুদণ্ড স্বরূপ। অতএব মাদরাসাগুলোকে উন্নত করতে হবে। মাদরাসার জন্য উপযুক্ত

শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে। নাদওয়াতুল উলামার সাথে সংযুক্ত মাদরাসাগুলোর সংখ্যা ষাটের অধিক। কিন্তু যোগ্য শিক্ষক মিলছে না। আপনারা নিজেদেরকে যোগ্য শিক্ষকরূপে গড়ে তুলুন। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করুন। দ্বীনী ইলমে নতুন করে সজীবতা সৃষ্টি করুন, নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটান। প্রাচীন বিষয়াদিকে প্রাচীন বিষয় মনে করে পড়াবেন না। বরং তাতে নতুন প্রাণ ও নতুন শক্তি সৃষ্টি করুন। লেখায় সৃষ্টি হোক নতুন আঙ্গিক। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নতুনত্ব সৃষ্টি হোক, শিক্ষাদানে জন্মলাভ করুক নতুন শক্তি। জ্ঞানচর্চায় সৃজনশীল রুচির জন্ম হোক, সৃজনশীল মানসিক যোগ্যতা সৃষ্টি হোক। সঙ্গে থাকুক মেধা, প্রতিভা এবং অধ্যয়নের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা।

এই ছিল চারটি বিষয়, যা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করলাম। বিষয়গুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

এখন আমি আপনাদের নিজেদের সাথে সম্পর্কিত চারটি বিষয়ের উল্লেখ করব। বিষয়গুলোকে সাধারণ মনে করবেন না। যা বলব তা হাজার হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়নের নির্যাস। যদিও এটা আত্মপ্রশংসা, তারপরও বলছি কথায় গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। পূর্ববর্তী যুগের, সমকালীন যুগের এবং এতদূভয়ের মধ্যবর্তী যুগের উলামা সুলাহাগণের জীবন চরিত বিশেষত ভারতীয় আলেমগণের জীবন চরিত অধ্যয়নের যতটা সুযোগ ও সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি ততটা সুযোগ ও সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়েছে। এর কিছু যথার্থ কারণও রয়েছে। আমি জন্মলাভ করেছি ইতিহাস চর্চার পরিবেশে, ইতিহাস চর্চার ঘরানায়। আমাদের বাড়িতে ইতিহাসের বিশাল ভাণ্ডার মওজুদ ছিল। نزہۃ الخواطر গ্রন্থখানিতে সাড়ে চার সহস্রের অধিক ভারতীয় আলেমের জীবন চরিত বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থখানি আমি কয়েকবার পাঠ করেছি। পাণ্ডুলিপি থেকে গুরু করে ছাপার অক্ষরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে গ্রন্থখানিকে আমি কয়েকবার করে পাঠ করেছি। তদ্রূপ وفيات الأعيان এবং طبقات এর গ্রন্থসমূহ পাঠ করেছি। এছাড়া আব্বাস আমাকে বুয়ুর্গদের খেদমতে থাকারও সুযোগ দান করেছেন।

প্রথম বিষয়— আব্বাসের সাথে মুআমালা দূরস্ত হয়ে যাওয়া। উল্লেখযোগ্য কিছু পরিমাণ তাকওয়া, দিয়ানতদারী এবং আব্বাসের সঙ্গে তাআলুক ও সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া। এটাই মৌলিক বিষয়। এটা ব্যতীত কোন কাজে না বরকত হবে, না গতি ও হরকত সৃষ্টি হবে। প্রকৃত কল্যাণ তখনই লাভ হবে যখন আব্বাস ও রাসুলের সঙ্গে মুআমালা দূরস্ত হয়ে যাবে।

আমি বলছি না যে, আপনারা সকলেই নির্ধুম রাত যাপনকারী হয়ে যান। সকলেই সুফী ও আরেফ বিল্লাহ হয়ে যান। কারণ এটা সকলের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু যেটি জরুরী সেটি হল মোটামুটি পর্যায়ে তাকওয়া অর্জন, আল্লাহর সঙ্গে মুআমালা ও সম্পর্ক দূরস্ত হওয়া। নামাযের ফিকির থাকতে হবে, দুআর প্রতি স্বভাবজাত আগ্রহ সৃষ্টি হতে হবে, সর্ব কাজে ইনাবাত ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহ-নির্ভরতা সৃষ্টি হতে হবে। এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। এটা অর্জনের অনেক পস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি তো এই যে, কুরআন কারীম ও হাদীস পাঠ করবেন, ফিকহের চর্চা করবেন এবং সেই অনুযায়ী নিজের নামাযকে উন্নত পর্যায়ে নামাযে পরিণত করার চেষ্টা করবেন। এছাড়া সর্বাধিক কার্যকর হল বুয়ুর্গানে দ্বীনের জীবন চরিত পাঠ। নসীব হলে কোন বুয়ুর্গের সোহবত ও সংসর্গ অবলম্বন। আমি কোন প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথেই বলছি যে, এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.)-এর কিতাবাদি, বিশেষত তাঁর মালফুযাত ও মাওয়ায়েজ খুবই ফলপ্রসূ। আমি আলহামদুলিল্লাহ তাঁর মালফুযাত ও মাওয়ায়েজ দ্বারা যারপরনাই উপকৃত হয়েছি। তাঁর কিতাবাদি, মালফুযাত ও মাওয়ায়েজ পাঠ করলে আপনার মধ্যকার ক্রটি-বিচ্ছ্যতিগুলো আপনার নিকট ধরা পড়বে। নিজের অর্থলিঙ্গা, মর্যাদালিঙ্গা ও জীবন যাপনের অন্যান্য ক্রটিগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। বিশেষত সম্মিলিত কাজ-কর্মে চারিত্রিক ও আচরণগত ক্রটি সংশোধনের ব্যাপারেও তার মজলিসে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। আল্লাহ তাঁর দ্বারা আখলাকের ইসলামের এই বিশেষ কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিষয়— যুহদ ও ঈসার তথা দুনিয়াবিমুখতা ও ত্যাগ ও কুরবানী। ইসলামের ইতিহাস, বিশেষত ইসলামী দাওয়াত ও আযীমতের ইতিহাস এবং ইসলামের সংস্কার আন্দোলনসমূহের ইতিহাস আমাদেরকে জানান দেয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইলম ও মানব-কল্যাণ সাধনের সঙ্গে, সংস্কার ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের সঙ্গে যুহদ ও ঈসারের মানিকজোড় সম্পর্ক রয়েছে। যুহদ ও ঈসার এসব কর্মকাণ্ডের সহযাত্রী ছিল সব সময়। আপনি যদি ইসলামের সমগ্র ইতিহাসের খোঁজ-খবর নেন, তাহলে দেখবেন— এতদূভয়ের সম্পর্কে কখনও ভাটা পড়েনি। আল্লাহ, তাআলা যাঁদের মাধ্যমে উম্মতের কল্যাণ বিহিত করেছেন এবং উম্মতকে কোন বড় ফেতনা থেকে রক্ষা করেছেন তাঁদের সকলের মধ্যেই এই গুণ ছিল অভাবিত

পর্যায়। তাঁরা ছিলেন অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি নিরাসক্ত ও পরহিতব্রতী। নিঃস্বার্থবাদিতা, ত্যাগ ও কুরবানী ছিল তাঁদের ভূষণ।

ফেতনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফেতনা ছিল ইরতিদাদ তথা দ্বীন ত্যাগের ফেতনা। এই ফেতনার মোকাবেলা করেছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)। দ্বিতীয় বড় ফেতনা ইসলামের ইতিহাসে খালকে কুরআন তথা কুরআনের সৃষ্টত্ব মতবাদের ফেতনা। এই ফেতনার মোকাবেলা করেছিলেন হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। এরপর এসেছে দর্শনের আক্রমণ। এর মোকাবেলায় যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইমাম গাযযালী ও আবুল হাসান আশআরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে যে ফেতনাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মোকাবেলায় এসেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া সহ বেশ কিছু উলামায়ে কেরাম। ভারতে যখন পার্থিব স্বার্থচিন্তা ও উদাসীনতার কুফল স্বরূপ এবং শাসকবর্গের কুপ্রভাবে মর্যাদা ও ক্ষমতালিন্সা, অর্থলোলুপতা ও প্রবৃত্তি পূজার ন্যায় নিন্দনীয় সব চরিত্রের প্রকাশ ঘটতে থাকল তখন সুফিয়ায়ে কেরাম এগুলোর প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। অতঃপর অমুসলিমদের প্রভাবে মুসলিম সমাজে যে বিদআত ও শিরকী আকীদা-বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটল এবং وحدة الوجود তথা অস্তিত্বের একত্ব বা অন্য কথায় ‘সবই তিনি’ –এই দর্শনের যে প্রভাব দার্শনিক ও সুফী থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিকদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলল তার মোকাবেলা করতে এগিয়ে এলেন হযরত মুজাদ্দের আলফেসানী (রহ.)। অতঃপর ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের ভারতীয় জাহেলিয়াত। এর কারণ ছিল সুযোগ্য উস্তাদের তত্ত্বাবধান ব্যতীত কুরআন ও হাদীস চর্চার প্রবণতা। সঙ্গে ছিল আঞ্চলিক একটা প্রভাব। সেই সময়ে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের প্রতি সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল অনাগ্রহ, আকীদা-বিশ্বাসে ধরেছিল ঘুণ। এসবের মোকাবেলায় এগিয়ে এলেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) ও তাঁর খলীফাবন্দ। যুগ সংস্কারক ও উম্মতের কল্যাণ সাধক এই সকল ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই যুহদ ও ঈসারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

মোটকথা ইসলামের গোটা ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, সংস্কার ও উম্মতের কল্যাণ সাধন কর্মের সঙ্গে যুহদ ও ঈসারের একটি সৃষ্টিগত ও স্বাভাবিক বন্ধন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সে বন্ধন কখনও ছিন্ন হয়নি। এই কারণেই আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বলছি যে, ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন, অর্থ ও দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। অন্যান্য জাতির মধ্যেও কোন বৃহৎ কর্ম ত্যাগ ও কুরবানী ব্যতীত সাধিত হয়নি। অতএব নিজেদেরকে সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা থেকে বেঁচে থাকুন। দুনিয়ার

সম্পদ ও পদ-পদবীকে জীবনের লক্ষ্য বানাবেন না। কোন জায়গা থেকে লোভনীয় প্রস্তাব আসল আর চোখ বন্ধ করে সেখানে চলে গেলেন তা যেন না হয়।

ইতিহাস আমাদেরকে আরও জানান দেয় যে, ত্যাগ ও কুরবানী ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহতায় যে প্রকৃত শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ হয়, যে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয় তা অন্য কিছুতেই হয় না। কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়েও অনেকে ঐ শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

অনেক সময় আহারের একটি মাত্র গ্রাসকেও গলাধঃকরণ করতে তারা ভয় পায়। কোন এক বিত্তশালীকে বলতে শোনা গেছে যে, তোমরা আমার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে নাও। বিনিময়ে আমার পরিপাক যন্ত্রকে সুস্থ করে দাও, আমি যেন কিছু পানাহার করতে পারি। ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মত অর্থের যোগান দান আল্লাহ তাআলার বিস্মায়। তা সহজভাবে ও সম্মানের সাথে লাভ হয়ে থাকে।

বলা উচিত না হলেও বলছি যে, আমি এবং আমার কিছু বন্ধুবর্গ আজ যে স্তরে উন্নীত হয়েছি তা শুধু বুয়ুর্গ ও মুরব্বীদের ফয়েয ও বরকতে এবং কিতাবে পঠিত বিষয়ের প্রভাবে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেছেন বলেই। তা না হলে আল্লাহ জানেন, হয়তো বা কোন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে থেকে অবসর গ্রহণ করতাম, আর যা কিছু পেনশন পেতাম তাই নিয়ে কোন পাড়াগাঁয়ে জীবন অতিবাহিত করতাম। এই সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই বুয়ুর্গদের ঘটনাবলী স্মরণ হয়। তন্মধ্য থেকে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। ঘটনাটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও দৃষ্টান্তমূলক।

نزهة الخواطر গ্রন্থের শেষ খণ্ডে গ্রন্থটির লেখক আমার মরহুম পিতা মাওলানা নাজমুল গণী রামপুরী সাহেবের বরাতে লিখেছেন যে, মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব ছিলেন দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। রামপুর রাজ্যের পক্ষ থেকে তিনি শিক্ষকতা বাবদ পনেরো কি বিশ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। তাঁর শাস্ত্রীয় যোগ্যতার খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বেরেলীতে যখন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর প্রিন্সিপ্যাল মিষ্টার হকিস তাঁকে দুইশত টাকা বেতনে বেরেলী কলেজে শিক্ষকতা করতে প্রস্তাব পেশ করেন। মাওলানার জবাব ছিল অত্যন্ত সরল। তিনি জবাবে বললেন, বেরেলী কলেজে যোগদান করলে আমার এই পনেরো টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। মিষ্টার হকিস বললেন, আপনি গণিত শাস্ত্রের এত বড় পণ্ডিত অথচ দুইশত টাকা আর পনেরো টাকার পার্থক্য বোঝেন না? তিনি পুনরায় অজুহাত দেখিয়ে বললেন, এখানকার ছাত্রদের পড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মিষ্টার হকিস বললেন, এখানকার ছাত্ররা সকলেই আমার কলেজে চলে যাবে। আমি তাদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করব। মাওলানা জবাবে বললেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, আমার ঘরের পাশে একটি বরই গাছ আছে। এই গাছের টাটকা বরই দিয়ে প্রত্যহ সকালে আমি নাস্তা করে থাকি, বেরেলী কলেজে গেলে তো এই বরই পাব না। ফলে আমার স্বাস্থ্যহানী ঘটবে।

ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল বলল, ডাক বিভাগের গাড়ির মাধ্যমে এই বরই প্রত্যেক দিন সকালে আপনার সামনে উপস্থিত করা হবে। মাওলানা জবাবে বললেন, এ সবই যথার্থ। কিন্তু কাল কিয়ামতে আল্লাহ যখন বলবেন, তুমি রামপুর ছেড়ে বেরেলী কলেজে গিয়েছিলে রামপুরে তুমি পনেরো টাকা পাও, বেরেলী কলেজে গেলে দুইশত টাকা পাবে শুধু এই জন্যে? তখন আমি কী জবাব দেব? ইংরেজ তো ইংরেজই ছিল। সে বলল, না, এর কোন জবাব আমার কাছে নেই।

আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

পুনরায় এরূপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হওয়া উচিত। সকল আসমানী গ্রন্থ ও আখিয়া আলাইহিমুস সালামের জীবন চরিত এবং যুগ-সংস্কারকদের ইতিহাস বলে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইজ্জত ও সম্মান লাভ, আন্তরিক প্রশান্তি ও আত্মিক আনন্দ লাভ ও সেই সঙ্গে রহমত ও বরকত লাভ যুহদ ও ঈসার- ত্যাগ ও কুরবানীর উপর, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও নিঃস্বার্থবাদিতার উপর নির্ভরশীল। এটাই আল্লাহ তাআলার চিরন্তন রীতি, তাঁর ফায়সালা। বর্তমানে নিকৃষ্ট এক মানসিকতার জন্য নিয়েছে যে, যেখানে টাকা-কড়ি বেশি পাওয়া যায়, যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক আরাম-আয়েশ লাভ হয়, যেখানে বিনা ক্লেশে পরিবারের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা হয় সেখানে চলে যাও। এটা একটা ফেতনা। এ থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

তৃতীয় কথা- কথাটি বহু অভিজ্ঞতা প্রসূত। দেখুন, আমি অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেছি। মাযহাব চতুষ্টয়ের কিতাবাদি ছাড়াও তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছি। খুব কম লোকেরই এরূপ অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়। সব অধ্যয়নের নির্যাসরূপ একটি মৌলিক কথা বলছি যে, আহলে সুন্নাতের মত ও পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না। আপনার চিন্তা-চেতনায় যা-ই উদ্ভিত হোক, আপনার মেধা ও মস্তিষ্ক যা-ই বলুক, আপনার ভাণ্ডারে যত শক্তিশালী প্রমাণাদিই থাকুক জমহুর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ ও খালাফের মত ও পথ কখনও পরিহার করবেন না। জমহুর সালাফ ও খালাফের সঙ্গে সর্বকালেই আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্য ছিল এবং আছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখতে

পাই। এই দ্বীনকে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখাই আল্লাহর অভিপ্রায়। টিকে থাকার অর্থ দ্বীনের প্রকৃত রূপ বহাল থাকা। বিকৃতি হতে সুরক্ষিত থাকা। নতুবা বৌদ্ধ ধর্মও টিকে আছে কিন্তু বিকৃত রূপে। ঈসায়ী ধর্মও টিকে আছে কিন্তু বিকৃত রূপে। একে টিকে থাকা বলে না। আর এ কারণেই কুরআন মাজীদে ঈসায়ী বা খ্রিস্টানদেরকে ضَالِينَ (পথভ্রষ্ট) রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় যেহেতু এই দ্বীনকে অবিকৃতরূপে টিকিয়ে রাখা—
যেমনটা তিনি বলেছেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

‘আমিই যিকির অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।’

সেহেতু তিনি প্রত্যেক যুগেই স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী, স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদেরকে তিনি দান করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমের যোগ্যতা ও চূড়ান্ত ইখলাস। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতি তাঁর মদদ ও সাহায্য তো আছেই। আমাদের, আপনাদের সকলের উস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) তাঁর কিছু শাগরেদকে বলেছিলেন এবং কথাটি তাঁকে বলেছিলেন তাঁর উস্তাদ মাওলানা শিবলী (রহ.) যে, কিছু লোক আকর্ষণীয় কিছু লেখা পাঠ করে ধোঁকা খেয়ে যায় এবং শহীদদেরকে নিয়ে উপহাস করে থাকে, সালাফে সালাহীন উলামায়ে কেরামকে নিয়ে উপহাস করে। বিখ্যাত সব তাফসীরবিদ তাদের সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব জমহুরের মত ও পথের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রাখুন। এতেই কল্যাণ নিহিত। এতেই আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ও তাঁর নুসরত ও বরকত নিহিত।

এই কয়েকটি কথা ছিল বলার। হয়তো আমি যথাযথ পদ্ধতিতে কথাগুলো উপস্থাপন করতে পারিনি। কিন্তু আপনারা কথাগুলোকে শত ভাগ সত্য বলে জ্ঞান করবেন। ব্যাপক অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতায় আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে আমি কথাগুলো পর্যন্ত উপনীত হয়েছি। আমানত ও অসিয়ত স্বরূপ আপনাদের নিকট কথাগুলো ব্যক্ত করলাম।

চতুর্থ কথা— ইলম চর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। নিজেকে কখনও ফারেগত তাহসীল বা ইলম অব্বেষণ সমাপণকারী ভাববেন না। যেখানেই থাকুন সব সময় নতুন ও পুরাতন কিতাবাদি অধ্যয়ন করুন। কুরআনের তাফসীর, হাদীসের

ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং ইতিহাস গ্রন্থের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখুন। যে সকল কিতাব ইলমুল কালাম বা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিত, যে সকল কিতাবে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত হয়েছে সে সকল কিতাব সব সময় অধ্যয়ন করুন এবং নিজের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন।

وما علينا الا البلاغ المبين

গন্তব্য কোথায়?

[১৯৭১ ইং সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে বহু আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুয়ুর্গানে দ্বীনের জনাছান ভাটকলের প্রসিদ্ধ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামেয়া ইসলামিয়া ভাটকলের শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দের সামনে প্রদত্ত ভাষণ।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يَضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ
أَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

আমার বন্ধুবর্গ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও মুরুব্বীগণ!

আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, পৃথিবীতে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা অপেক্ষা অধিক স্নেহ-মমতা আর কারও নেই। যদি কোন নারী কিংবা কোন মানুষ মায়ের ভালবাসা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা ও মমতার দাবি করে তবে সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী বলে, মিথ্যাবাদী মনে করে। তার দাবিকে বানোয়াট, কপট ও মিথ্যা দাবি মনে করে। সন্তানের প্রতি মায়ের অন্তরে আল্লাহ তাআলা মমতা ঢেলে দিয়েছেন। মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মায়ের অন্তরে এই মমতা বিদ্যমান। সন্তানের প্রতিপালনের জন্য মায়ের মমতা এক বিশেষ ব্যবস্থাপনা। যদি সন্তানের প্রতি মায়ের এই বিশেষ মমতা ও ভালবাসা না থাকত তবে সন্তানের প্রতিপালন খুব কঠিন হয়ে পড়ত। যেসব শিশু কোন কারণে মায়ের মমতা থেকে বঞ্চিত থাকে

সেসব শিশুর জন্য প্রতিপালনের যত উত্তম ব্যবস্থাই করা হোক না কেন খোদাপ্রদত্ত, কুদরতী ও অকৃত্রিম ঐ মমতা থেকে সে বঞ্চিতই থেকে যায়, মায়ের অভাব আর কেউ পূরণ করতে পারে না। ফলে শিশুর মানসিক ও মেধাগত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ বাবার ভালবাসা ও মমতার কথাও বলা যায়। এটাও কুদরতী ও খোদাপ্রদত্ত। সন্তানের প্রতি বাবার ভালবাসা কেনই বা থাকবে না। সন্তান তো তার শরীরের অংশ, তার কলিজার টুকরা। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে ভালবাসে সে অবশ্যই সন্তানকে ভালবাসবে। কারও যদি স্বভাবের বিকৃতি ঘটে অথবা তার জীবনে এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে যার ফলে সন্তানের প্রতি তার মায়া-মমতা থাকে না তবে সেটা ভিন্ন কথা। তা না হলে পিতা-মাতা তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী, তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সন্তানের জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করে তা-ই তারা করে থাকে।

উন্নতির প্রতি নবীর্ণের অসাধারণ মমতা ও ভালবাসা

তবে পিতা-মাতার ভালবাসা অন্ধ হয়। এমনিতেই ভালবাসা অন্ধ হয়। মায়ের ভালবাসা অপেক্ষাকৃত বেশি অন্ধ হয়। ফলে মা শিশুর সকল আবদার, সকল অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা করে। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য তা কল্যাণকর কি অকল্যাণকর মা অনেক সময় তা বিবেচনায় আনে না। ভালবাসাপ্রসূত আবেগ তাকে অন্ধ করে ফেলে। অনেক সময় সন্তানের জন্য যা ক্ষতিকর সেরূপ আবদারও পূরণ করে থাকে। আজ মজ্জবে যেতে চাইল না, অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন অজুহাত দেখাল তো মা তাতে সায দিয়ে তাকে আর মজ্জবে পাঠালেন না। সন্তান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকল। এরূপ হাজারো দৃষ্টান্ত ভুলে ধরা যেতে পারে। যা হোক, মানুষের দৈহিক প্রতিপালন ও পার্থিব উন্নতির ব্যবস্থাপনা যেরূপ পিতা-মাতার মায়া-মমতা ও ভালবাসার উপর ভর করে চলছে, তদ্রূপ মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক প্রতিপালন ব্যবস্থা, সত্য বলতে- এই জগতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা আত্মিয়ায়ে কেরামের মায়া-মমতা ও ভালবাসার ভিত্তিতে চলছে। যে সকল পিতা-মাতা কিছুটা বুদ্ধি রাখে, কিছুটা দূরদর্শী হয়, সন্তানের ভবিষ্যতের প্রতি যাদের কিছুটা দৃষ্টি থাকে তারা সন্তানের সকল অনুরোধ, সকল জিদ পূরণ করে না। তাদের অন্যায় আবদার তাঁরা কখনই রক্ষা করে না। অনেক সময় তাঁরা সন্তানকে কাঁদান, তাদেরকে শাস্তিও দিয়ে থাকেন। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য যা কল্যাণকর তাই তাঁরা করে থাকেন। সন্তান মাদরাসায় যেতে চায় না তাঁরা জোরপূর্বক তাকে মাদরাসায় প্রেরণ করেন। সন্তান ঔষধ খেতে চায় না,

জোরপূর্বক ঔষধ খাওয়ান। সন্তান অপারেশন করাতে চায় না তাঁরা অপারেশন করান। পিতা-মাতা অপেক্ষা সন্তানের প্রতি অধিক ভালবাসা আর কার হতে পারে? কিন্তু তারা এই সবকিছু করেন সন্তানের কল্যাণের জন্যই। এটাই প্রকৃত ভালবাসা। এই ভালবাসা না থাকলে মানবজাতি শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ, সর্বোপরি মানবতা থেকে বঞ্চিত থাকত। তো যেরূপ এই পার্থিব প্রতিপালন ব্যবস্থা চলছে পিতা-মাতার মাধ্যমে, তদ্রূপ মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক প্রতিপালনের ব্যবস্থা নবীগণের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তাআলা উম্মতের প্রতি তাঁদেরকে এত মমতা ও ভালবাসা দান করেছেন, যার সামনে পিতা-মাতার মমতা ও ভালবাসা নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছ। আমাদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব যে, উম্মতের প্রতি নবীগণের অন্তরে কী পরিমাণ ভালবাসা থাকতে পারে। নিজের উম্মতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কুরআন মাজীদে যে আয়াতখানি আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি, আমাদের কিছুটা জ্ঞান যদি থেকে থাকে, নবীর জীবন চরিত ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা যদি ওয়াকিফহাল থেকে থাকি তাহলে একজন মুসলমান হিসেবে আয়াতখানির প্রতিটি শব্দ নয়, বর্ণ নয় বরং প্রতিটি নুজায় আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

‘অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি দয়াদ্রু ও পরম দয়ালু। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।’

আয়াতে বলা হয়েছে, এ রকম একজন নবী এসেছেন যিনি তোমাদেরই একজন। তিনি যদি আমাদের মধ্য থেকে না হতেন তাহলে আমাদের দুঃখ-বেদনার অনুভূতি তাঁর হত না। আমাদের সঙ্কটকে তিনি অনুধাবন করতে পারতেন না। অনুধাবন করলেও ঐ সঙ্কটের অংশীদার হতেন না। একমাত্র মানুষই পারে মানুষের দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করতে। তাইয়ের কষ্ট ভাই অনুভব

করতে পারে। একই গ্রামের অধিবাসীরা একে অপরের দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে। অবশ্য একই গ্রামের অধিবাসীরা অনেক সময় একে অপরের সঙ্কট উপলব্ধি করতে পারে না। প্রদেশ ও দেশ আরও বড়। আর গোটা বিশ্ব তো অনেক পরের ব্যাপার। একটি ছোট্ট গ্রামের অধিবাসীরাও অনেক সময় একে অপরের সঙ্কটকে উপলব্ধি করতে পারে না।

যা হোক, আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

তোমাদের নিকট একজন নবী এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই। অর্থাৎ যিনি তোমাদের মানব জাতিরই একজন। তোমাদের কষ্টে তিনিও কষ্ট অনুভব করেন। তোমাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা তিনি বরদাশত করতে পারেন না। তোমাদের যন্ত্রণায় তাঁর জীবন বের হওয়ার উপক্রম হয়।

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

তোমাদের কষ্টে, তোমাদের দুঃখ-বেদনা দেখে তোমাদের প্রতি ভালবাসার কারণে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন।

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

তিনি তোমাদের মঙ্গলাকাজক্ষী। তিনি তোমাদের চিন্তায় বিভোর থাকেন। তাঁর ধ্যান ও খেয়াল তোমাদেরকে নিয়েই। তোমরা আল্লাহর মকবুল বান্দা হয়ে যাবে, তোমাদের প্রতি সর্বদা আল্লাহর রহমত থাকবে, তাঁর ক্ষমা থাকবে তোমাদের জন্য, আল্লাহর ব্যাপারে সামান্যতম উদাসীনতায় তাঁর রহমত থেকে তোমরা যেন বঞ্চিত না হয়ে যাও, কুফরী কোন কথা তোমাদের হৃদয়ে ঠাঁই পাওয়া তো দূরের কথা মুখেও যেন উচ্চারিত না হয়, মানুষ যেন জাহান্নামীদের দলের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়, শয়তানের দলভুক্ত যেন হতে না পারে। সকল মানুষ যেন আল্লাহ তাআলার রহমতের আওতায় চলে আসে।

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

মুমিনদের প্রতি দয়াদ্র ও পরম দয়ালু। উম্মতের প্রতি রাসূলের মায়া-মমতা কী পর্যায়ে ছিল, উম্মতকে নিয়ে তাঁর চিন্তা-ফিকির কী পরিমাণ ছিল তা আপনারা অনুমান করতে পারবেন না। ব্যস, এতটুকু বুঝুন যে, এক মায়ের একজনই মাত্র

সন্তান আছে। ঐ একজন সন্তানই তার জীবন-আশ্রয়, তার ঘরের প্রদীপ। ঐ সন্তানের প্রতি তার মায়ের যতটুকু চিন্তা-ফিকির হতে পারে, যতটুকু মায়্যা-মমতা থাকতে পারে, তার উন্নতিতে তার মায়ের যে পরিমাণ আনন্দ অনুভূত হতে পারে তার কষ্টে তার মায়ের যতটুকু কষ্ট হতে পারে, উন্মত্তের প্রতি একজন নবী ও রাসুলের ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক তদপেক্ষা অনেক বেশি। সাহাবায়ে কেরামের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা তো বলাই বাহুল্য। এমনকি যারা মক্কার অধিবাসী ছিল, তখনও মুসলমান হয়নি তারা যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসল তখন নামাযের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তি পাচ্ছিলেন না, অস্থির ও পেরেশান হয়ে পড়ছিলেন। অথচ নামায ছিল তাঁর চোখের শীতলতা। নামাযে যে শান্তি তিনি পেতেন তা কোথাও তিনি পেতেন না। নামাযের প্রতি তাঁর যে আসক্তি ছিল, নামাযে তাঁর যে নিমগ্নতা থাকত তা অনুমান করাও আমাদের জন্য দুঃসাধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে বসা থাকতেন। মজলিসে আলোচনা চলত। দীন সংক্রান্ত আলোচনাই হত বৈ কি। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তাবলীগ সম্পর্কে আলোচনা চলত। কুরআন ও হাদীসের আলোচনা চলত। কিন্তু নামাযে উপস্থিতি তাঁর নিকট এত প্রিয় ছিল, নামাযের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এত বেশি ছিল যে, তিনি নামাযের জন্য ব্যাকুল হয়ে হযরত বেলাল (রাযি.)কে বলতেন, হে বেলাল! আযান দিয়ে আমাকে শান্তি দাও। অনেক অপেক্ষা করেছি, আর অপেক্ষা সইছে না। আল্লাহর ওয়াস্তে আযান দাও, যাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারি, আরাম পেতে পারি। নামাযের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, নামাযের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এইরূপই ছিল। এতদসত্ত্বেও নামাযরত অবস্থাতেও তিনি উন্মত্তের চিন্তা করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কখনও কখনও আমি নামাযে থাকি আর পিছনে শিশুর কান্নার আওয়াজ পাই, ফলে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি। অর্থাৎ অন্তর তো চায় নামায দীর্ঘ করতে, হৃদয় উজাড় করে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে, একাগ্রতা ও আকুতি সহকারে লম্বা লম্বা সিজদা করতে, আল্লাহর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ একান্ত আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকতে, তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে, তাঁকে রাজী-খুশি করতে কিন্তু শিশুর কান্নার শব্দ পাই আর চিন্তা হয় যে, শিশুর মা হয়তো পেরেশান হবে, নামাযে তার মন বসবে না, শিশুকে কোলে তুলে নিতে তার হৃদয় ছটফট করবে তাই নামায সংক্ষিপ্ত করে দেই। উন্মত্তের প্রতি এতদপেক্ষা মায়্যা-মমতা আর কী হতে পারে? নামাযের সাথে আমাদের সেই পরিমাণ হৃদয়ের সম্পর্ক নেই। নামাযের সাথে যাদের হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে তারা অনুধাবন করতে পারে যে, নামায

সংক্ষিপ্ত করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কত বড় ত্যাগ ও কুরবানী ছিল।

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা ও ভালবাসা কী পরিমাণ ছিল তা তাঁর একটি বক্তব্য দ্বারাও আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। তিনি বলেন, ‘আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি আগুন জ্বালল, আর পতঙ্গপাল উড়ে এসে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল।’

বর্ষার মৌসুমে আপনারা দেখে থাকবেন যে, কীট-পতঙ্গ উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। একটি প্রদীপ জ্বাললেই হল। ব্যস হাজার হাজার কীট-পতঙ্গ তাতে উড়ে এসে পড়ে। আলো জ্বালতেই আল্লাহ জানেন, তাদেরকে কে সংবাদ দেয়— দলে দলে এসে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। তো রাসূল বলেন, তোমাদের দৃষ্টান্ত এ রকমই যে রকম কেউ আগুন জ্বালে আর পতঙ্গপাল ছুটে এসে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর নিজের সর্বনাশ করে। তদ্রূপ তোমরাও জাহান্নামের আগুনে নিপতিত হতে চাও, দোষখে প্রবেশ করে নিজের সর্বনাশ করতে চাও, আর আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে টেনে এনে আগুন থেকে রক্ষা করতে চাই। উম্মতের সাথে রাসূলের সম্পর্ক এ রকমই। উম্মতের প্রতি তাঁর ব্যাকুল ভালবাসা। এত ব্যাকুলতা যে, আল্লাহ তাআলাকে বলতে হয়—

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণীতে বিশ্বাস করল না বলে তুমি কি তাদের পিছনে ঘুরে দুঃখে আত্মবিনাশ করে ফেলবে?

উম্মতের কেউ যেন জাহান্নামে না যায়, সকলেই যেন জান্নাতে যেতে পারে এই চিন্তায় সর্বদা তিনি ব্যাকুল থাকতেন। এ ব্যাপারে তিনি তো তিনি, তাঁর অনুগত বান্দারা পর্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন। আপনারা সাহাবায়ে কেরাম ও সুফী মাশায়েখ ও বড় বড় উলামায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে জানতে পারবেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উত্তরাধিকার যথাযথভাবে বহন করেছেন। তাঁরা তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতি যে ভালবাসা পোষণ করতেন, তাদেরকে যেরূপ মায়া-মমতা করতেন, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের এই দিকটা পরিস্ফুট হয়ে উঠত। এতদসম্পর্কে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি একবার এক মজলিসে দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। দলে দলে লোক এসে সমবেত হতে থাকল। এক সময় ছায়াবিশিষ্ট জায়গা ভর্তি হয়ে গেল। পরবর্তীতে যারা আসল তারা রোদে

দাঁড়িয়েই তাঁর কথা শুনতে থাকল। তিনি হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা ছায়ায় চলে আস। তোমরা রোদে দাঁড়িয়ে আছ আর আমার দেহ পুড়ে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের অবস্থা এইরূপই ছিল। অপরের কষ্ট তারা এত তীব্রভাবে উপলব্ধি করতেন যে, রোদে দাঁড়িয়ে থাকত অন্য কেউ, আর তাঁরা নিজের দেহে জ্বালা অনুভব করতেন।

হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার অপর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনগুলো ব্যতীত সারা বছরই রোযা রেখে কাটাতেন। ইফতারের সময় দস্তরখান বিছানো থাকত। লোকেরা হালুয়া ইত্যাদি খাবার নিয়ে আসত। তিনি তাঁর পছন্দ মোতাবেক খাবার গ্রহণ করতেন। অনেক সময় দেখা যেত দস্তরখানের দিকে শুধু হাত বাড়িয়ে রেখেছেন, ব্যস। নামে মাত্র দুই-এক লোকমা আহার করেছেন আর দস্তরখান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এইরূপ দেখে একবার একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি খাবার খান না কেন? আমরা আপনাকে দেখলাম, মাত্র দুই-এক লোকমা খেতে? কারণ কী? তিনি বললেন, তোমরা যা কিছু আহার কর তা আমার পেটেই যায়। আমার অনুভব হয়, তোমাদের আহারকৃত খাদ্যগুলো আমার পেটে প্রবেশ করছে। সুবহানাল্লাহ!

নিযামুদ্দীন আউলিয়ার একজন খাদেমের বর্ণনা— আমি সাহরীর খাবার নিয়ে আসতাম। তিনি কখনও পেট ভরে খেতেন না। দুই-এক লোকমা খেয়েই উঠে যেতেন। আমি একদিন তাঁকে বললাম, হযরত! ভালমত কিছু আহার করুন না! বয়স তো আশির উপরে। এই বয়সে ঠিকমত খাবার না খেলে চলবেন কী করে? তিনি বললেন, মিয়াঁ ইকবাল! তুমি কি জান না, আল্লাহর অনেক বান্দা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মসজিদের আঙ্গিনায় রাত যাপন করছে? তুমি কি জান, দিল্লীর মুসাফির খানায় কত মুসাফির যবের এক টুকরো রুটির অপেক্ষায় প্রহর গুণছে? তারা আহার পায় না, আমি কি করে উদরপূর্তি করে আহার করতে পারি? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের, তাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারীদের জীবনের এরূপ অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

সকল আস্থিয়া আলাইহিমুস সালাম স্ব-স্ব উম্মতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করতেন। তাঁদের মায়ামমতা ছিল অপরিসীম। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা ও মমতা ছিল পিতা-মাতা অপেক্ষাও অধিক। তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা ছিল, তাঁর ধ্যান-জ্ঞান কামনা ছিল উম্মত জাহান্নামের বেড়া

পার হয়ে যাক, জাহান্নাম থেকে তাদের মুক্তি লাভ হোক, একজন উম্মতিও যেন জাহান্নামে না যায়, একজনও যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। তিনি মানুষের সামনে যে ইতিহাস রেখে গেছেন, হেদায়েতের যে পথ বাতলে গেছেন সে অনুযায়ী চললে মুসলমানরা অবশ্যই সফলতা লাভ করবে। দুনিয়াতেও সফলতা লাভ করবে, আখেরাতেও সফলতা লাভ করবে। দুনিয়ায় হৃদয়ের শান্তি লাভ করবে। আখেরাতে জান্নাতের স্বাদ উপভোগ করবে। দুনিয়াতেই জান্নাতের সুবাস ও সুবাস গ্রহণ করতে পারবে। আউলিয়ায়ে কেরামের উক্তি উদ্ধৃত আছে যে, আল্লাহর কসম! আমরা জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করছি। আরেফগণের অনেকেই বলতেন, দুনিয়ার লোকেরা যদি জানত, আমরা কোন জান্নাতে বিচরণ করছি, আমরা যে সুখ ও শান্তি লাভ করি তা যদি তারা জানত তাহলে আল্লাহর কসম! তারা আমাদেরকে আমাদের জায়গায় বসতেই দিত না। আমাদেরকে কোন কাজ করতে দিত না, তরবারী হাতে নিয়ে আমাদের উপর হামলা করত, আমাদের সেই অপার্থিব সুখ কেড়ে নিত। দুনিয়া আমাদেরকে দেখে, ‘আমরা ক্ষুধার্ত’ পেটে পাথর বেঁধে রয়েছে, তালিযুক্ত ও জীর্ণবস্ত্র পরিধান করছি। ধন-দৌলতের দিক থেকে দুনিয়া আমাদেরকে নিঃস্ব ও অসহায় মনে করে, আমাদেরকে গরীব ও ফকীর মনে করে কিন্তু আমরা তো দুনিয়াতে জান্নাতের স্বাদ লুটে নিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন ইয়াকীন ও বিশ্বাসের অমূল্য সম্পদ, দান করেছেন আত্মিক পরিতৃপ্তি, হৃদয়ে দান করেছেন পরমুখাপেক্ষীহীনতার ঐশ্বর্য, অন্তর থেকে তিনি দূর করে দিয়েছেন সর্বপ্রকার ভীতি ও দুঃখ-বেদনা, দূর করে দিয়েছেন সব রকম পার্থিব কামনা। না কারও নিকট আমাদের কোন প্রত্যাশা আছে, না কারও প্রতি ভীতি। আমরা এইভাবেই জান্নাতের স্বাদ ও মজা উপভোগ করছি। জান্নাত আর কাকে বলে? জান্নাত তো তা-ই যেখানে কোন কিছুর ভীতি থাকবে না, বিপদের কোন আশঙ্কা থাকবে না। থাকবে না সেখানে অতীত ভুলের জন্য দুঃখ ও লজ্জা, ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা-ফিকির। আমাদের আউলিয়ায়ে কেরাম এইরূপ যিন্দেগীই লাভ করেছিলেন।

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার নিশ্চয়তা

বন্ধুগণ!

আমি আপনাদেরকে যে কথা বলতে চাই তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, যে শিক্ষা তিনি আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন, যে কিতাব নিয়ে এসেছেন সেই পথ ও শিক্ষা এবং

সেই কিতাব অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে আমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই সফলতা লাভ করতে পারি। এতদ্ব্যতীত আমরা যতই বুদ্ধিমান হই না কেন, যতই দার্শনিক বা অন্য কিছু হই না কেন আমরা না দুনিয়াতে কামিয়াবী ও সফলতা লাভ করতে পারব, না আখেরাতে। তাঁর আনুগত্যেই কামিয়াবী ও সফলতা নিহিত। তাঁর প্রদর্শিত পথেই সৌভাগ্য লাভ হতে পারে। তিনি যে পথ বাতলেছেন তাতেই আমাদের কামিয়াবী ও নাজাত, সফলতা ও মুক্তি।

আমাদের বুদ্ধি আমাদেরকে কী বোঝায়? আমাদের বুদ্ধি আমাদেরকে বোঝায় যে, আধুনিক জীবন ব্যবস্থায়, আধুনিক দর্শন ও শিক্ষায় রয়েছে উন্নতি। আমাদের প্রবৃত্তি আমাদেরকে দর্শন শেখায়, জ্ঞান দান করে যে, ধর্ম, ধর্মের কল্যাণ— এসব আবার কী? পৃথিবীর মুসলমানদের সমস্যা, ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা ও সঙ্কট— এসব আবার কী? খাও-দাও ফুটি কর। যত পার অর্থ উপার্জন কর। অর্থ উপার্জন কর, নিজে ভোগ কর, সন্তানদের জন্য রেখে যাও। উন্নতমানের বাড়ি তৈরি কর, বাংলা বানাও, জমি ক্রয় কর। বিদেশে যাও, ভ্রমণ কর, ফুটি কর। অযথা কোন্ চিন্তায় সময় নষ্ট করছ? কোথায় আখেরাত, কোথায় হিসাব-নিকাশ? দ্বীনী সমস্যা, মুসলমানদের সমস্যা, এসব নিয়ে কিসের চিন্তা? এইসব ঝঞ্ঝাটে পড়লে কি আর আমরা খেতে পারব? ফুটি করতে পারব? এসব নিয়ে অযথা পেরেশান হয়ে কোন লাভ আছে? খামাখা এসব পেরেশানী কেন ক্রয় করতে যাওয়া? খাও-দাও ফুটি কর। Eat drink and Be new। আমাদের প্রবৃত্তি আমাদেরকে এই ইউরোপীয় দর্শনের তালীম দেয়। ব্যক্তি সমস্যাকেই প্রধান সমস্যা, পার্শ্বব সমস্যাকেই প্রধান সমস্যা বলে আমাদের সামনে তুলে ধরে। প্রবৃত্তি আমাদেরকে বলে যে, জাতীয় সমস্যা, দ্বীনী সমস্যা— এসব আসলে কিছু নয়। বরং পার্শ্বব ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যাই বড় সমস্যা। এই দর্শনের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কী উপার্জন করা হচ্ছে, কিভাবে উপার্জন করা হচ্ছে, কী খাওয়া হচ্ছে, কিভাবে খাওয়া হচ্ছে, কোন বস্ত্র পরিধান করা হচ্ছে, কিভাবে পরিধান করা হচ্ছে, কোন খাতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে—এসবের কোন তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। মানুষের জীবন তো এ রকম হতে পারে না। এটা জীব-জানোয়ারের জীবন। বানরের জীবন। বানরের জীবন, গাধার জীবন, গরু-ছাগলের জীবন কিরূপ হয়? যা পায় তাই খায়। শুধু খাওয়া, পান করা এটাই তাদের জীবনের মূল কর্ম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জীব-জানোয়ার অনেক সময় নিজের বাচ্চাদের প্রতিও খেয়াল রাখে না। অনেক সময় দেখা গেছে বাচ্চার মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে তারা নিজেরা সেই খাবার খেয়ে নেয়। বাচ্চাকে খেতে দেয় না। এটাই পশুত্ব

দর্শন। আমাদের প্রবৃত্তি আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিতে চায়। প্রবৃত্তি ও শয়তান বলে যে, অপরের চিন্তায় নিজেকে বিনাশ করছ কেন? সর্বদা অপরের চিন্তায় কেন নিমগ্ন থাক? আমাদের প্রবৃত্তি আমাদেরকে বলে, আমাদেরকে বোঝায় যে, জীবন-মরণ আবার কী?

إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

‘আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও জীবিত থাকি। (সবকিছু এই দুনিয়াতেই ঘটে) আমরা কখনও পুনরুত্থিত হব না।’ অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনই শেষ কথা। আজ আমরা জীবিত আছি কাল মরে যাব। কোথায় ধর্মের প্রশ্ন, কোথায় জাতীয় প্রশ্ন, ধর্মীয় কল্যাণের প্রশ্নই বা কি, কিসের দ্বীনী তালীম, দ্বীনী তারবিয়াত? এই দেশে কী হচ্ছে, পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থা কী হবে এসব নিয়ে আমাদের ভাবনা কিসের, দায়িত্ব কিসের? আমাদের দায়িত্ব শুধু খাওয়া-পরা এবং সন্তানদেরকে পার্থিব শিক্ষা-দীক্ষা দান করে পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। মরণ পরবর্তী জীবনে কী হবে, এই দেশের ধর্মীয় ভবিষ্যত কী, মুসলমানদের ভবিষ্যত কী –এসব চিন্তায় অযথাই কেন আমরা নিজেদের মেধা ও শক্তি ক্ষয় করব? –এটাই প্রবৃত্তির দর্শন, প্রবৃত্তিপূজার দর্শন। দর্শনটি পশুত্ব দর্শন, আত্মকেন্দ্রিক দর্শন। কোন জাতি যখন এই দর্শন অনুযায়ী জীবন যাপন করে, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে যায় তখন তার ফল দাঁড়ায় অত্যন্ত ভয়াবহ। এর ফলে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা। আমরা দেখছি, মামাত ভাই, চাচাত ভাই, ফুফাতো ভাই, তালতো ভাই সহ বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়দের নিয়ে যে একাত্মতা গড়ে উঠত তা এখন আর বজায় থাকছে না। মানবতার চেতনা বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব আত্মীয়দের আত্মীয়তা সম্পর্কও বিলীন হতে বসেছে। পূর্বে সকলকেই একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করা হত। গ্রামের প্রত্যেকেই অপরকে নিজের ভাই বলে জ্ঞান করত। পার্থিব স্বার্থচিন্তা যখন থেকে জেঁকে বসেছে তখন থেকে চিত্র পাল্টে গেছে। এখন এক পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে অপর পাড়ার কোন ছেলের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে পাড়ায় পাড়ায় মারামারি, হানাহানি শুরু হয়ে যায়। কখনও কখনও তা জার্মান ও ব্রিটেনের পারস্পরিক যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধের আকার ধারণ করে।

এই চিন্তা ও দর্শন যদি চলতে থাকে, তবে এক সময় মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই হবে। পরে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হবে। এমনকি অবশেষে পিতা-পুত্র লড়াই শুরু হবে। উন্নতির এই দর্শন যদি এইভাবেই চলতে থাকে, আমাদের জীবনযাত্রা যদি এইভাবেই চলতে থাকে তবে আপনারা

দেখবেন, সন্তানের জন্য পিতার কোন দরদ থাকবে না। দুর্ভিক্ষের সময় যেমনটা দেখা যায়- সন্তানের হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে খেতে- স্বাভাবিক অবস্থাতেও ঠিক তাই দেখা যাবে। সন্তানের গ্রাস মুখ থেকে কেড়ে নেবে তার পিতা এবং তা হবে জাহেলিয়াতের চরম। এতটুকুতেই ঘটনা থেমে থাকবে না। ঘটনা গড়াবে নিজের পর্যন্ত। আপনারা হয়তো দেখবেন হাতের মালিকের বিরুদ্ধে হাত বিদ্রোহ করবে। সে বলবে, জামেয়া ইসলামিয়ার ছেলেরা গতকাল তামাশা দেখাল। মাটি থেকে মুখ দিয়ে পয়সা উঠিয়ে নিল। তুমিও নিজের খাদ্য আমাকে ব্যবহার না করেই সরাসরি মুখ দিয়ে গ্রহণ কর। কারণ খাবার তো তোমার, আমি কেন তোমাকে সাহায্য করব? পা বলবে, আমি কেন চলব? খাবার তো তোমার। খাবারের স্বাদ তো উপভোগ করবে তুমি। সাপ যেভাবে পা ছাড়াই বুকের উপর চলাচল করে, তুমি সেভাবেই বুকে ভর করে এগিয়ে যাও এবং খাদ্য গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্য কষ্ট সহ্যে যাব কেন? দর্শনের ঐ ধারা অব্যাহত থাকলে দেখুন পৃথিবীর অবস্থা শেষ পর্যন্ত কী হয়। পৃথিবী জাহান্নাম অপেক্ষাও মন্দ আবাসস্থলে পরিণত হবে। কেউ কোন সুস্থ চিন্তা করবে না। গরু, ছাগল, হাঁস, বানরের ন্যায় খাবারের গ্রাস গলাধঃকরণ করবে। ইনসাফ ও বে-ইনসাফ এক বরাবর হয়ে যাবে। কোনটাই কোন বিশেষ অর্থ বহন করবে না। কারও অধিকার কেউ স্বীকার করে নেবে না। ত্যাগ ও কুরবানী, নিঃস্বার্থবাদিতা ও পরহিতব্রত প্রাচীন কাহিনীতে পরিণত হবে। প্রাচীন যুগের কল্প-কাহিনীতে পরিণত হবে।

আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূল আমাদেরকে এই দর্শনের বিপরীত দর্শন দান করেন। সুস্থ জীবনযাত্রার প্রণালী শিক্ষা দেন। জীবন যাপনের পদ্ধতি বাতলে দেন। এটাও কি জীবন? খেল, পান করল, পেট পূর্ণ করল ব্যস। জীবনের সংজ্ঞা কি এই? খিক, এই জাতীয় জীবনের প্রতি। জন্তু সদৃশ জীবনের প্রতি, গরু-ছাগলের জীবনসদৃশ জীবনের প্রতি। সে আবার মানুষ কিসের যার হৃদয়ে মানুষের প্রতি ভালবাসা নেই, দরদ নেই, আছে শুধু নিজের ও নিজ সন্তানদের উদরপূর্তির চিন্তা?

নবীগণের মীরাছ

নবীগণ যে জীবন যাপন করেছেন সে জীবনের জন্য শরীয়ত এসেছে, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর ঐ বান্দাগণের সর্বদা চেষ্টা ছিল, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভালবাসা, ত্যাগ ও কুরবানীর জীবন ব্যাপকতর হোক। মানুষ যেন বানর না হয়, গাধা না হয়ে যায়। মানুষের চিন্তা যেন এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ না থাকে যে, আমার নির্ধারিত খাবার আমি পেয়ে যাই। বরং সে যেন

চিন্তা করে, আমার স্ব-জাতি আমারই মত মানুষ। তাদের মধ্যে যারা খাদ্য পাচ্ছে না তাদেরকেও খাদ্য দান করি। অপরকে আহার করানোর মধ্যে সে যেন আনন্দ লাভ করে। অন্যকে ক্ষুধার্ত দেখে নিজে খাদ্য গ্রহণ করতে সে যেন শান্তিবোধ না করে। এটাই নবীগণের মীরাছ ও উত্তরাধিকার। তাঁদের রেখে যাওয়া শিক্ষা। তাঁরা এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের মধ্যে যেন পরহিতব্রত, পরদুঃখকাতরতার চরিত্র ব্যাপকতর হয় সেজন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা আপনারা শুনে থাকবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে পড়ে থাকা এক সাহাবীর নিকট পানি আনা হলে তিনি বললেন, আমি এইমাত্র আরেকজন আহত ভাইয়ের আর্তচিৎকার শুনেছি, আপনি তাকে প্রথমে পানি পান করিয়ে আসুন। দ্বিতীয়জন বলল, আমি অপর একজন আহত ভাইয়ের আর্তচিৎকার শুনেছি, তাকে পানি পান করান। তৃতীয়জন বলল, আমি অপর একজন ভাইয়ের আর্তচিৎকার শুনেছি, আপনি তার নিকট পানি নিয়ে যান। পানি বাহক চতুর্থজনের নিকট গিয়ে দেখে তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন। এরপর একে একে তৃতীয়জন, দ্বিতীয়জন ও প্রথমজনের নিকট এসে দেখে তাঁরা সবাই ইন্তেকাল করে গেছেন। এটাই মানবতা।

মানবতার মর্যাদা এখানেই, তার শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মানবতা প্রতিষ্ঠা করতেই এই উম্মতকে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব এই উম্মতও যদি নিজ নিজ চিন্তায় বিভোর থাকে, নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকার দর্শনে বিশ্বাসী হয়, প্রবৃত্তি যদি শয়তানের অনুগত হয়ে যায়, সত্যকে সত্য বলে জ্ঞান না করে, সত্যকে অস্বীকার করে এবং মনে করে যে, খাওয়া-দাওয়া ও উদরপূর্তি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কর্ম নেই তাহলে বুঝতে হবে যে, এই উম্মত মৃত। বুঝতে হবে যে, এই উম্মতের কোন বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট নেই। নবীগণ বলেছেন, নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকা, স্বার্থ-সর্বস্ব হয়ে যাওয়া ধ্বংসপ্রাপ্তির নামাস্তর।

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে যখন এই চিন্তার উদয় হল যে, আমরা ইসলামের অনেক খেদমত করেছি। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামারকে ত্যাগ করেছি, সবকিছু বিস্মৃত হয়ে আমরা ইসলামের খেদমত আজ্ঞাম দিয়েছি। আমাদের বাড়ি-ঘর উজাড় হয়ে গেছে, ক্ষেত-খামার বরবাদ হয়ে গেছে, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেউলিয়াত্বের শিকার হয়ে গেছে। এখন আমরা কিছু দিনের জন্য ব্যক্তিগত কারবার দেখি। এরপর পুনরায় ইসলামের খেদমতে লেগে যাব। তাঁদের এইরূপ চিন্তা ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য ছিল শঙ্কাধ্বনি স্বরূপ। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে হুশিয়ার করে দেওয়া হল। বলা হল, খবরদার! এইরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয়

দিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনো না। এই চিন্তা করার অর্থ, বিষের পেয়ালা নিজের মুখে তুলে নেওয়া। তাদের স্বরণ করিয়ে দেওয়া হল, তোমরা তোমাদের এই উদ্ভট চিন্তা পরিত্যাগ করে ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ কর, নতুবা তোমাদের পরিণাম হবে অশুভ। বলা হল—

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

‘তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। এই চিন্তা জীবন বিনাশী বিষ। এই বিষ যদি তোমরা পান করে ফেল, দ্বীনের খেদমতকে পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজেদের পার্থিব স্বার্থে জড়িয়ে পড় তবে তোমরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। কারণ কিছু দিনের জন্য যদি তোমরা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য সামলে নেও তাহলে তাতে কী লাভ হবে। জাতি গঠনের কাজ তো হবে না। যদি তোমরা জাতি গঠনের কাজে অবহেলা কর, এই কাজকে উপেক্ষা কর তাহলে

تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

দুনিয়াতে মহা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। নবগঠিত মানবতা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলোর স্তুপে পরিণত হয়ে যাবে। সমগ্র জাতিকে একটি একক মনে কর। গোটা জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার কর। ইসলামকে ভিত্তি করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কায়ম কর।

সাহাবায়ে কেরামের মস্তিষ্কে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার ও দোকানপাটের চিন্তা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দ্বীনের দাবি সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন। বলে দিলেন যে, খবরদার! এটা ধ্বংসাত্মক চিন্তা। জাতীয় স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করা তোমাদের জন্য প্রাণঘাতী বিষতুল্য।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়, এরপর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন তার কথা আর কী বলব? সহায়-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি কোন কিছুর পরওয়া তাদের ছিল না। সবকিছুই তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহর দ্বীনের রাস্তায় সবকিছু তাঁরা সঁপে দিয়েছিলেন। সন্তান-সন্ততির পরওয়া ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরওয়া ছিল না। সারা জীবনের তিল তিল করে সঞ্চয় করা সম্পদের পরওয়া ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম ইসলামকে যে গতি ও শক্তি

দান করে গেছেন সেই গতি ও শক্তিতেই আমাদের শত ক্রটি ও উদাসীনতা সত্ত্বেও ইসলাম অদ্যাবধি টিকে আছে। কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুগণ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর আর কোন পথ নেই। মুসলমানদের উন্নতি ও উৎকর্ষের পথ কোনটি, তাদের প্রকৃত বাণিজ্য ও ব্যবসা কী তা তিনি বাতলে গেছেন। সেই পথ অবলম্বন করুন। শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারবার পরিহার করুন। বর্তমানে উম্মতের অবস্থা হল, সকল চিন্তা আবর্তিত হচ্ছে, ‘আমি’ কে নিয়ে। আমার জীবন, আমার ব্যবসা, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার সম্পদ, ব্যস এই এক চিন্তা। মুসলিম উম্মাহর বড় বড় সঙ্কট ও সমস্যা সামনে আসছে, দ্বীনী শিক্ষার সঙ্কট ও সমস্যা সামনে আসছে কিন্তু মুসলমান পুঁজিপতিরা তাদের অর্থ যক্ষের ধনের ন্যায় আগলে রেখেছে। সামান্য অর্থের প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে না। আলীগড়ের সঙ্কট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্কটগুলোকে মুসলিম বিত্তশালীদের চারজন মিলেই সমাধান করতে পারে। কিন্তু তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ কোমরে গামছা বেঁধে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। চামড়ী চলে যাক দামড়ী যেন যেতে না পারে। চামড়া চলে যাক তবুও এক কানা-কড়িও যেন হাতছাড়া না হয়। কিন্তু সময় যখন আসবে তখন চামড়ীও যাবে দামড়ীও যাবে। চামড়াও যাবে সম্পদও চলে যাবে। এমন সময় আসবে যখন এই কার্পণ্যের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তখন জীবনও যাবে সম্পদও হাতছাড়া হবে। এই অর্থ কিসের জন্য, যদি নিজের চামড়াই না থাকে? মুসলমানদের মধ্যে কার্পণ্যের এই পীড়া মহামারি আকার ধারণ করেছে। মুসলমানদের অর্থ-সম্পদের কোন অভাব নেই। একেক জায়গার মুসলমান সমগ্র ভারতের মুসলমানদের জাতীয় সমস্যার সমাধান করার অর্থনৈতিক সামর্থ রাখে। অর্ধেক নয় তো এক চতুর্থাংশ অভাব পূরণ করতে পারে। কিন্তু তারা নিজেকে নিয়ে মত্ত। জাতীয় ভাবনা তাদের মধ্যে নেই। বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা দেখুন। বোম্বেতে দেখুন, কালিকটে দেখুন, মাদ্রাজে দেখুন, কলিকাতায় দেখুন। দেখবেন, মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসব স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন কোন শিল্প বাণিজ্য তো একচেটিয়া মুসলমানদেরই দখলে। এখানকার অনেক শিল্প বাণিজ্যও মুসলমানদের হাতে। কিন্তু যখনই জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থের আবেদন করা হয়, তখন এই জবাব পাওয়া যায় যে, ‘নিজের চাহিদাই পূরণ হচ্ছে না।’ এরা সবাই জানে,

যখন সময় আসবে কোন বাহানাই আর চলবে না। অথচ আমরা গেলে জিজ্ঞাসা করে যে, কেন এসেছেন?

ধ্বংসের উপকরণ

তোমরা যখন যাকাত আদায় করবে না তখন তোমাদের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত ট্যাক্স বসিয়ে দেওয়া হবে। যখন কোন জাতি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যাকাতরূপে নির্ধারিত অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে আল্লাহ তাআলা তখন তাদের উপর রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ সহ নানা রকম আকারের ট্যাক্স আরোপ করে দেন। উদাহরণ স্বরূপ- ঘরে স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল। ব্যস তার পিছনে অটেল অর্থ ব্যয় হতে থাকল। কোন কোন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি এত উচ্চ বেতন লাভ করেন সেগুলো কী হয়? উত্তর পাওয়া যায় যে, সাহেব! দশ বৎসর যাবৎ ঘরে একটি রোগ প্রবেশ করেছে, রোগটি আর যাওয়ার নাম নিচ্ছে না। প্রতিদিন ডাক্তার ডাকতে হয়। বড় বড় ডাক্তারদের বোর্ড বসাতে হয়। স্ক্যানিং করাতে হয়, এক্সরে করাতে হয়। কোন কোন সময় ইউরোপে নিয়ে যেয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। বিলাসী জীবন যাপনকারী ও কৃপণ বিভ্রান্তদের ঘরে এই জাতীয় রোগ আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছেন। কারও আবার অহেতুক কোন শখ বা সাধ সৃষ্টি হয়ে গেছে- যাকে বলে Hobby- সেই পথে সে অর্থ ব্যয় করে।

মোটকথা আল্লাহ নির্ধারিত পথে যদি ব্যয় না কর তবে ব্যয় অবশ্যই হয়ে যাবে, তবে অন্য পথে, অন্য খাতে। যে পথে, যে খাতে ব্যয় করার দ্বারা না ইসলামের ফায়দা হবে, না জাতির ফায়দা হবে, না তোমার নিজের ফায়দা হবে। অনর্থক ব্যয় হতে থাকবে। আর তা হবে ধ্বংসের উপকরণ। বলছিলাম যে, মুসলমান পুঁজিপতিদের নিকট তাদের অর্থ-সম্পদই প্রিয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জাতির সমস্যা ও সঙ্কটের দিকে তারা চোখ তুলেও তাকায় না। সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র ছিল ভিন্ন। তাঁরা অর্থ-সম্পদের পরওয়া করতেন না। জাতির কল্যাণ সাধন ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ঘর শূন্য করে তাঁরা অর্থ-কড়ি নিয়ে আসতেন জাতির স্বার্থে ব্যয় করতে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনের এই জাতীয় ঘটনার অনেকগুলোই আপনারা জানেন। তবুও একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ঘটনাটি আপনাদেরও জানা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! তুমি ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নাম রেখে এসেছি। এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের হাল ও অবস্থা। কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি আমাদেরকে বলে, এই

ত্যাগ ও কুরবানী জীবনের পথ নয়, এটা নিজেকে ধ্বংস করার পথ। আমাদের প্রবৃত্তি আমাদেরকে বলে, পয়সা বাঁচানো, অর্থ সঞ্চয় করে রাখা উন্নতির পথ। কিন্তু নবীগণ বলেন, এটা ধ্বংসের পথ। তাঁদের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত। আমরা দেখছি, আমরা ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সমাজে অনেক কারুনের দেখা পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রামে কমপক্ষে চার-পাঁচজন বিত্তশালী দেখতে পাবেন, যারা কারুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু আমাদের সমাজের অবস্থা কী? আমাদের ধর্মীয় সত্ত্বার কী হাল? আমাদের সম্প্রদায়ের কোন ইজ্জত-সম্মান অবশিষ্ট আছে কি? কানা-কড়ির মূল্যও আজ আমাদের নেই। যেখানে ইচ্ছা সেখানে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুসলমানদের যদি ইজ্জত থাকত, তাদের যদি প্রভাব থাকত, আমাদের যদি চরিত্র ও আদর্শ থাকত, আমরা যদি আদর্শবান হতাম, ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকারকারী হতাম, আমরা যদি জাতি ও দ্বীনের স্বার্থে অর্থ ব্যয়কারী হতাম তাহলে কার সাধ্য ছিল যে, কথায় কথায় আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে, কিংবা একটি দিয়াশলাই দিয়ে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে? কার সাধ্য ছিল যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা হাঙ্গামা বাধানোর? জাতি তার সম্মান হারিয়ে ফেলেছে, ইজ্জত-আবরু হারিয়ে ফেলেছে। জাতি মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। জাতির জীবন আর জীবন নেই। জাতির সম্মান আর সম্মান নেই। কাজেই যেখানে চাও বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দাও, ঠেকায় কে? যদি আপনাদের সম্মান থাকত, আপনাদের মধ্যে যদি ত্যাগ ও কুরবানীর অভ্যাস থাকত, যদি আপনাদের মধ্যে জাতির স্বার্থে অর্থ ব্যয়ের অভ্যাস থাকত, আপনারা যদি বুক উঁচিয়ে জাতির কল্যাণে দাঁড়িয়ে যেতেন তাহলে কার সাধ্য ছিল আপনাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টি করার? আপনারা যদি প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে, আপনারা দৃঢ় সত্ত্বার অধিকারী এক জাতি, আপনাদের মধ্যে যদি অর্থের প্রতি মোহ না থাকত, আপনাদের মধ্যে যদি কারুনের উপস্থিতি না থাকত, তাহলে কি জাতি আজ এরূপ মর্যাদাহীন হত? কারও কি সাহস হত হাঙ্গামা সৃষ্টি করার? সংখ্যালঘুতা কোন সমস্যাই নয়। ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী, আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী কোন জাতির জন্য সংখ্যালঘুতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। আজ অগ্নি উপাসক জাতির কাউকে আঘাত করে দেখুন, কোন শিখকে আঘাত করে দেখুন তো? এরাও তো সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও শিখরা পাজ্জাব বানিয়ে নিয়েছে। নিজেদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ বানিয়ে নিয়েছে। আর আপনারা নিজেদেরকে রক্ষা পর্যন্ত করতে পারছেন না। আপনাদের এই অর্থ-সম্পদ কবে কাজে আসবে? আপনার এত বড় ফার্ম আছে, এত জায়গা-জমি

আছে, এতগুলো দোকান আছে— এসব দেখে দেখে আপনি আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। আপনার এসব সম্পদ দ্বারা যদি ইসলামের ফায়দা হত, জাতির ফায়দা হত তাহলে আমাদের অপেক্ষা আর কেউ অধিক আনন্দিত হত না। আপনি বিশাল পুঁজিপতি, আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব কিছুতে আমাদের কিছু যায় আসে না। পুঁজিপতি হয়ে আপনি যদি বোধহীন না হতেন, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হতেন, ভীষণ ও কাপুরুষ না হতেন, হিম্মত ও সাহসের অধিকারী হতেন তাহলে আজ এই জাতি এত লাঞ্চিত হত না।

বিশৃঙ্খলার চিকিৎসা

আপনারা আমাদের নিকট বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করণের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকেন। উপায় একটিই। আর তা হল নিজের অর্থকে নিজের অর্থ মনে না করা। গোষ্ঠীগত বিশৃঙ্খলার চিকিৎসা হল, যে জিহ্বা আপনার বিরুদ্ধে চলছে তা শক্ত করে ধরে ফেলার শক্তি আপনার মধ্যে থাকতে হবে। যে হাত আপনার বিরুদ্ধে উঠছে সেই হাতকে ধরে ফেলার শক্তি আপনার মধ্যে থাকতে হবে। আপনার বিরুদ্ধে যে হাত অগ্রসর হচ্ছে তাকে রোধ করার শক্তি আপনার মধ্যে থাকতে হবে। কারণ এই হাত মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠছে। আপনি যদি তা না করেন তাহলে আপনি বাঁচতে পারবেন না।

এই যুগ স্ব-জাতিকে শক্তিশালী করতে ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে, অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করার যুগ।

দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সকল কথা আপনাদেরকে বলতে হচ্ছে। এই সকল কথা আমি কানপুরে বলেছিলাম। রেঙ্গুনেও এ সকল কথা বলেছিলাম। দীর্ঘ এগার বৎসর পূর্বে রেঙ্গুনে আমি কথাগুলো বলেছিলাম। এবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কালিকটে আসার পূর্বে আমি রেঙ্গুন হয়ে এসেছি। আমি কাশফ কিংবা এলহামের অধিকারী কোন ব্যক্তি নই। আমি অত্যন্ত গুনাহগার একজন বান্দা। আমার দ্বারা তিনি সত্য ও বাস্তবসম্মত কথা বলিয়ে নিয়েছেন। রেঙ্গুনের অধিবাসীরা আমাকে খুব মহব্বত করত। তাদের মধ্যে অনেকেই পর্যাণ্ড অর্থ-সম্পদের অধিকারী। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, যদি তোমরা তাবলীগে বের না হও, আল্লাহর রাস্তায় বের না হও, অর্থ-সম্পদে আল্লাহর যে হক তা আদায় না কর, জাতির স্বার্থে, জাতির কল্যাণে যদি অর্থব্যয় না কর তাহলে স্বরণে রেখ, তোমাদের দোকানপাট এক সময় সীলগালা করে দেওয়া হবে, তোমাদের কল-কারখানা বাজেয়াপ্ত করা হবে। তোমরা যদি দ্বীনের চাহিদা ও দাবি পূরণ না

কর তবে আল্লাহ তোমাদের উপর আযাব নাযিল করে দেবেন। আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি কসম করে বলছি, আমার বলা কথাগুলো আমি ভুলে গিয়েছিলাম। রেসুলের অধিবাসীরা বারবার পত্রের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছে যে, মাওলানা, আপনি যা বলে গিয়েছিলেন তা শুনে এবং পাঠ করে বার্মার মুসলমানরা এখন শুধুই চোখের পানি ফেলে। কারণ বার্মায় এখন সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতাসীন। সেখানকার মুসলমানদের এখন বড় করুণ দশা।

বন্ধুগণ!

আমি আপনাদের অকল্যাণ হোক তা বলছি না। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে রক্ষা করুন, আপনাদের সম্পদ রক্ষা করুন। আপনারা নিরাপদ থাকুন। আমি বলতে চাচ্ছি, যেভাবে আমাদের সমাজ চলছে সেটা ঠিক নয়। জীবন যাপনের এই পদ্ধতি, জাতি ও ধর্মের স্বার্থের ব্যাপারে উদাসীনতা আমাদের জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ - وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا
تَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘হে মুমিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান করে এমন কিছু দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করে তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। স্মরণ রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।’

তোমরা এমন ফেতনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালেম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।’ (সূরা আনফাল, আয়াত ২৪-২৫)

কিন্তু আমাদের অবস্থা কিরূপ তা কি ভেবে দেখেছি? পুণ্য কর্মে, ত্যাগ ও কুরবানীর কর্মে অন্তর অগ্রসর হয় না। কখনও অগ্রসর হলেও সুযোগ হয় না, উপকরণের অভাব দেখা দেয়।

নিজেকে জাতির কল্যাণে বিলীন কর

আমি স্পষ্ট করে বলছি, ভাটকলের মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক কিছু দিয়েছেন। তাদের উচিত জাতির ব্যাপারে চিন্তা করা, জাতির হেফাযতের ব্যবস্থা গ্রহণ। সবাই মিলে সমগ্র ভারতের মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা করতে

হবে। মুসলমানদের সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান করতে হবে। অমুসলিম ভাইদেরকে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইসলামের পয়গাম ও বার্তা তাদের নিকট পৌঁছাতে হবে। তাদেরকে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। নিজের জীবনাচার ও আদর্শ দ্বারা তাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতে হবে। সুন্দর ব্যবহার দ্বারা তাদের মন ও মস্তিষ্কে প্রভাবান্বিত করতে হবে। তাদের অন্তর থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষকে দূরীভূত করতে হবে। এসব যদি আপনারা করতে পারেন তবেই আপনারা নিরাপদে থাকবেন। নতুনা শুধু ভাটকলের মুসলমান নয়, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান নয়, মাইসুরের মুসলমান নয়; সমগ্র ভারতের মুসলমান হুমকির মুখে পড়বে।

এই যে মধ্যপ্রাচ্যে যে প্রচণ্ড আঘাত এসেছে তা কিসের পরিণতি ভেবে দেখেছেন কি? অটেল সম্পদের অধিকারী বাদশাহ- যাকে আল্লাহ সবকিছু দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন প্রবৃত্তির দাস। ত্যাগ ও কুরবানী কাকে বলে তা তাঁর জানা ছিল না। বিলাসিতায় আকর্ষণ নিমজ্জিত ছিলেন। সরল জীবন যাপনের কল্পনাও তাঁর অন্তরে কখনও উদ্ভিত হয়নি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সর্বদা টেলিভিশন দেখে দেখে আর ফূর্তি করে কাটানোই ছিল তাঁর জীবন যাপনের পদ্ধতি। ফলে মাত্র পঁচিশ লক্ষ ইয়াহুদী যারা দশ কোটি আরববাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয়, সমগ্র আরবকে অপমান ও লাঞ্ছিত করে ছাড়ল। সারা বিশ্বের মুসলমানকে অপদস্থ করে ছাড়ল। এটা ঐ ক্ষমতার মোহ আর বিলাসিতারই কুফল। হাদীস শরীফে এসেছে- এমন এক যামানাসে যখন মুসলমানদের উপর **وهن** ও দুর্বলতা চাপিয়ে দেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, **وهن** কাকে বলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জীবনের প্রতি আসক্তি এবং মৃত্যুভীতি। বন্ধুগণ! এখন তো সেটাই দেখা যাচ্ছে। এটাই বর্তমান মুসলমানদের প্রধান ব্যাধি। মনে রাখবেন, বড় বড় লাখপতি, কোটিপতি ব্যবসায়ী থাকলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বরং যখন বিপদ ও বিপর্যয় আসবে তখন এই লাখপতি ও কোটিপতিরাই সর্বপ্রথম সেই বিপর্যয়ের শিকার হবে।

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে রক্ষা করুন। কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষা করুন। খোদা নাখাস্তা যদি কখনও বিপদ ও বিপর্যয় চলে আসে তবে আপনাদের এই ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। পাঞ্জাবে কোন কাজে আসেনি। জামশেদপুরে কোন কাজে আসেনি। রুড়কিলার দাঙ্গার বেশ কিছুদিন পর আমি সেখানে গিয়েছিলাম। রুড়কিলায় মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় ঠিকাদারী ব্যবসায়ী ছিল। যাদের লাখ লাখ টাকা ঠিকাদারী ব্যবসায় বিনিয়োগ হত। সেখানে যেয়ে দেখলাম

এবং জানতে পারলাম যে, দাঙ্গাকারীরা তাদের সমস্ত অর্থ-কড়ি লুটে নিয়েছে। তাদের মোটরগাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের পুড়িয়ে দেওয়া ঘরবাড়ী আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। কুঁড়ে ঘরে যে বেচারী গরীবরা বাস করে তারা তো বেঁচে যান। কারণ তাদেরকে মেরে দাঙ্গাকারীরা কী নেবে। আমি আশঙ্কা করি আপনাদের ব্যাপারে। যদি জাতি শক্তিশালী না হয়, জাতির সমস্যাগুলোর সমাধান যদি না হয়, দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাভাবে যদি ঠিকমত চালু না থাকে, তবে বিপর্যয় আসবে বৈকি? আপনারা বিত্তশালীরা যদি সাধারণ মুসলমানদেরকে আপন করে না নেন, তাদেরকে যদি আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরূপে প্রস্তুত করতে না পারেন তাহলে তারা আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে কেন? আপনারা যদি তাদের হৃদয় জয় করতে না পারেন তবে তারা আপনাকে ভালবাসবে কেন? দেখুন, পুলিশ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, সেনাবাহিনী আপনার রক্ষক নয়। বরং তারা ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাঁচিতে দেখুন। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোকেরাই সেখানকার মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। তারাই দাঙ্গা লাগিয়েছে এবং নিজেরা দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছে। আপনাকে রক্ষাকারী আল্লাহ তাআলা। আপনার রক্ষক আপনার আমল ও কৃতকর্ম। আপনার রক্ষক আপনার ত্যাগ ও কুরবানী। আপনার রক্ষক আপনার ঐ হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদ, যা ব্যয় করে আপনি আপনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ কিছু লোক তৈরি করবেন এবং যা ব্যয় করে আপনি আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য লাভের অধিকার সৃষ্টি করে নেবেন।

দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ান

বন্ধুগণ!

আমি আপনাদের মেহমান। এত কড়া বক্তব্য প্রদান আপনাদের সামনে আমার জন্য উচিত নয়। কিন্তু আমি অপারগ। আমি তো আপনাদের ঘনিষ্ঠজন ও গুভাকাজ্ঞী হিসাবে কথা বলছি। অন্তরে আপনাদের ভালবাসা আছে বলেই এরূপ কথা বলছি। এই বক্তব্যকে আপনাদের জন্য আমার সহমর্মিতা সুলভ বলে মনে করছি। আপনারা নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। আপনাদের এই দোকানপাট, কল-কারখানা, ব্যাংক-ব্যাংলেক প্রকৃতপক্ষে দুর্বল জিনিস। এগুলোর মাধ্যমেই দুনিয়ার মোহ প্রবেশ করে থাকে। অতএব সর্বপ্রথম এসব সম্পদের যাকাত আদায় করুন, দান-খয়রাত করুন; তারপর অন্য চিন্তা করুন। মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের পাশে দাঁড়ান, তাদের দারিদ্র ক্ষতে ঔষধের প্রলেপ দিন। তাদের জন্য ব্যয় করুন। এই

সকল দরিদ্র ব্যক্তির দুআই আপনার জন্য প্রয়োজনীয়। বাদশাহ নুরুদ্দীন জঙ্গীকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল— আপনি অভাবী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে থাকেন, যুদ্ধকালে এসব ব্যয় কী কাজে আসবে। বাদশাহ বললেন, ভাই! কাজ তো এইসব লোকদের দুআতেই হবে। আমি এদের দুআকেই আশ্রয় মনে করি এবং এদের দুআই কামনা করি। এদের দুআয় শত্রুর কলিজা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। বাস্তবিক তাই হয়েছিল। এদের দুআয় বাদশাহ নুরুদ্দীন জঙ্গী বিজয় লাভ করেছিলেন। দেখুন, আমি সত্যি বলছি, আল্লাহর ফযলে আমি কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে আসিনি, ভবিষ্যতেও এজন্য কখনও আসবো না, আমি আপনাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য মুসলমানদের জন্য যা প্রয়োজন সেই পরামর্শটুকু দিলাম মাত্র। আল্লাহর ওয়াস্তে অন্তত নিজেকে চিনুন।

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی

تو اگر میرا نہ بننا نہ بن اپنا تو بن

নিজেতে লীন হয়ে জীবনের সন্ধান লাভ কর

তুমি যদি আমার না হও না হলে, নিজের তো হও।

নিজেদের সমস্যার সমাধান করুন। দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করুন। নিজের সময়কে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করুন। নিজেকে নিজের জীবনের মালিক মনে করবেন না। আল্লাহকে মালিক মনে করুন। সবকিছুতে আল্লাহর দ্বীনকে প্রাধান্য দিন। আল্লাহর রাস্তায় বের হউন, তাঁর পথে ব্যয় করুন এবং তাঁর পথে কষ্ট স্বীকার করুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনারা ফুলে ফুলে সুশোভিত হবেন, ফুলে ফুলে সমৃদ্ধ হবেন। আপনাদের এলাকা নিরাপদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি জামেয়া ইসলামিয়া থেকে কোন কমিশন লাভ করব বলে এসব বলছি না। কথাগুলো বলছি এজন্য যে, আমি ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাস অধ্যয়ন করেছি। কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করেছি। কুরআন শরীফ ও ইতিহাসের আলোকে কথাগুলো বললাম। আসল হেফাযতকারী আল্লাহ তাআলা। কুরআন শরীফ আমাদেরকে জানান দেয় যে, নেক কর্মের দ্বারাও হেফাযতের কাজ হয়।

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

‘যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অবিচল ও দৃঢ় রাখবেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম

ইনস্যুরেন্স। প্রচলিত ইনস্যুরেন্স কোম্পানী কতটুকু কী করতে পারে? আপনার কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ, আপনার জীবন, আপনার সন্তান-সন্ততি এই সবকিছুর বীমা আল্লাহ তাআলার নিকট করিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলার নিকট অর্থ-সম্পদের বীমা করার পদ্ধতি হল তাঁর রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে আপনার যাবতীয় অর্থ-সম্পদকে মূল্যবান বানিয়ে দেওয়া। তাহলে এই সম্পদে আর কেউ হাত মারতে পারবে না। আপনার জীবনকে মূল্যবান বানিয়ে ফেলুন। জীবনের মূল্য সৃষ্টি হয় আল্লাহর দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করুন। অতঃপর আপনার বিরুদ্ধে যে হাত অগ্রসর হবে তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আপনি ভেবে দেখুন, পৃথিবীর কোন বাদশাহর কোন জিনিসে কেউ যদি হাত দেয় তাহলে তার পরিণাম কী হয়। এই যে ষাট সত্তর টাকার পুলিশ সেপাই, তার উপর কেউ আক্রমণ করুক তো দেখি। দেশের সরকার আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। অতঃপর তার রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এই যে ডাকপিয়ন, তার বেতনই বা কত? এরূপ দশ বারোজন ডাকপিয়নকে কর্মচারী হিসাবে রাখার সামর্থ্য আপনাদের আছে। কিন্তু তার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন তো? তার বুলিটা কেড়ে নিন তো? তারপর দেখুন কী হয়। সে সরকারী দায়িত্বে কর্তব্যরত। আপনিও মহা সরকারের ডিউটিতে নিজেকে নিয়োজিত করুন। আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাবহ হয়ে যান। তাঁর খেদমতে আত্মনিয়োগ করুন, তাঁর দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করুন। এককালে সরকারী চিঠি-পত্রের উপর লেখা থাকত On his Mejesties Service(মহামান্য রাজার কার্যে ব্যবহৃত)। ফলে চিঠির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেত। আপনার জন্য his Mejesties বা মহামান্য রাজা কে? আল্লাহ ব্যতীত আর কে এর উপযুক্ত? আপনি সকল বাদশাহর বাদশাহ, রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করুন। দেখবেন আপনার জান-মাল সব নিরাপদ হয়ে যাবে। মান-মর্যাদা, অর্থ-প্রতিপত্তি অর্জন করতে হলে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। মুসলমানদেরকে এই পথের সন্ধান দিয়েছেন তিনি, যিনি মুসলমানদেরকে সর্বাধিক মহব্বত করতেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জান ও মালের কুরবানী পুরো জাতির জন্য রক্ষাকবচ

দুটো জিনিসের কুরবানীর মধ্যেই পথ সীমাবদ্ধ। জানের কুরবানী ও মালের কুরবানী। জানের কুরবানীর অর্থ এই নয় যে, জীবন দিয়ে দিতে হবে। বরং কমপক্ষে সময় ব্যয় কর। তাবলীগ কর। আল্লাহর রাস্তায় বের হও। তাঁর রাস্তায়

ঘোরাফেরা কর। জীবনযাত্রার উচ্চমান থেকে কিছুটা নিচে অবতরণ কর। কষ্ট স্বীকার কর, ত্যাগ স্বীকার কর। জাতির সমস্যা সমাধানে হাত বাড়িয়ে দাও।

জামেয়া ইসলামিয়ার এত বড় ভবিষ্যত পরিকল্পনা। দশ হাজার অমুক দিয়েছে, পাঁচ হাজার অমুক বোন দিয়েছে। এসব হাজার দশ হাজারের ঘোষণা কেন? ঘোষণা তো হওয়া প্রয়োজন ছিল এক লাখের। দেখুন, আপনারা থাকুন বা না থাকুন, এই জামেয়া থাকবে। এখানে ইসলামের মহা খেদমত হচ্ছে। এটা অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের দুর্গে পরিণত হবে। আপনাদের সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

যুগের ধ্বনি অনুধাবন করুন

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

নিজের জীবনে পরিবর্তন আনুন। হারাম উপার্জন, হারাম বস্তু ও হারাম কর্ম আল্লাহর ক্রোধ টেনে আনে। অতএব সর্ববিধ হারাম থেকে আত্মরক্ষা করুন। তাওবা করুন। বিদ্রোহী জীবনের ইতি টানুন। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার যিন্দেগী শুরু করুন। পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করুন। দোদুল্যমানতার যিন্দেগী পরিহার করুন। একজন খাঁটি মুসলমানের জীবন অবলম্বন করুন। এই দুনিয়া ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। এই দুনিয়ার জন্য হাজার হাজার লোক রয়েছে। আপনি আখেরাতকে স্মরণ করুন। মৃত্যুকে স্মরণ করুন। কবরকে সত্য ও বাস্তব গন্তব্য মনে করুন। নিজের সফরের প্রথম ঘাঁটি এবং আসল ঘাঁটি মনে করে কবরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন। প্রত্যহ অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করুন। মুসলমানদের উপর যে আযাব আপতিত হচ্ছে, যে বিপদ-আপদ নাযিল হচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা। ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করুন। অর্থ-সম্পদকে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী যত্রতত্র ব্যয় করা থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মোতাবেক জাতি ও দ্বীনের কাজে অর্থ ব্যয় করুন। নামাযের পাবন্দী করুন। কুরআন শরীফ পাঠ করুন। দেখুন, তাতে কী বলা হয়েছে, কী নির্দেশ হয়েছে। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন। দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম ও জ্ঞান অর্জন করুন। আল্লাহর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক গড়ে তুলুন। যথাসম্ভব পবিত্র ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করুন। অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করুন। মুসলমান যদি তাকওয়ার যিন্দেগী অবলম্বন করে আসমান থেকে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। ঐ বৃষ্টি নয় যা আমাদেরকে একেক সময় দুর্ভোগে নিপতিত করে।

অসময়ের এই বৃষ্টি আমাদের আমলের শাস্তি। এর প্রতিটি ফোটা আমাদের আমলের শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়। বন্ধুগণ! আপনাদেরকে আমি বাস্তবানুগ এই কথা কয়টি বললাম। আমি আপনাদেরকে কিসসা-কাহিনী শুনাইনি। চাইলে অনেক কিসসাই শুনতে পারতাম। আশআর ও কবিতা আবৃত্তি করে আপনাদেরকে আনন্দ দান করতে পারতাম। কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই এসব এড়িয়ে গেছি। স্বরণ রাখুন, ভারতে যদি সম্মানের সাথে আপনাদের জীবন যাপন করতে হয়, ঈমানের জীবন যাপন করতে হয়, ভবিষ্যত প্রজন্মকে যদি মুসলমান রূপে বহাল রাখতে হয়, স্বাধীনভাবে যদি আল্লাহর নাম নিতে হয় এবং ইসলামের কাজ করতে হয় তাহলে আপনাদেরকে ত্যাগ ও কুরবানী করতে হবে। শরীয়ত বিরোধী ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে এবং দ্বীনের জন্য খরচ হবে মাত্র চার পয়সা?

মনে রাখবেন- এভাবে কেউ সম্মান লাভ করতে পারে না। এইভাবে চললে আল্লাহর রহমত থেকে আপনারা বঞ্চিত হবেন। যারা এই দেশে সম্মান লাভ করেছে তারা তাদের সাহসী ভূমিকা, উচ্চ সংকল্প ও দৃঢ় মানসিকতা দ্বারাই তা লাভ করেছে। পলকা তুলোর ন্যায় এই জাতি- যারা কোন কষ্ট বরদাশত করতে রাজি নয়, পরিশ্রম করতে রাজি নয়, কোন কড়া কথা শুনলে যারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে- কিভাবে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে? চটকদার কথায় সম্মান পাওয়া যায় না। শুধু এই জাতীয় দ্বীনী মজলিস অনুষ্ঠিত করে এবং কিছু ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করা যায় না। জাতির প্রয়োজন অনুধাবন করুন। যুগ আপনাদের নিকট কী আশা করে, কী দাবি করে, ভারতের পরিস্থিতি কী, ভারতের পরিস্থিতি কোন বিষয়ের ইঙ্গিত করে, কোন দিকে ইঙ্গিত করে এসব উপলব্ধি করুন। যুগের নাড়ি-নক্ষত্র বুঝতে চেষ্টা করুন। যেখানে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন সেখানে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করুন। যেখানে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন সেখানে সময় ব্যয় করুন। যেখানে দৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন সেখানে দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। দৃঢ়তার জায়গায় শিথিল ও নরম হলে আর নম্রতা ও শৈথিল্যের জায়গায় দৃঢ় হলে কাজ হবে না। জাতির নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের কথা শুনুন এবং আনুগত্য করুন, তাদেরকে সহায়তা দান করুন। এরপর দেখবেন, ভারতে আপনাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে গেছে, আপনারা নিরাপদ হয়ে গেছেন।

সম্মানের সাথে জীবন ধারণের পথ কোনটি?

ভাটকলের অধিবাসীবৃন্দ, আপনাদের পূর্বসূরী বুয়ুর্গগণ এখানকার অধিবাসীদের জন্য ইসলামের বার্তা নিয়ে আগমন করেছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল

বত্রিশ দাঁতের মাঝে একটি জিহ্বাতুল্য। তাদের কোন উপায়-উপকরণ ছিল না, তাঁদের সঙ্গদানকারী কেউ ছিল না, তাঁদের কোন বন্ধু ছিল না। কিন্তু তাঁদের কথার ওজন ছিল, গুরুত্ব ছিল। অথচ আপনারা সংখ্যায় অনেক কিন্তু আপনাদের কোন ওজন নেই, মর্যাদা নেই। এখানে সংখ্যায় আপনারা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। কিন্তু সেই তুলনায় কয়টি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে? এখানে আপনাদের তাহযীব ও তামাদুনের দুর্গ তৈরি হওয়া উচিত ছিল। আলোর এক সুউচ্চ মিনারা বিদ্যমান থাকা উচিত ছিল। যার আলোর ছটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারত। যে আলোর মিনারা আলোচিত মিনারায় পরিণত হত যে, এখানে একটি আলোর মিনারা আছে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে অনেক কিছুই দিয়েছেন। কালিকটে আমি আপনাদেরকে দেখেছি। আপনাদের সম্পর্কে আমি অনবগত নই। মাদ্রাজে আমি আপনাদেরকে দেখেছি। এমনকি কলম্বোতেও আপনাদের কথা শুনেছি। এত অর্থ-সম্পদ, কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারী হয়েও আপনারা জাতির সমস্যা সমাধান করতে পারেননি। কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি এটা মনে নিতে পারে যে, এত অর্থ-সম্পদের অধিকারী সম্প্রদায়, অথচ তাদের একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান অর্ধনির্মিত, অপূর্ণাঙ্গ হয়ে পড়ে আছে? এর কারণ কী? রহস্য কোথায়? এটা তো এক দিনের ব্যাপার। আপনাদের নাম এখানে প্রবাদে পরিণত হওয়া উচিত ছিল। নিজের মাতৃভাষায় এখানে লিটারেচার প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। জামেয়া ইসলামিয়া এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, যা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করত। এখান থেকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে দ্বীনের খোরাক ও পুষ্টি সরবরাহ হত। তা না হোক, জামেয়া ইসলামিয়াকে এরূপ সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলুন, যাতে নিদেনপক্ষে এই এলাকার জন্য তা যথেষ্ট হয়। জামেয়াকে জাতির জন্য একটি সুদৃঢ় দুর্গরূপে তৈরি করুন। আমার মনে হয় আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের মস্তিষ্ক, আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে, প্রতারিত করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে প্রতারিত করতে পারেন না, ভুল পথের নির্দেশনা দিতে পারেন না। তিনি তো আমাদেরকে টিকে থাকার এবং মর্যাদাসহ জীবন ধারণের পথ বাতলে দেন। যদি সেই পথ ধরে চলতে থাকেন তবে আপনাদের জীবনে বসন্ত আসবে, আপনারা ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হবেন। অতঃপর আপনাদের দিকে চোখ উঠিয়ে কোন শত্রু তাকানোর সাহস পাবে না। কেউ তার চেষ্টা করলে তার চোখ তুলে নেওয়া হবে, যে আঙ্গুল আপনাদের দিকে উত্থিত হবে, তা কর্তন করে নেওয়া হবে এবং আপনারা থাকবেন আল্লাহ তাআলার

কুদরতী হেফায়তে। হাঁ, যদি মনগড়া জীবন যাপন করতে থাকেন, প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন, শুধু নিজেকে এবং নিজের সন্তানদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, জাতির স্বার্থ, দ্বীনের স্বার্থ দেখার ইচ্ছা আপনাদের মধ্যে জাগ্রত না হয়, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন তাহলে মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলার নিকট এক কানা-কড়ির মূল্যও আপনাদের থাকবে না। ভয়াবহ স্রোত এসে আপনাদের সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। টেরও পাবেন না, সব কোথায় চলে গেল। অর্থ-সম্পদ আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। আপনাদেরকে রক্ষা যদি কোন কিছু করতে পারে তা হল আল্লাহর প্রতি দায়বদ্ধতা, ত্যাগ ও কুরবানী। আমি তো আমার কথা শেষ করে চলে যাব কিন্তু কথাগুলো আপনাদের মন-মস্তিষ্কে গাঁথা থাকবে। আপনাদের অন্তরে আমানতরূপে তা বহাল থাকবে। আল্লাহ না করুন, কখনও যদি ঐরূপ মন্দ সময় এসে উপস্থিত হয় তখন আপনাদের মন-মস্তিষ্ক ডেকে বলবে, কোন একজন বক্তা কথাগুলো বলেছিল কি?

আমি আন্তরিকতার সাথে দোয়া করি, আল্লাহ আপনাদেরকে হেফায়ত করুন। আপনাদেরকে মর্যাদার সঙ্গে রাখুন। আপনাদেরকে উন্নতি দান করুন। সকল বিপদ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন। আমি শুধু এতটুকু বলব, রক্ষা পাওয়ার পথ একমাত্র রাসূলপ্রদর্শিত পথ। ত্যাগ ও কুরবানী করুন। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করুন। ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে, সময় ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুন। আল্লাহর দ্বীনের মদদ করুন, আল্লাহও আপনাদের মদদ করবেন, আপনাদেরকে রক্ষা করবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পথের বার্তা

[হযরত মাওলানা দ্বিতীয়বার ভাটকলে আগমন করেছিলেন এবং তথাকার জামেয়া ইসলামিয়ার ছাত্র, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকবৃন্দের সামনে এই ভাষণ প্রদান করেছিলেন।]

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - اَمَّا بَعْدُ!

ভাইয়েরা আমার, বন্ধুরা আমার!

আপনাদের জানা আছে কি না জানিনা। তবে যারা তাফসীর পাঠ করছেন এবং কমপক্ষে সূরা বাকারার তরজমা ও তাফসীর পাঠ করেছেন তারা জানেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি রীতির প্রবর্তন ঘটিয়েছিল। রীতিটি শরীয়তের কোন রীতি ছিল না। বরং এটা তাদের মনগড়া রীতি ছিল। রীতিটি হল যখন কেউ হজ্জের ইহরাম বেঁধে ঘর থেকে বের হত অতঃপর কোন কারণে ঘরে প্রবেশ করার প্রয়োজন দেখা দিত তখন তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করত না। তারা মনে করত, এখনও আল্লাহর ঘরের কাজ সমাপ্ত হয়নি, হজ্জ সম্পন্ন হয়নি, সুতরাং নিজের ঘরে নিয়ম মোতাবেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করি কী করে? তো তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে ঘরের ছাদ ভেঙ্গে কিংবা বেড়া কেটে ঘরের পিছন দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। এটাকে তারা অত্যাব্যশ্যকীয় এবং পুণ্যকর্ম বলে মনে করত। আল্লাহ তাআলা তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত এই রীতির নিন্দা করে বললেন—

لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَاتَّقَى
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

‘ঘরের পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই। পুণ্য আছে কেবল তাকওয়া অবলম্বনে। সুতরাং ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর।’

এটাই রীতি। এটাই সুস্থ বিবেক ও বুদ্ধির দাবি। এতদ্বারা বোঝা গেল, কোন জায়গার নির্ধারিত প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করাই সৃষ্টিগত রীতি। কুরআন মাজীদ মানুষের সমগ্র জীবনের কিতাব। সমগ্র জীবনের জন্য তা পথপ্রদর্শক। কুরআন

মজীদ সর্বক্ষেত্রে, সর্বকাজে সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য কার্যপ্রণালী ব্যক্ত করে এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনের ছোট এই বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

‘তোমরা ঘরে প্রবেশ কর তার দরজা দিয়ে।’

বাক্যে যদিও শুধু ঘরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি মূলনীতি। নীতিটি শুধু ঘরের বেলায় নয় বরং প্রতিটি বিষয়ের রীতি ও নীতি এটাই। অর্থাৎ যে কাজের যে প্রবেশদ্বার সেই কাজে সেই দ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। যে কাজের যে পন্থা নির্ধারিত সেই কাজ সমাধা করতে সেই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। কেউ যদি শিল্প ও কারিগরী বিদ্যা অর্জন করতে চায় কিন্তু কোন শিক্ষকের নিকট ঐ বিদ্যার চর্চা না করে, ঐ বিদ্যা অর্জনের যে নিয়ম-কানুন রয়েছে তা মেনে না চলে, ঐ বিদ্যার উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করে এবং স্তরের ক্রমধারা অনুযায়ী ধীরে ধীরে তা অর্জন করতে না চায় তাহলে সে ঐ বিদ্যা অর্জনে সফলতা লাভ করতে পারবে না। এমনকি সফলতা লাভের জন্য ঐ পেশা ও শিল্প ও কারিগরীর জন্য নির্ধারিত যে পোশাক রয়েছে তাও গ্রহণ করা তার জন্য জরুরী হয়ে পড়ে। ডাক্তারের বিশেষ পোশাক ও ইউনিফর্ম রয়েছে, সেনাবাহিনীর বিশেষ পোশাক ও ইউনিফর্ম রয়েছে। অনেক সময় এসব ইউনিফর্মও জরুরী হয়ে পড়ে। কেউ যদি বলে, ভাই! আমি তো সেনাবাহিনীর সদস্য হতে চাই, সামরিক কলা-কৌশল রপ্ত করতে চাই, এসব ইউনিফর্মের ঝামেলা আমি পোহাতে পারব না, আর Left, Right অনর্থক একটি কাজ, তাও আমি করতে পারব না, আমি আমার মেধা ও প্রতিভা দিয়ে সামরিক কলা-কৌশল রপ্ত করব, ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করব, তাহলে সে প্রকৃত সৈনিক হতে পারবে না। ডাক্তার হওয়ার যে চিরাচরিত পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অবলম্বন না করলে সে ডাক্তার হতে পারবে না। এমনকি কামার ও ছুতোর হতে হলে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করতে হয় সেই পদ্ধতিই কামার ও ছুতোর হতে হলে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা কোন ব্যক্তি কামার ও ছুতোর হতে পারবে না। সব পেশার ক্ষেত্রে এই একই নীতি প্রযোজ্য। আর তা হল—

وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

‘ঘরে প্রবেশ কর ঘরের দরজা দিয়ে।’

বাক্যটি পার্থিব, অপার্থিব উভয় জীবনের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে এবং মনুষ্য স্বভাব ও সুস্থ মানব-বুদ্ধি বহু বৎসরের লব্ধ অভিজ্ঞতা

দ্বারা যে নিয়ম-নীতি নির্ধারিত করে দিয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি সেই নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এবং সেই নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্যশীল না হয়, তাহলে সে কখনই সফল হতে পারে না, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।

কোন ব্যক্তি যদি বলে, বর্ণমালা শিক্ষার ঝামেলায় আমি যাব না, বর্ণমালা না শিখেই বই-পুস্তক পড়া শিখব, তাহলে সে যতই মেধাবী ও প্রতিভাবান হোক না কেন সে মুখই থেকে যাবে।

‘আলিফ’, ‘বা’, ‘তা’, ‘ছা’ (বা ক, খ, গ, ঘ) কিংবা A, B, C, D ইত্যাদি বর্ণমালার সাথে পরিচিত না হয়ে সে এক ছত্রও পাঠ করতে সমর্থ হবে না। দেখুন, তুখোড় মেধা ও প্রতিভার অধিকারী কিন্তু বর্ণমালা সম্পর্কে অজ্ঞ কাউকে আপনি একটি উর্দু, ইংরেজী, বাংলা বা তার মাতৃভাষার কোন পুস্তক দিয়ে বলুন যে, তোমাকে এক রাত নয় বরং এক মাস সময় দেওয়া হল। তোমাকে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে বসিয়ে দেওয়া হবে, তোমাকে খাবার-দাবারসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করা হবে কিন্তু তোমার নিকট কোন শিক্ষক বা অন্য কোন লোক যাবে না। তুমি প্রয়োজনে ছয় মাস সময় নাও এবং এই পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার পাঠ শিক্ষা করে আমাদেরকে পাঠ করে শোনাও। আপনারা, আমরা সকলেই নিশ্চিত যে, সে ব্যক্তি যখন ঐ ঘর থেকে বের হবে তখন সে এর পূর্বে যেমন মুর্থ ছিল, নিরক্ষর ছিল তেমনই মুর্থ ও নিরক্ষর থেকে যাবে। কারণ সে বর্ণমালা শেখেনি। وَأَتَرُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا অনুযায়ী সে কাজ করেনি। বর্ণমালা বাহ্যত খুবই তুচ্ছ বিষয়। শিশুদেরকে বর্ণমালা শেখানো হয়। কিন্তু বড় বড় মনীষী বর্ণমালা না শিখে মনীষী হতে পারেনি। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাজীর মত ব্যক্তিগণও প্রথমে বর্ণমালা শিখেছেন, অক্ষর জ্ঞান লাভ করেছেন তারপর তাঁরা এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ও তাফসীরে রাজীর ন্যায় বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁরা এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ও তাফসীরে রাজী লিখতে পারতেন না, যদি তারা বর্ণমালার পাঠ গ্রহণ না করতেন। তদ্রূপ প্রতিটি জ্ঞান বিজ্ঞানের, প্রতিটি শাস্ত্রের, প্রতিটি বিভাগের একটি রীতি ও নীতি আছে। সেই রীতি ও নীতি অনুযায়ী চলতে হবে।

সাধারণ শিক্ষা ও দ্বীনী শিক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির দুটি শিক্ষা হলেও কিছু কিছু বিষয় এই উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলে আমরা দেখতে পাই। যেমন নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত ধাপে ধাপে উন্নীত হওয়া, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ, শিক্ষকবৃন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি।

ইউরোপে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক

অনেকেই মনে করে যে, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে শিক্ষকের মর্যাদা দান করা হয় না। ছাত্রদের অন্তরে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ নেই। আপনারা ভারতের কলেজ-ভার্সিটিগুলো দেখে এই ভুল ধারণার শিকার হবেন না। ভারতের অবস্থা তো এই যে, না তারা পাশ্চাত্যের অনুসারী, না প্রাচ্যের। এরা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। জংলী গাছ। আমি ইউরোপে গিয়েছি, সেখানে কলেজ-ইউনিভার্সিটি দেখেছি। অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি। আমি বিশ্বয়ে অভিজ্ঞ হয়েছি। কারণ সেখানে এখনও টিউটোরিয়াল সিস্টেম চালু আছে। কোন একজন শিক্ষক নির্বাচন করে তাঁর অধীনে লেখাপড়া ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সিস্টেম। যে প্রফেসরের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে ছাত্রটি লেখাপড়া করে ও গবেষণা কাজ করে তাঁর সঙ্গে ঐ ছাত্রের আমাদের পীর-মুরীদের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার ন্যায় সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। ছাত্র ঐ প্রফেসরের পরামর্শে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে এবং নোট করে, অতঃপর প্রফেসরকে ঐ NOTES দেখায়। প্রফেসর NOTES দেখে ছাত্রের যোগ্যতা ও গুণগত উৎকর্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তাকে পরবর্তী কাজের জন্য নির্দেশ দেন। মোটকথা, প্রফেসরের সাথে ছাত্রের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ঠিক তেমনই যে রকম পূর্ব যুগে আমাদের মাদরাসাগুলোতে ছিল।

আমাদের যুগ পর্যন্ত আমরা দেখেছি, ছাত্ররা কোন একজন উস্তাদকে বিশেষ উস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করত। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করত। তাঁর খেদমত করত। প্রয়োজনে তাঁর চা বানিয়ে দিত, বাজার করে দিত। তাঁর আরাম-আয়েশের প্রতি খেয়াল রাখত। লেখাপড়ার ব্যাপারে ঐ বিশেষ উস্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কিতাবাদি অধ্যয়ন, নোট তৈরি, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজগুলো করত। আমরা এইভাবেই লেখাপড়া করেছি। ইউরোপে যেয়ে দেখলাম, সেখানকার কলেজ-ভার্সিটিতে এই নিয়ম চালু আছে। ভর্তির সময়ই বলতে হয়, কোন শিক্ষককে সে বিশেষ শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করবে, কে তার টিউটর হবেন। এছাড়া ছাত্রকে ভর্তি করতেই তারা প্রস্তুত হয় না। এদিক দিয়ে আমাদের দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশ মিল রয়েছে।

কিছু বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান ও দ্বীনী জ্ঞানের মিল থাকলেও কোন কোন বিষয়ে দ্বীনী জ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য থাকতে হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। দ্বীনী ইলম অর্জনকারীর মধ্যে ইখলাস থাকতে হবে। আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে যে,

যে পরিশ্রম করার প্রয়োজন তা তো আমরা করব কিন্তু ইলমদানকারী তো তুমিই হে আল্লাহ! অতএব তুমি আমাকে ইলম দান কর। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কবিতাটি স্মরণ করুন।

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي - فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنَ الْهِى - وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي

আমি (ইমাম শাফেয়ী [রহ.] আমার উস্তাদ ওকী (রহ.)-এর নিকট আমার স্মরণ শক্তির স্বল্পতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ পরিহারের উপদেশ দিলেন। কারণ হিসাবে তিনি বললেন, কেননা ইলম আমার ইলাহের নুর। আর আল্লাহর নুর গুনাহগারকে প্রদান করা হয় না।

এটাই জাগতিক ইলম ও দ্বীনী ইলমের বিভেদ রেখা। জাগতিক জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্ররা সিনেমায় যাক, চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হোক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। তাদের জাগতিক জ্ঞান অর্জনে তা বিশেষ কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। অবশ্য আমি মনে করি, পাপাচারিতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় সেখানেও বাধার সৃষ্টি করে। তবুও না হয় মেনে নিলাম যে, বাধার সৃষ্টি করে না। ছাত্র ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করে যাবে চাকুরীও পাবে। কিন্তু দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে গুনাহ ও চারিত্রিক অবক্ষয় দ্বীনী ইলম অর্জনের পথে, দ্বীনী ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়া ও অন্যকে উপকৃত করার পথে বিরাট অন্তরায়।

বলছিলাম যে, যে ছাত্র উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁর প্রতি আদব বজায় রাখে, তাঁর দোয়া গ্রহণ করে এবং তাঁর সঙ্গে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে বেঁধে ফেলে যেন সে তাঁর কর্মচারী ও চাকর সেই ছাত্রই জীবনে সফলতা লাভ করে। প্রকৃত ইলম অর্জন করতে পারে। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আপনারা জানতে পারবেন যে, একজন ব্যক্তি শুধু একজন উস্তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ফলে সে উস্তাদের প্রতিচ্ছায়ায় পরিণত হয়েছে এবং উস্তাদের জ্ঞানকে এমনভাবে আত্মস্থ করেছে যে, উস্তাদ ও শাগরিদ যেন একই ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভাই ও বন্ধুরা! আমাদের এই দ্বীনী ইলমের জন্যই এই জামেয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দ্বীনের এই ইলম হাসিল করতে বেশ কিছু আদব-লেহাজের প্রয়োজন পড়ে। এখানে বীরত্ব প্রদর্শন, বোয়াদবী মূলক আচরণ সফলতার পথে প্রতিবন্ধক। এখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, কিতাবের আদব রক্ষা, উস্তাদের আদব রক্ষা

এসব আবার কী? এসব প্রাচীন যুগের কথা। আল্লাহ তাআলা আমাকে মেধা দান করেছেন, পরিশ্রম করার মত শক্তি-সামর্থ্য ও সুস্থতা দান করেছেন। সুতরাং আমি ইলম অর্জন করেই ছাড়ব। কোন কিছুই আমার জন্য বাধা হবে না।

না বন্ধুগণ, বিষয়টি এরূপ নয়। দ্বীনী ইলম শুধু মেধা নির্ভর নয়। আদব-লেহাজও এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেউ কেউ স্বল্প মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ সফলতা লাভ করেছে যে, সকলের নিকট সমাদৃত হয়েছে। আবার অসাধারণ মেধার অধিকারী ব্যক্তিদের অনেকের দ্বারাই দ্বীনের যথাযথ খেদমত হয়নি। আমার স্মরণে আছে, লাহোরে এক ব্যক্তি পথচ্যুত হয়ে ভুল পথ অবলম্বন করেছিল। সে কলেজে পড়াত। তার মেধা ও প্রতিভা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এমনকি ড. ইকবালও তাকে সমীহ করতেন। কিন্তু দ্বীনের যে খেদমত তার দ্বারা হওয়া উচিত ছিল, ইলম ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসার তাঁর দ্বারা যেদ্রুপ হওয়া প্রয়োজন ছিল সেদ্রুপ হয়নি। তিনি বলতেন, মৌলভী হুসাইন আহমদ মাদানী তো আমাদের সঙ্গী ছিল। সে তো দুর্বল মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছিল। ছাত্রজীবনে সে উল্লেখযোগ্য কোন ছাত্র ছিল না। হাঁ, যিনি একথা বলতেন, তিনি উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন, তুখোড় মেধার অধিকারী ছিলেন কিন্তু তাঁর দ্বারা দ্বীন ও জাতির কী খেদমত হয়েছে? তদ্রূপ এক ব্যক্তি বলছিল, আরে মৌলভী ইলিয়াস ছাত্রজীবনে শুধু নফল নামায আদায় করেই সময় কাটিয়ে দিত। সব সময় তাকে নফল নামায আদায়ে রত দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু দেখুন, মৌলভী ইলিয়াস কী করে দেখিয়েছেন। সারা বিশ্বকে আন্দোলিত করেছেন। তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম সুদূর আমেরিকা ও আফ্রিকা সহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

তো ভাই, গভীর পর্যবেক্ষণ ও পর্যাণ্ড অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, স্বল্প যোগ্যতা নিয়েও একজন ব্যক্তি যদি **وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا**-এর উপর আমল করে এবং যথাযথ পথ অবলম্বন করে তাহলে সে ঐ স্তরে উপনীত হতে পারে, ঐ সফলতা লাভ করতে পারে যা একজন মেধা ও প্রতিভা নিয়ে গর্বকারী, নিজের মেহনত ও অধ্যয়নের প্রাচুর্য নিয়ে গর্বকারী ব্যক্তি পারে না। তার অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে বরকত হবে না। মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হবে না। সুন্নাহের প্রচলন, বিদআতের নির্মূলন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি, ইবাদতে আগ্রহ ও নুর সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলো তার দ্বারা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হবে না। এই বিষয়গুলো তার দ্বারা তখনই সৃষ্টি হবে যখন উস্তাদের প্রদর্শিত পথে সে চলবে। শাম দেশের একজন বড় আল্লামার কাহিনী বর্ণিত আছে যে, প্রচণ্ড শীতের কারণে তিনি তার উস্তাদের নিকট

একদিন যেতে পারেননি। শাম দেশে প্রচণ্ড শীত পড়ে। কখনও কখনও বরফও পড়ে। পরের দিন উস্তাদের কাছে গেলে উস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল আসনি কেন? তিনি বললেন, প্রচণ্ড শীতের কারণে আসতে পারিনি। উস্তাদ এক কলস পানি তার মাথায় ঢেলে দিলেন। বললেন, এটা কি ঠাণ্ডা? ছাত্র কোন কথা না বলে উস্তাদের এই আচরণ বরদাশত করে নিলেন। এ কারণেই পরবর্তীতে তিনি আল্লামা হতে পেরেছেন। তো এই ছিল সেই যুগের রীতি। সেই যুগে উস্তাদ ছাত্র দ্বারা কাজ করিয়ে নিতেন, খেদমত নিতেন। আবার তাকে শিক্ষাদানও করতেন। সেই যুগে উস্তাদ নিছক উস্তাদ হতেন না বরং ছাত্রের ইসলামের কাজও করতেন। উস্তাদ হতেন ছাত্রের পীর স্বরূপ। ছাত্র উস্তাদের নিকট লেখাপড়া করত। উস্তাদ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের নামায কেমন হত তাও লক্ষ্য করতেন। দেখতেন সে খুশ-খুশুর সঙ্গে নামায আদায় করে কিনা। ছাত্র সুন্নাহের পাবন্দ কিনা। মসজিদে প্রবেশকালে কোন পা প্রথমে প্রবেশ করালো, বের হওয়া কালে কোন পা প্রথমে বাইরে রাখল ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের প্রতি উস্তাদ নজর রাখতেন। বর্তমানে ছাত্রের প্রতি উস্তাদের এই দৃষ্টিহাস পেয়েছে।

বর্তমানে অসাধারণ কোন আলেম, কোন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না। এই যুগে ইমাম মুযানী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী হয়তো কেউ হতে পারবে না কিন্তু তাদের তুলনায় কমপক্ষে তৃতীয় স্তরের আলেম তো তৈরি হতে পারে। কিন্তু তা হচ্ছে না। এখন থেকে মিসর পর্যন্ত কোথাও না। এককালে মিসরের জামে আযহার বড় বড় ব্যক্তিত্ব জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সেখানেও অবক্ষয় শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব জামে আযহারকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। প্রত্যেক দেশেই এই সঙ্কটের উপলব্ধি হচ্ছে যে, বর্তমানে উল্লেখযোগ্য মানের আলেম তৈরি হচ্ছে না। তো এর জন্য জরুরী, নিয়মিত পাঠদান ও পাঠগ্রহণ, উস্তাদের প্রতি সম্মানবোধ থাকা, নিয়মিত অধ্যয়ন ও অধ্যাবসায়। প্রতি দিনের পাঠ উস্তাদের পাঠদানের পূর্বেই নিজে পাঠ করে বোঝার চেষ্টা করা। উস্তাদের নিকট পঠিতব্য পাঠ পূর্বেই পাঠ করা। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.) বলতেন, বর্তমানে ছাত্রদের বদ-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, পড়ার পূর্বে দেখে না, পড়ার পরেও দেখে না। অর্থাৎ উচিত তো ছিল, উস্তাদের নিকট পঠিতব্য পাঠ পূর্বাঙ্কেই দেখে আসবে, পড়ে আসবে। অতঃপর উস্তাদের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করার পর তা বারবার পাঠ করবে, আত্মস্থ করবে। এই উভয় রীতিই এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ব্যস, অল্প কয়েকটি কথা বললাম। লম্বা বক্তব্যের প্রয়োজন নেই। যদি কথা কয়টি অনুযায়ী আমল হয়

তাহলে আল্লাহর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী এখনও ঐরূপ ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। মেধার অধিকারী ব্যক্তি এখনও আছে। এখন তো রকমারী পুষ্টিকর খাবার আল্লাহ তাআলা খাওয়াচ্ছেন। পূর্ব যুগের লোকেরা কী খেত? সপ্তাহ কি মাসেও তাদের ভাগ্যে ঘি জুটত না, গোশত জুটত না, ফল-ফলাদি জুটত না। শুকনো রুটি খেয়েই তাঁরা এত বড় বড় কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, যা ভাবতেও অবাক লাগে। কারও কারও সম্পর্কে এমনও জানা গেছে যে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় রুটি বিক্রেতার দোকানের সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে তাওয়ায় রুটি সেকার ঘ্রাণ নিয়েছে আর তাতেই শক্তি লাভ করে পুনরায় পড়তে বসে গেছে।

অতএব কথা একটিই। আর তা হল- **وَاتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا**। ইলমের ঘরে ইলমের প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। ইলমের প্রবেশ দ্বার কী? এই যে এতক্ষণ যা বললাম। নিয়ম-রীতি রক্ষা করে চলা। উস্তাদসহ ইলমের যাবতীয় উপকরণাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আদব বজায় রাখা। নিয়মিত অধ্যয়ন। পাঠগ্রহণের পূর্বে এবং পাঠগ্রহণের পরেও।

ভাইয়েরা আমার! আপনারা যদি এই কাজগুলো করেন তাহলে আপনাদের জীবন উজ্জ্বল হবে ইনশাআল্লাহ। নিজের দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারবেন। আর তা না হলে জীবন বড় কঠিন হয়ে যাবে। কোন মাসআলা বলা, কোন কিতাব পড়ানো কঠিন কাজে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করি, তিনি আপনাদেরকে সকল মন্দ ও অনিষ্টকর বিষয় থেকে রক্ষা করুন, ইখলাস দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নেয়ামতে ইসলামের মূল্যায়ন ও

তার জন্য শোকর আদায়করণ

[১৯৮৪ ইং সনের ১০ মার্চ বাংলাদেশের বৃহৎ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় আজিমুস্থান বার্ষিক মাহফিলে প্রদত্ত ভাষণ। এটি ছিল মাওলানার বাংলাদেশ সফরে প্রথম ভাষণ।]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ - اَمَّا بَعْدُ!

وَ اِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ لَازِيْدَنَّكُمْ وَلَنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

আমার প্রিয় বাংলাদেশী ভাই ও বন্ধুগণ!!

বাংলাদেশ উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। এরূপ একটি দেশে আমি এতদিন আসিনি। আপনাদের সাক্ষাতে এখানে আসার এই বিলম্বকে আমি আমার ক্রটি ও অবহেলা বলে মনে করছি। আমার এই ক্রটির জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং আল্লাহর এই পবিত্র ঘর, জামেয়া ইসলামিয়ার এই বৃহৎ মসজিদে বসে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করছি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম দেশে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী এত বিশাল সংখ্যক লোক বসবাস করে, এত বিপুল পরিমাণ লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে, আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়, ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করে অথচ আমি তাঁদের নিকট এত দেরিতে আসলাম! আল্লাহ তাআলা আমার এই অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

সুধী! আমি আপনাদের সামনে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ اِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ لَازِيْدَنَّكُمْ وَلَنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

‘স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা যদি শোকর আদায় কর তবে তোমাদেরকে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি নাশোকরী কর, অকৃতজ্ঞ হও তবে জেনে রাখ, আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর।’ (সূরা ইবরাহীম ৭)

মানুষ যখন অন্য কোন জাতির শান-শওকত দেখে, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন দেখে, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী কোন বিষয় দেখে তখন শয়তান আক্রমণের সুযোগ পায়, মুসলমানদের মধ্যে লোভ সৃষ্টি করে দেয় অনুরূপ বিষয়গুলো লাভ করার। পৃথিবীতে বহু জাতি আছে যারা তাওহীদের বিশ্বাস এবং ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। তাদের কেউ বৃক্ষপূজা করে, কেউ মূর্তিপূজা করে। দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নজর নিয়াজ করে। মেলার আয়োজন করে। সেখানে চিত্তবিনোদনের নানা সামগ্রী ও ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। কোন কোন সম্প্রদায় এক্ষেত্রে পদস্থলিত হয়েছে এবং শয়তানের আক্রমণের শিকার হয়েছে। তাদের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে যে, আহা! যদি আমরাও এরূপ করতে পারতাম!

দুনিয়ার বহু জাতি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে পূজনীয় দেব-দেবীর মর্যাদা দান করেছে। কেউ আঞ্চলিক বা ভাষাগত জাতীয়তাকে দেবতা বানিয়ে নিয়েছে, কেউ দেশকে, কেউ ভাষাকে দেবতা বানিয়ে নিয়েছে। কেউ পূর্ব পুরুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে দেবতা বানিয়ে বসেছে। কেউ কুলিনতা ও বংশ মর্যাদাকে, কেউ রঙ ও বর্ণকে দেবতা বানিয়ে বসেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এইসব অলীক দেব-দেবী থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা যেন সর্বদা ইসলাম নিয়ে গর্বিত থাকি এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি জাগ্রত না হয় আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দান করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রটি মানুষের পদস্থলনের ক্ষেত্র। কাউকে সুস্বাদু খাবার খেতে দেখলে ঘেরূপ জিহ্বায় পানি এসে পড়ে তদ্রূপ কোন কোন জাতির ভ্রষ্টতা নির্দেশক জীবনাচার দেখে অনেকে লোভাতুর হয়ে পড়ে, অনুরূপ জীবনাচারকে গ্রহণ করতে চায়।

আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে একজন মহান নবীর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। কিন্তু তাদেরও পদস্থলন ঘটেছিল। মূর্তিপূজার দৃশ্য দেখে তারা স্থির থাকতে পারেনি। তারা আকাঙ্ক্ষা করে বসেছিল যে, তাদেরও যদি এইরূপ কোন কিছুর উপাসনা করার ব্যবস্থা থাকত তাহলে ভাল হত। সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, হে মুসা! তাদের

দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও। মুসা বলল, তোমরা তো বড় মূর্খ সম্প্রদায়। এইসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে, তা তো বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং তারা যা করছে তা অমূলক।’ (সূরা আরাফ ১৩৮-১৩৯)

আল্লাহ তাআলা এই বনী ইসরাঈলকেই বলেছেন-

يٰۤبَنِيۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیۡ الَّتِیۡ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِیَّیۡ فَضَّلْتُكُمْ
عَلٰی الْعٰلَمِیۡنَ

‘হে ইয়াকুবের সন্তানেরা! তোমরা আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে তোমাদেরকে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।’ (সূরা বাকারা ৪৭)

তাফসীরবিদগণ বলেন, বিশ্বের সবার উপরে বনী ইসরাঈলের যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা ছিল তাওহীদের কারণে। ইসরাঈল বা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্যে সব সময় তাওহীদের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন যুগে বিশ্বের অপরাপর জাতির তুলনায় তারাই ছিল সর্বাধিক তাওহীদে বিশ্বাসী ও আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী। কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগে এই জাতি বহু বৎসর যাবৎ মিসরে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাহচর্য ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেও পদস্থলনের শিকার হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَجُوزْنَا بِبَنِيۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ الْبَحْرَ

‘আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম।’

فَاَتَوْا عَلٰی قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰی اَصْنَٰمٍ لَّهُمْ

‘তারা এমন এক জাতির নিকট উপস্থিত হল, যারা লিপ্ত ছিল তাদের দেব-দেবীর পূজায়।’

সেখানে সম্ভবত দোকানপাট বসেছিল, খাবার-দাবার রান্না হচ্ছিল, গান-বাজনা হচ্ছিল। মেলা ইত্যাদিতে এসব হয়েই থাকে। তো মুসা আলাইহিস সালাম এতদিন যাবৎ বনী ইসরাঈলকে যে পাঠ দান করেছিলেন, যে শিক্ষা-দীক্ষা দান করেছিলেন, তা তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেল। তারা বলল-

يٰۤمُوسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ الْاِلٰهَةُ

‘হে মুসা! আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও তাদের দেবতাদের ন্যায়।’

অর্থাৎ এমন এক উপাস্য আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দাও, যাকে আমরা স্পর্শ করতে পারব, সরাসরি চোখে দেখতে পারব এবং তার পা চুম্বন করতে পারব। হযরত মুসা (আ.) তাদের এই কথায় ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি বললেন—

أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

তোমরা তো অবশ্যই মূর্খ সম্প্রদায়! তোমরা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বোধ, অকৃতজ্ঞ ও মূর্খ। এতদিন যাবৎ তোমাদেরকে আমি শিক্ষাদান করলাম, এই নিকৃষ্ট জীবনাচার থেকে মুক্ত করলাম, অথচ তোমরা এখন তাদের অনুরূপ মূর্তিপূজায় লিপ্ত হতে চাচ্ছ, মেলা বসাতে বলছ, গান-বাজনার আয়োজন করতে বলছ।

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ

এইসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংসশীল।

وَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘এবং তারা যা করছে তা অমূলক।’ তাদের দেবতা তাদের কোন উপকারেই আসবে না। এগুলো তো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বন্ধুগণ! বনী ইসরাঈলের ওই ঘটনায় আমাদের জন্য রয়েছে একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা, একটি সাবধান বার্তা। আল্লাহর নবী সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের সযত্ন তত্ত্বাবধানে ও নজরদারিতে যে জাতি বহু বৎসর কাটালো তারাও মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ল। দৃশ্যযোগ্য, শরীরবিশিষ্ট ইলাহের আকাজ্জিকা ব্যক্ত করে বসল।

এই ঘটনার কাছাকাছি একটি ঘটনা মুসলমানদের মধ্যেও ঘটেছিল। যদিও ঘটনাটি তত বিপজ্জনক ও ভ্রষ্টতামূলক ছিল না। নির্দিষ্ট একটি গাছে কাফেররা তাদের তরবারী ও যুদ্ধাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। সেখানে তারা পশু যবেহ করত এবং একদিন সেখানে অবস্থান করত। হাদীসের কিতাবে এসেছে যে, হুনায়েনের যুদ্ধে গমনকালে নও-মুসলিম কিছু সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাদের জন্যও তাদের অনুরূপ একটি গাছ নির্দিষ্ট করে দিন, যাতে আমরা সেখানে বসতে পারি, মেলার আয়োজন করতে পারি, বাজার বসাতে পারি, পশু কুরবানী করে খাবার-দাবারের আয়োজন করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনী ইসরাঈল হযরত মুসার নিকট

যে রূপ আবেদন করেছিল তোমরাও আমার নিকট সেইরূপ আবেদন করলে। তারা বলেছিল-

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

‘হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদের কদমে কদমে অনুসরণ করে ছাড়বে।’

একবার কোন এক সফরে জনৈক আনসারী সাহাবীর সঙ্গে জনৈক মুহাজির সাহাবীর কিছুটা বিবাদ হল। আনসারী সাহাবী চিৎকার করে বলল-

يَا لَلْأَنْصَارِ

‘আনসারীদের দোহাই।’

মুহাজির সাহাবীও চিৎকার করে বলল-

يَا لَلْمُهَاجِرِينَ

‘মুহাজিরদের দোহাই।’

(অর্থাৎ আনসারী সাহাবী আনসারীদের আহ্বান করে সাহায্য প্রার্থনা করল, তদ্রূপ মুহাজির সাহাবী মুহাজিরদের আহ্বান করে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করল। এটা প্রকারান্তরে ছিল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

دَعَوْهَا فَإِنَّهَا مَنَيْنَ

‘ছাড় এটাকে। কারণ এটা অপবিত্র ও দুর্গন্ধময়।’

ভাই ও বন্ধুগণ!

শয়তান আমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে ওঁৎ পেতে আছে। সে তার নিজ কর্মে কখনও অবহেলা করে না, কখনও উদাসীন থাকে না। সে নতুন নতুন পদ্ধতিতে মানুষকে প্ররোচিত করে। কখনও এই রঙে, কখনও ঐ রঙে। সে জানে, কোন মানুষকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করতে হয়, কিভাবে পথচ্যুত করতে হয়, কোন পদ্ধতি মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে অধিক কার্যকর।

আলেমের পরিবারে যেয়ে সে কাউকে চুরি করতে বলবে না। কারণ আলেমের পরিবারের কাউকে দিয়ে চুরির অপরাধ সংঘটিত করানো সহজ নয়। সে তাদেরকে অহংকারের তালীম দেবে। পিতৃপুরুষ নিয়ে গর্ব করতে শিক্ষা দেবে।

ব্যবসায়ীর নিকটে যেয়ে সে তাকে মাপে কম দেওয়ার ব্যাপারে প্ররোচিত করবে, অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে প্ররোচিত করবে, অতি মুনাফার ব্যাপারে লোভী করে তুলবে। তদ্রূপ যে সমাজকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের সম্পদ দান করেছেন, ইলম ও মেধা দান করেছেন, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব দান করেছেন শয়তান সেই সমাজকে প্ররোচিত করে এই বলে যে, ইসলামের নেয়ামত তো সবাই লাভ করেছে তোমাদের বৈশিষ্ট্য হল ভাষাগত, জাতিগত। তোমাদের উচিত ভাষাগত ও জাতিগত ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা। শয়তানের এই মারাত্মক অস্ত্র সে সুযোগ বুঝে ব্যবহার করে থাকে।

আপনারা ইসলামের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

‘তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’

শয়তান মানুষের মাঝে বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। কারও সামনে জাতীয়তার অসার মতবাদ দাঁড় করিয়ে দেয়, কারও সামনে সম্পদ, কারও সামনে বস্তুবাদিতা ইত্যাদি নানা বিষয় দাঁড় করিয়ে দেয় এবং তাতে এরূপ আকর্ষণ সৃষ্টি করে যে, অনেক সময় এসবকে কেন্দ্র করে মানুষ হানাহানিতে লিপ্ত হয়, একে অপরকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। নিরীহ শিশুরাও রেহাই পায় না। নারীরা হয় নির্যাতিতা, ধর্ষিতা। এইসব শয়তানী চক্রান্ত। আমাদের সকলেরই ইসলাম নিয়ে গর্ব করা উচিত। ইসলামকে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করা উচিত। ইসলামের সব বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা উচিত।

হাদীস শরীফে এসেছে, সমাজে মর্যাদাহীন কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা লাভ করবে। আর তা হবে তাকওয়ার কারণে।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানের অধিকারী হবে ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।’

আল্লাহ তাআলা তাকওয়াকে বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, ইবাদতকে বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, ইলমকে বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

‘কোন অনারবের উপর কোন আরবের এবং কোন আরবের উপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই তাকওয়া ব্যতীত।’

কোন সাদার উপর কালোর কিংবা কালোর উপর সাদার অন্য কোন ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়নি। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হল তাকওয়া। কে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান ও মারেফাত বেশি রাখে, কে দ্বীনের জ্ঞান বেশি রাখে, কে অপেক্ষাকৃত অধিক সুন্দরভাবে নামায আদায় করতে জানে, কে ইসলামের উপর অধিক গর্বিত, কে ইসলামের নেয়ামত পেয়ে অধিক শোকরিয়া আদায় করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা কার অধিক –এসব বিষয়ই আল্লাহর নিকট বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু শয়তান আমাদেরকে এসব বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। এইজন্যই বলা হয়েছে—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

‘নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই বিবেচনা কর।’

অন্যত্র বলা হয়েছে—

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

‘শয়তান ও তার সাজপাঙ্গরা তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না।’

শয়তান যেমন জীন বেশে থাকে, তেমনি মানুষের বেশেও আগমন করে। শত্রুবেশেও আসে, বন্ধুবেশেও আসে। শয়তান বহু ভাষায় কথা বলতে পারে। আমাদের চেয়ে উত্তম ভাষায় সে কথা বলতে পারে। চমৎকার ভাষায় সে বোঝাতে পারে। আপনারা এইরূপ সকল শত্রু থেকে সতর্ক থাকবেন। ইসলামের রশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবেন। ইসলাম নিয়ে গর্বিত থাকবেন। কারণ ইসলাম অপেক্ষা অধিকতর গর্বের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। ইসলাম নিয়ে জীবিত থাকুন, ইসলাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করুন। ইসলামের জন্য জীবন দান করুন। ইসলামের জন্য শির দিয়ে দেওয়া বৈধ কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য এক বিন্দু রক্ত দেওয়াও অন্যায় ও অবৈধ।

আরব দেশে ১৯৬৫-৬৬ সালে এক ঝড় উঠেছিল। সর্বনাশা তুফান সৃষ্টি হয়েছিল। লাখ লাখ আরবকে এক ব্যক্তি^১ পাগল বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার স্থায়িত্ব ছিল অল্প কিছুদিন। সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ রয়ে গেছেন। তাঁর রাসূল রয়ে গেছেন। কিবলা এখনও রয়ে গেছে। মসজিদে নববীও এখনও তেমনি আছে। কুরআন শরীফও বহাল আছে। ঐ কুহক দূরীভূত হয়ে গেছে।

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا

নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই। বাতিল কখনও স্থায়িত্ব লাভ করে না।

আপনাদের গর্বের বিষয় একমাত্র ইসলাম। ইসলামের আহ্বান ব্যতীত অন্য কিছু যেন আপনাদেরকে আকৃষ্ট করতে না পারে। ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আপনাদের অন্তর যেন ধাবিত না হয়। আর সেটাই হবে ইসলামের কারণে শোকর আদায়, ইসলামের জন্য গর্ব প্রকাশ। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা আপনাদের ঈমান ও চিন্তা-চেতনাকে হেফাযত করেন। আমাদের ও আমাদের সাথী-সঙ্গীদের ঈমান ও মানসিকতাকে হেফাযত করেন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১. মিসরের জামাল আবদুন নাসেরের কথা বোঝানো হয়েছে।

ভালবাসা ও নিখাদ রূহানিয়াতের বিজয়

[১৯৮৪ ইং সনের ১৪ মার্চ হোটেল পূর্ণাণীতে হযরত মাওলানার সম্মানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত নৈশভোজ উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেবের স্বাগত ভাষণের জবাবে প্রদত্ত ভাষণ।]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
- أَمَّا بَعْدُ!

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মহোদয় ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

আপনাদের ন্যায় বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে এক জায়গায় একত্রিত হতে পেয়ে আমি অত্যন্ত মোহিত ও আনন্দিত। আমার উচিত ছিল, আপনাদের প্রত্যেকের বাসা-বাড়িতে যেয়ে যেয়ে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করা। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও শহরের বিশালতার কারণে এটা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মহাপরিচালক আবুল ফায়েদ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব আপনাদের সকলের সঙ্গে একই সময়ে, একই স্থানে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথেই বলছি যে, এই মুহূর্তে আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমি বাংলা ভাষা জানি না। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট। আল্লাহ তাআলা ভাষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করে আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ জাহির করেছেন।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ

‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন।’

(সূরা রুম ২২)

অতএব ভাষার বিভিন্নতা নিন্দনীয় কোন বিষয় নয়। আর বাংলা ভাষা তো মুসলমানদের ভাষা। এই ভাষায় রয়েছে জ্ঞান ও সাহিত্যের ভাণ্ডার। উপমহাদেশের একজন বাসিন্দা হিসাবে আমি যদি বাংলা ভাষা জানতাম তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি আপনাদের সামনে আপনাদের প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলতে পারছি না। এর একমাত্র বিকল্প ছিল আরবী ভাষায় কথা বলা। আমি আরবীতে বলতাম আর আপনারা বুঝে নিতেন। তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আরবী ভাষাতো ইসলামের সরকারী ভাষা। মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক প্রিয় ও ব্যাপক ভাষা।

সুধী!

যখন আমি ঈমানের দেশ, বড় বড় আলেম-উলামার দেশ ও ওলী-আল্লাহর দেশ এই বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছি তখন থেকেই আমার অন্তর আনন্দে আপ্ত হয়ে আছে। একজন ইতিহাস গবেষক হিসাবে আমি মনে করি, এই ভূখণ্ডে এত বিপুল পরিমাণ মুসলমানের বসতি শুধু ইখলাস ও রুহানিয়াতের ফসল। যদি নিখাদ রুহানিয়াত ও রাজনৈতিক স্বার্থমুক্ত ইখলাস না থাকত, যদি খাঁটি আল্লাহ-প্রেম ও মানবতা-প্রীতি না থাকত (যা আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনের মধ্যে ছিল) তবে এই ভূখণ্ড ইসলামের নেয়ামতে এরূপ সমৃদ্ধ ও এরূপ ইসলাম-প্রেমিক হতে পারত না। বর্তমানে একজন মানুষের হৃদয় জয় করাও সুকঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ শুধু ইখলাসের বদৌলতে অত্যন্ত সহজভাবে লাখ লাখ মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছেন, তাদেরকে নিজেদের ভক্ত ও প্রেমিক বানিয়ে নিয়েছেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের এই সংখ্যাধিক্য কোন মুসলিম সামরিক অভিযানের ফল নয়। আমি অত্যন্ত আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে আপনাদের সামনে বলতে চাই যে, যে সকল জায়গায় মুসলিম সেনাবাহিনী যায়নি সেখানেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর যেখানে শত শত বৎসর যাবৎ মুসলিম শাসন বহাল ছিল সেখানে দেখা যায় যে, মুসলমানরা সংখ্যালঘু। ইরান থেকে হযরত সাইয়েদ আলী হামদানী এসে গোটা কাশ্মীরকে তার ভালবাসা ও প্রেম দ্বারা শিকার করে ফেললেন। তিনি আসলেন আর সমগ্র কাশ্মীর ইসলামের কালিমা গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। ইসলামের প্রতি কাশ্মীরবাসীর প্রেম ও ভালবাসা এই পর্যায়ে উপনীত হল যে, বড় বড় ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকেরাও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল। কাশ্মীরেরই এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে আমরা দেখতে পাই (আল্লামা ইকবাল) সাইয়েদ বংশীয় একজনকে লক্ষ্য করে আবেগময় ভাষায় কবিতা রচনা করতে—

এই রাসূল প্রেম সৃষ্টি হয়েছিল রুহানিয়াতের দ্বারা, ইখলাসের দ্বারা, খাঁটি মানবপ্রেম ও আল্লাহর তাবেদারী দ্বারা। আল্লাহর তাবেদারী এবং মানবপ্রেম এই উভয় গুণের যখন মিলন ঘটে, যখন এই দুই সাগর একই স্থানে এসে মিলেমিশে যায়, অর্থাৎ কেউ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর তাবেদার হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে যথার্থ মানবপ্রেম তখন তার বিজয় রথকে কেউ রোধ করতে পারে না। অন্ধকারের বুক চিরে তখন পরিস্ফুট হয় আলো। বর্তমান যুগেও দুনিয়ার সকল সঙ্কট ও সকল বিপর্যয়ের একমাত্র চিকিৎসা ইখলাস ও আন্তরিকতা, যথার্থ রুহানিয়াত এবং নিজের সব রকম স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে খেদমতে নিয়োজিত হওয়া।

পূর্ববাংলাতেও দরবেশ এসেছেন, আল্লাহওয়ালা ফকীর এসেছেন। তাঁরা এসেছেন এবং মানুষকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। মানুষ আদম সন্তানদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। একদল তো তারা, যারা নিজেদেরকে মানুষ মনে করত। আর অপর দল ছিল তারা, যাদেরকে জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হত। মানুষের তৈরি এই কৃত্রিম বিভক্তিকে ঐ সকল দরবেশ ও সুফীগণ মানবপ্রেম দিয়ে উৎখাত করেছিলেন। তাঁরা ইসলামের পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তাওহীদের পয়গাম নিয়ে এসেছেন এবং মানবতার ঐক্যের পয়গাম নিয়ে এসেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ আরববাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, যারা তৎকালীন যুগে ছিল সর্বাধিক বংশপূজারী, ভাষা পূজারী, এমনকি যারা গোটা পৃথিবীকে নিজেদের তুলনায় বোবা ও ভাষাহীন বলে জ্ঞান করত, আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষাকে ভাষা বলেই মনে করত না—

إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ

وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ - لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ

لَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

‘তোমাদের রব একজন, তোমাদের পিতা একজন। তোমাদের সকলেই আদম থেকে আর আদম মাটি থেকে। কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন আরবের উপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কালোর উপর সাদার, সাদার উপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি একমাত্র তাকওয়া।’

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

‘হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।’ (সূরা হুজুরাত ১৩)

মুহাম্মাদ আরবী, হাশেমী, কুরাইশী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোক সকল! হে মানুষ! হে আরববাসী! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তোমাদের পিতাও এক। দুই দুইটি দিক থেকে তোমরা একে অপরের ভাই।

এক। আল্লাহ তাআলার দিক থেকে, আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার দিক থেকে।

দুই. তোমাদের আদি পিতা ও উর্ধ্বতন পুরুষের দিক থেকে।

আল্লাহর একত্ব ও মানব বংশের একত্ব দুইটি স্তম্ভ। এই উভয় স্তম্ভের উপর মানবতা প্রতিষ্ঠিত। এই দুই স্তম্ভের যে কোন একটিকে ভূপাতিত করা হলে মানবতা ও মানব সভ্যতার সুউচ্চ প্রাসাদ ভূপাতিত হয়ে ধুলোয় মিশে যাবে।

এই সকল সুফী ও দরবেশের মাধ্যমেই এখানে ইসলাম এসেছে, যাঁরা বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক দিয়ে কথা বলার পূর্বে হৃদয় দিয়ে কথা বলেছেন। তাঁরা মুখের ভাষায় কথা বলেননি, তাঁরা কথা বলেছেন হৃদয়ের ভাষায়। মুখের ভাষা হতে পারে পঞ্চাশটি কিন্তু হৃদয়ের ভাষা হয় একটিই, আত্মার ভাষা একটিই, সত্যতা ও সত্যতার ভাষা একটিই, ভালবাসার ভাষা একটিই। ভালবাসা ও প্রেমের ভাষা সকলেই বোঝে। তার জন্য দোভাষীরও প্রয়োজন হয় না। চোখের প্রেমময় চাহনী, ঠোঁটের মুচকি হাসি, হৃদয় উপচে পড়া ভালবাসার ফোয়ারা শত্রুকেও, জংলী বাঘ ও সিংহকেও বশীভূত করে ফেলতে পারে। নিজের কথা তাদের মুখে উচ্চারণ করিয়ে দিতে পারে।

আমি আপনার (মহাপরিচালক) প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আপনি শুধু ঢাকার নয় বরং বাংলাদেশের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে এখানে একত্রিত করেছেন। আমার অন্তরে এই কথা উদিত হচ্ছে যে, যে দেশে এত জ্ঞানী-গুণীজন বিদ্যমান, যে দেশে এত ইসলাম প্রেমিক বিদ্যমান, যাঁরা তাদের এক পরদেশী ভাইয়ের কথা শোনামাত্র সকল জরুরী কাজ ফেলে দিয়ে এখানে ছুটে এসেছেন

ইসলামের সাথে সে দেশের সম্পর্ক চিরঅটুট থাকতে বাধ্য, কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

গুণগত (Quality) ও পরিমাণগত (Quantity) উভয় দিক দিয়ে এই সমাবেশ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই সমাবেশ আমাকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলছে যে, যেখানে এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের বসবাস, যেখানে এত পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী বিদ্যমান, যেখানে এত শিক্ষিত বিদ্বজ্জন (SCHOLARS) বিদ্যমান, ইসলামের সাথে সেই দেশের জ্ঞানগত সম্পর্ক, তাহযীবী ও তামাদুনিক সম্পর্ক, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আপনি (মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন) এই বিপুল সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে এখানে সমবেত করে তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে আমাকে বিরাট তোহফা ও উপহার দিয়েছেন।

আমি আমার কথাকে দীর্ঘ করে আপনাদের নৈশভোজ গ্রহণের সময়কে বিলম্বিত করে দিচ্ছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। খাবার তো সব সময়ই পাওয়া যাবে কিন্তু আপনাদেরকে আমি কোথায় পাব?

খোশামোদ ও চাটুকারিতা নয় বরং আমি যথার্থই বলছি, আপনারা সরল ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, ইসলামের প্রতি অন্তরে প্রেম ও আবেগ লালনকারী একটি জাতি পেয়েছেন। অনেক দেশের ভাগ্যেই যা জোটে না। আপনারা এর মূল্যায়ন করবেন। আপনারা বড় বড় Politicians ও রাজনীতিবিদ পাবেন, Diplomates ও কূটনীতিবিদ পাবেন, বড় বড় মেধাবী ও প্রতিভাধর ব্যক্তি পাবেন, কিন্তু সততা ও মমতা সর্বত্র পাবেন না। আপনাদের এই জাতির মধ্যে সততা ও ভালবাসা বিদ্যমান। আপনাদের দায়িত্ব হল এই জাতিকে কাজে লাগানো। আমি টরেন্টো গিয়েছিলাম। সেখানে লোকেরা আমাকে নায়েথ্রা জলপ্রপাত দেখিয়েছে। জলপ্রপাতটি বিশ্বের বিস্ময়কর বস্তুসমূহের একটি। হাজার হাজার ফুট উপর থেকে এর পানি নিচে পতিত হয়। বিভিন্ন দেশের পর্যটকগণ জলপ্রপাতটি দেখতে ভীড় জমায়। আমিও দেখতে গিয়েছিলাম। এই জলপ্রপাতকে কাজে লাগিয়ে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা না হয়, এ থেকে Energy গ্রহণ করা না হয় এবং এর পানি যদি ক্ষেত-খামারে সিক্ত করা না হয় তবে জলপ্রপাতটির কোন মূল্য থাকে না, বেকার বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে একটি জলপ্রপাত দান করেছেন। ঈমানের জলপ্রপাত। আর তা হল বাংলাদেশের বিশাল মুমিন জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে সত্যতার জলপ্রপাত, ইখলাসের জলপ্রপাত। আপনারা এই জলপ্রপাতকে কাজে লাগান।

এর দ্বারা বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদন করুন। যে সকল সমস্যা ও সঙ্কট সম্পর্কে আপনারা মনে করছেন যে, তা দূরীভূত হবার নয়, সমাধানযোগ্য নয় সে সকল সমস্যার সমাধান মুহূর্তেই হয়ে যেতে পারে যদি সততা ও ইখলাস থাকে। আপনারদের এই জাতির মধ্যে এই মহা মূল্যবান সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব আপনারা এদের দ্বারা যে কাজ নিতে চান নিতে পারবেন।

তবে এটা রাজনীতিকদের কাজ নয়। এটা ঐ সকল ব্যক্তির কাজ যারা স্বচ্ছ ও খাঁটি হৃদয়ের অধিকারী, ইখলাসের অধিকারী। যাদের অন্তরে রয়েছে জাতির প্রতি প্রেম ও ভালবাসা। যারা এই জাতির নিকট থেকে কিছু পেতে চায় না, শুধু দিতে চায়। যারা জাতির সেবা করতে চায় এবং এর বিনিময় চায় শুধুই আল্লাহর নিকট। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ এই জাতির মাধ্যমে পরশ পাথর বানাতে পারে, পারে সোনা তৈরি করতে। এই জাতি তো সোনার জাতি। এই জাতি শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং গোটা বিশ্বে এক নতুন শক্তির সঞ্চার করতে পারে। তবে এটা তখনই হবে যখন আমরা নেয়ামত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা যে জাতি আমাদেরকে দান করেছেন তার মূল্যায়ন করব। এই জাতি নায়েখা জলপ্রপাত স্বরূপ। আপনারা এর দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করুন। এর পানি অযথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বহুদিন যাবৎ নষ্ট হচ্ছে। এর দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ সমগ্র উপমহাদেশকে (Sub continent) আলোকিত করার ক্ষমতা রাখে। এমনকি আরব বিশ্বেও সে আলো পৌছে যেতে পারে।

আপনারা আপনারদের এই জাতির মূল্যায়ন করবেন। প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের মাঝে, উলামা হযরাত ও ভার্সিটি পড়ুয়া গ্রাজুয়েটদের মাঝে দূরত্বের যে সাগর সৃষ্টি হয়েছে এবং দিন দিন গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছে সেই সাগরকে ভরাট করবেন, উভয় শ্রেণীর দূরত্বকে দূরীভূত করবেন। উভয় শ্রেণী যেন বন্ধুতে পরিণত হয়।

আলেমগণ আধুনিক শিক্ষিতদেরকে দ্বীনী বিষয়ে সহায়তা করবেন, তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দান করবেন, কুরআনের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে তুলবেন, আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্ম সেগুলোকে বাংলা ভাষায় সমাজে ছড়িয়ে দেবেন। উভয় শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দেশকে শক্তিশালী করে তুলুন, ইসলামের পতাকাবাহী দেশ হিসেবে গড়ে তুলুন। এই দেশ মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। অতএব এই দেশবাসীর উচিত নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তি, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করা এবং ক্ষুদ্র দেশসমূহের ব্যাপারে বড় ভাই সুলভ সহায়তা প্রদান ও কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

আমি পুনরায় আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, আপনি শক্তির এক নতুন দিগন্ত আমার সামনে উন্মোচন করে দিয়েছেন। আপনি আমার মধ্যে এক রাশ আশা ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মুসলিম বিশ্বের ঘটনাবলী দেখে দেখে আমি হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। লেবাননের পরিস্থিতি, ইরাক ইরানের যুদ্ধ এবং আরব বিশ্বের অর্থ-সম্পদের গোলামীর চিত্র দেখে আমার অন্তর যতটা আহত হয়েছিল আপনি তা কিছুটা লাঘব করেছেন। আমি এখনে এসে আশাবিত্ত হলাম যে, ইসলামের নক্ষত্র এখনও আলোকোজ্জ্বল রয়েছে।

যদি এই দেশ থেকেই ইসলামের পুনর্জাগরণের সূচনা হয় তবে তা বিচিত্র কিছু নয়। একজন ভারতীয় লেখক হিসেবে আমি আপনাদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সব রকম যোগ্যতা দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মধ্যে কোন কিছুর ঘাটতি ও অভাব নেই। শুধু প্রয়োজন, ইসলামের বন্ধনকে দৃঢ় করা, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া। এক্ষেত্রে কোন কিছুই যেন আপনাদের সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াতে না পারে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিই জীবনের মূল বিষয়। তাঁর কাছেই আমাদের যেতে হবে। ঈমান, আকীদা ও নেক আমল ব্যতীত কোন কিছুই তাঁর নিকট যেয়ে কাজে আসবে না।

আমরা যেন সকল মানুষকে ভালবাসি। সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। নিজের মাতৃভাষাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করি, মাতৃভাষাকে ভালবাসি। তবে অন্য ভাষাকে ঘৃণা করে নয়। আমার তো বলতে ইচ্ছা হয় যে, আপনারা ভারতে এমন কিছু আলেম ও সাহিত্যিক প্রেরণ করুন, যারা বাংলাভাষায় ইসলামের তালীম দিতে পারবে। কোন বিশেষ ভাষা নিয়ে গৌড়ামী ও অন্ধ ভালবাসার সাথে ইসলামের ইতিহাস পরিচিত নয়। মুসলমানরা সব ভাষাই শিখেছে এবং যেন তেন শিক্ষা নয় বরং পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে এবং সেই ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। ফার্সী ভাষা কাদের ভাষা ছিল? অগ্নিপূজকদের ভাষা ছিল। কিন্তু আপনি ফার্সী ভাষার কাব্য ও কবিতার ইতিহাস পাঠ করুন, দেখবেন যে, এই ভাষা শেখ সাদীকে জন্ম দিয়েছে, হাফেজ সিরাজীকে জন্ম দিয়েছে, জালালুদ্দীন রুমীকে জন্ম দিয়েছে, মাওলানা জামী ও কুদসীকে জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে এসে আমার সর্বাধিক প্রত্যাশা জন্মেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে কেন্দ্র করে। এটা এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা আমাদের বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নতুন প্রজন্মের সামনে তাদের ভাষায় রচিত ইসলামী গ্রন্থাদি প্রকাশ করে পেশ করতে পারবে। আমার প্রত্যাশা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদির ভাষা, স্টাইল সহ সবকিছু

মানোত্তীর্ণ হবে। প্রতিষ্ঠানটি আশার আলো। যার দ্বারা এই দেশ আলোকিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির সাথে অনেক আশা ও প্রত্যাশা জড়িত।

এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং পুনরায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই মহা মূল্যবান ও ঐতিহাসিক সুযোগ দানের জন্য।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ